কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০৫ সাল থেকে)

[Society and Culture of Kishoreganj (Since 1905)]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মাহমুদা আক্তার

রেজিস্ট্রেশন নং-২১৬

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০১৯

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, মাহমুদা আক্তার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে দাখিলকৃত **কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০৫ সালে থেকে) [Society and Culture of Kishoreganj (Since 1905)]** শীর্ষক এম.ফিল গবেষণাটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্মকর্ম নয়, এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণা প্রসুত অভিসর্ন্দভ। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

(ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী)
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাববধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০৫ সালে থেকে) [Society and Culture of Kishoreganj (Since 1905)]** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার একক ও নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

মে, ২০১৯

মাহমুদা আক্তার
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-২১৬
২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই সর্ব শক্তিমান মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে। যার অশেষ কৃপায় ও রহমতে আমার পক্ষে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। তারপরই আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজীর প্রতি– যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার গবেষণার সময় প্রদানে ছিলেন হৃষ্টচিত্ত ও একনিষ্ঠ। গবেষণা কর্মের নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে তিনি যেভাবে বারংবার তাগিদ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং সাহস যুগিয়েছেন তা বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সহজতর করেছে। আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আমার এ গবেষণার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষকই অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোঃ মোশাররফ হোসেইন ভূইয়া, অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. এ.কে.এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির, সহযোগী অধ্যাপক মিসেস নুসরাত ফাতেমা, সহযোগী অধ্যাপক জনাব এস.এম মফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাইফুল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ জাকারিয়া, সহযোগী অধ্যাপক জনাব এ.টি.এম সামছুজ্জোহা, সহযোগী অধ্যাপক জনাব মাহমুদুর রহমান এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্যারের কাছে। যিনি কিশোরগঞ্জের সন্তান হিসেবে আমার গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সবসময় সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা পত্রটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। এককথায় তাঁর সহযোগিতা ছাড়া আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হতো না। আমি তাঁর কাছে চিরঋণী।

অভিসন্দর্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি (শাহবাগ, ঢাকা), এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের (ঢাবি) সেমিনার লাইব্রেরি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কিশোরগঞ্জ-এর রেকর্ড রুম ও লাইব্রেরি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ময়মনসিংহ-এর লাইব্রেরি, কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, সাংবাদিক, আইনজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ আমাকে গবেষণার বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কিশোরগঞ্জ জেলার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বন্ধুমহলকে। কিশোরগঞ্জ জেলার বন্ধুরা আমাকে অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছেন গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে। তাছাড়া আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার ডিপার্টমেন্টের অগ্রজ জনাব মুহাম্মদ মাছুদুর রহমান এর নিকট। যিনি এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সবসময়ই তাগিদ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন।

আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আকন্দ ও আমার স্নেহময়ী মাতা মিসেস আমেনা আক্তার এর প্রতি। যাদের অকুণ্ঠ সমর্থন, ভালবাসা আর উৎসাহ আমার এ গবেষণা কর্মটিকে তরান্বিত করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধাভাজন চাচাদের যারা সর্বক্ষেত্রে আমার সকল কাজের অকুণ্ঠ সমর্থক। আর আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার একমাত্র ভাই হাবিব আল-মুজাহিদ আকন্দের প্রতি। কেননা আমার কোন কাজই পূর্ণতা পায় না ওর সহযোগিতা ছাড়া।

মে, ২০১৯

মাহমুদা আক্তার

এম.ফিল গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং-২১৬

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কিশোরগঞ্জের মানচিত্র

তথ্যসূত্রঃ www.kishoregonj.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র.....(i)

ঘোষণাপত্র.....(ii)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....(iii-iv)

কিশোরগঞ্জের মানচিত্র.....(v)

সূচিপত্র.....(vi)

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা.....১-৮

১.১ ভূমিকা.....১-২

১.২ গবেষণার ক্ষেত্র ও সময়কাল নির্ধারণের যৌক্তিকতা.....২-৬

১.৩ তথ্যসূত্র পর্যালোচনা.....৬

১.৪ অধ্যায় বিন্যাস.....৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: কিশোরগঞ্জের পরিচিতি.....৯-৩৭

২.১ ভূমিকা.....৯-১০

২.২ ভৌগোলিক অবস্থান.....১০

২.৩ জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি.....১০-১১

২.৪ নদ-নদী ও হাওর.....১১-১৪

২.৫ নামকরণ.....১৪-১৬

২.৬ প্রশাসনিক পরিচিতি.....১৭-১৮

২.৭ উপজেলা পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস.....১৮-৩৫

২.৮ উপসংহার.....৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সামাজিক জীবন.....৩৮-১১৬

৩.১ সমাজ ৩৮

৩.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস.....৩৮-৩৯

৩.৩ সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরন.....৩৯-৪৩

৩.৪ জনসমাজ ৪৩-৪৫

৩.৫ খাদ্যাভ্যাস.....৪৫-৪৯

৩.৬ পোশাক-পরিচ্ছদ.....৪৯-৫০

৩.৭ ভাষা.....৫১-৫৪

৩.৮ প্রবাদ-প্রবচন.....৫৪-৫৯

৩.৯ লৌকিক বিশ্বাস.....৫৯-৬৫

৩.১০ সামাজিক উৎসব.....৬৫-৭৪

৩.১১ লোকমেলা.....৭৪-৮৩

৩.১২ সমাজ সংস্কারক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.....৮৩-১১২

৩.১৩ উপসংহার.....১১৩-১১৪

চতুর্থ অধ্যায়ঃ কিশোরগঞ্জের অর্থনৈতিক জীবনধারা.....১১৭-১৪৩

৪.১ অর্থনৈতিক অবস্থা.....১১৭-১২৪

৪.২ শিল্প ও বাণিজ্য.....১২৫-১২৬

৪.৩ ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন শিল্প.....১২৬-১৩৭

৪.৪ লোক পেশাজীবী সমাজ.....১৩৭-১৪১

৪.৫ উপসংহার.....১৪১-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়: কিশোরগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা.....১৪৪-১৭৪

৫.১ ভূমিকা.....১৪৪-১৪৫

৫.২ শিক্ষা ব্যবস্থা ১৪৫-১৪৭

৫.৩ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৪৮-১৬১

৫.৩.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়.....১৪৮-১৪৯

৫.৩.২ মাধ্যমিক বিদ্যালয়.....১৪৯-১৫৩

৫.৩.৩ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়.....১৫৩-১৫৯

৫.৩.৪ মাদ্রাসা.....১৫৯-১৬১

৫.৪ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ.....১৬১-১৭১

৫.৫ উপসংহার.....১৭১-১৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়: কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি.....১৭৫-২৩৮

৬.১ সংস্কৃতি.....১৭৫

৬.২ কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন.....১৭৫-১৭৭

৬.৩ সাহিত্য.....১৭৭-১৭৮

৬.৪ বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ.....১৭৮-১৯৭

৬.৫ নাটক ও বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী ১৯৭-২০১

৬.৬ সংগীত.....২০১-২১১

৬.৭ বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারবৃন্দ.....২১১-২২৭

৬.৮ খেলাধুলা.....২২৭-২৩৬

৬.৯ উপসংহার.....২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার.....২৩৯-২৪৪

পরিশিষ্ট "ক" : শব্দকোষ.....২৪৫-২৫৪

পরিশিষ্ট "খ" : ঐতিহাসিক স্থান.....২৫৫-২৬৩

পরিশিষ্ট "গ" : সংবাদপত্র.....২৬৪

পরিশিষ্ট "ঘ" : ছবি.....২৬৫-২৬৯

গ্রন্থপঞ্জি.....২৭০-২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১.১ ভূমিকা

ইতিহাস একটি জাতির দর্পন। আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ইতিহাস। কেননা মানুষের সার্বিক চেতনার বিকাশ ঘটে এর মাধ্যমেই। যা রাজনৈতিক ইতিহাসে অনুপস্থিত। রাজনৈতিক ইতিহাস একটি জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস। আর এ ভাঙ্গা-গড়ার খেলা মানুষের জীবনে কিরূপ প্রভাব ফেলে বা পরিবর্তন আনে তা জানা যায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মাধ্যমে। যার অন্যতম উদাহরণ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ জীবন। যেখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসনের সূচনা পরবর্তী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক মিশ্র সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। আর বাঙ্গালি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ইতিহাস যেমন একটি জাতির দর্পন তেমনি সংস্কৃতি মানব জীবনের দর্পন। কেননা মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আবদ্ধ। মানুষের আচার-আচরণ, চাল-চলন, খদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছু সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক পরিবেশ যাকে বিশেষায়িত করে এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে যা প্রভাবান্বিত হয়। রাজনৈতিক ইতিহাসের মত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে অতীতে খুব একটা গবেষণা না হলেও বর্তমানে এর প্রচলন দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে ইতিহাসবিদগণের দৃষ্টি পড়েছে। এক্ষেত্রে ষাটের দশকে প্রকাশিত ড. এম.এ রহিমের *"Social and Cultural History of Bengal"* গ্রন্থটিকে মোঃ হাবিবুল্লাহ তাঁর *"পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি"* গ্রন্থে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস শিরোনামে প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১] সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে রচিত এ গ্রন্থ সম্পর্কে ড. এম.এ রহিম গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন-

> মুসলিম আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জন্য আমি দুখণ্ডে একখানা গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে ১২০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং শেষ হয়েছে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয় খণ্ড ১৫৭৬ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। বর্তমান গ্রন্থ, প্রথম খণ্ডে বাংলাদেশে বাংলাদেশে মুসলমান জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন- তাদের উৎপত্তি ও অগ্রগতির পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে তাদের জীবন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের পারস্পরিক দ্বন্ধ-সংঘাতের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেয়া হয়। যদিও এই গ্রন্থ প্রধানত মুসলমানদের উপর লিখিত, তথাপি হিন্দুদের উন্নতি ও তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন এবং মতবাদ সমূহেরও যথেষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

তাছাড়া ড.আব্দুল করিম[৩], ড. আজিজুর রহমান মল্লিক[৪], ড. সালাহউদ্দিন আহমদ[৫], ড. সুফিয়া আহমদ[৬], ড. ওয়াকিল আহমদ[৭] প্রমুখ গবেষকগণের গ্রন্থসমূহসহ সাম্প্রতিককালের আরো কিছু গবেষণা গ্রন্থ তথ্য রয়েছে-যা শুধু সমাজের নির্দিষ্ট একটি শ্রেণি বা নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় শ্রেণি গোষ্ঠীকে নিয়ে রচিত। যেখানে সমাজের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না।

তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মানুষের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার ও জীবনযাত্রায় রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। যেমন- বান্দরবনের মানুষের জীবনাচরণ আর ময়মনসিংহের মানুষের জীবনাচরণ এক নয়। এমনকি ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। শুধু ভিন্ন ভিন্ন জেলা নয়, বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণের সাথে অন্যান্য উপজেলার মানুষের জীবনাচরণে রয়েছে ভিন্নতা। আর এ কারণেই বৈচিত্র্যময় কিশোরগঞ্জের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে বর্তমান গবেষণা।

১.২ গবেষণার ক্ষেত্র ও সময়কাল নির্ধারণের যৌক্তিকতা

"গারুয়া পাহাড় হৈতে দক্ষিণে সাগর
ঘর বাড়ি নাই কেবল নল খাগড়ার গড়"

মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জন্মভূমি কিশোরগঞ্জকে নিয়ে এই লিখনের মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম জেলা এই কিশোরগঞ্জের ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কথা। একদিকে গভীর জলরাশি বেষ্ঠিত নিম্নজলাভূমির বিশাল হাওর অঞ্চল অন্যদিকে উচ্চ টিলাযুক্ত বালুকাময় চরাঞ্চল এ জেলার সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যকে করেছে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। মূলত কিশোরগঞ্জ জেলা দু'টি অংশে বিভক্ত- একটি উজান অঞ্চল অন্যটি ভাটি বা হাওর অঞ্চল। ফলে এক অঞ্চলের মানুষের জীবন বৈচিত্রের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের রয়েছে বিস্তর ফারাক। এমনকি ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার মানুষের একটি নিজস্ব ভাষা 'ছুহুম' ভাষার কথা বলা যায়, যা এ জেলার অন্য অঞ্চলের মানুষের বোধগম্য নয়।

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস। যা এই অঞ্চল তথা এ জেলার মানুষের জীবনযাত্রাকে করেছে বৈচিত্র্যময়। ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত কিশোরগঞ্জের প্রতিটি উপজেলার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় রয়েছে ভিন্নতা। তাছাড়া এ জেলায় জন্ম হয়েছে অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির। যাদের জীবন ও কর্ম আমাদের অনুপ্রাণিত করে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ববহনকারী অনেক স্থান ও স্থাপনা। যা এই অঞ্চল সর্ম্পকে আমার গবেষণার স্পৃহাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা সৃষ্টির ইতিহাস বেশি দিনের না হলেও এ জেলা যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত এ অঞ্চলের রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এই জনপদের মানুষের রয়েছে এক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য। প্রাচীনকাল থেকে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ এক সমৃদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি ধারন করছে। হাওর-বাওর ও সমতলভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি বিস্তীর্ন জনপদ হলো কিশোরগঞ্জ। হাওর বেষ্টিত এ অঞ্চলের মানুষের জীবন বৈচিত্র্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা থেকে ভিন্নতর। তেমনি এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিতেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বর্তমান গবেষণার সূচনাকাল ১৯০৫ সাল থেকে। কেননা কিশোরগঞ্জ জেলা তথা এ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন জীবনাচরণ নিয়ে আমরা *"ময়মনসিংহ গীতিকা"*সহ অন্যান্য লোকগ্রন্থ ও *"ময়মনসিংহ ডিস্টিক গেজেটিয়ার"* এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও জানতে পারি। কিন্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ পরবর্তী অর্থ্যাৎ মাঝামাঝি সময়কালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচরণের কথা খুব একটা জানা যায় না। প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী এ অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণের সাথে বর্তমান জীবনাচরণের কোন পরিবর্তন আছে কিনা তা জানার আগ্রহ থেকেই গবেষণার এ সময়কাল নির্ধারণ। তাছাড়া ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ এবং তৎপরবর্তী ১৯১১ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম জনগণের মধ্যে যে জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তা এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচরণে কিরূপ প্রভাব ফেলে বা এরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে আদৌ কোন প্রভাব ফেলেছে কিনা কিংবা সম্প্রীতিতে কোন ভাঙ্গনের সৃষ্টি করেছিল কিনা তা জানাও এ এর উদ্দেশ্য। কেননা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতঅর্থে বঙ্গ-ভঙ্গের মধ্য দিয়েই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূত্রপাত ঘটে। বঙ্গ-ভঙ্গে ঢাকাকে রাজধানী করে সম্পূর্ণ আসাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভাগসহ উত্তরবঙ্গ নিয়ে যে প্রদেশ গঠিত হয় তাতে পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ খুশিই হয়েছিল বলা যায়। মুসলমানদের সাথে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এই ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

কিন্তু তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গ-ভঙ্গকে মেনে নিতে পারেননি। ফলে তাদের নেতৃত্বেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আন্দোলন সূচিত হয়। ১৯০৬ সালের দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আশীর্বাদপুষ্ট অনুশীলন সমিতি বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে সময় বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চরমপন্থী বর্ণহিন্দু নেতাদের কব্জায় চলে যায়। ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের খুব একটা অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডকে সে সময় কেউ কেউ বলতেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, কেউ বলতেন স্বদেশী আন্দোলন। এদের মূল টার্গেট ছিল এদেশ থেকে ব্রিটিশের মূলোৎপাটন এবং বঙ্গবাসীর স্বাধিকার অর্জন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিন চন্দ্র পাল, বারীন ঘোষ, অরবিন্দু ঘোষ প্রমুখের চেষ্টায় বর্ণবাদী হিন্দু লেখক, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক রচনা ও প্রচারণায় লিপ্ত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এতে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সরকার বিরোধিতার সাথে সাথে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। রাখী বন্ধন, কালীমন্দিরে শপথ গ্রহণ, বন্দে মাতরম স্লোগান, এমনকি অনেক হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানকে এ আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি ও চতুরতার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পও ছড়িয়ে দেয়া হয় সর্বত্র। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে।[৮]

সে সময় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, রাস্তাঘাটে সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা তাদের সহপাঠী মুসলমান ছাত্রদের মুখ থেকে "পিয়াজের গন্ধ আসে" বলে অভিযোগ তুলে তাদের সাথে একত্রে বসতে অস্বীকার করে। যে কারণে ক্লাসের মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক শাখার ব্যবস্থা করতে হয়।[৯] এসব অন্তর্ঘাতমূলক বিদ্বেষ সত্ত্বেও এক শ্রেণির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপ্লবী পুরুষ সার্বিক পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কারণ সে সময় সাম্প্রদায়িক বিভেদ অপেক্ষা ব্রিটিশের নিপীড়ন প্রতিরোধ করাই ছিল বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য।

বাংলার বিপ্লবীরা 'অনুশীলন', 'যুগান্তর'সহ আরো কিছু সংগঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা জোরদার করতে থাকেন। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। প্রথমদিকে ডাকাতি আর গুপ্তহত্যার মাধ্যমেই এসব সংগঠন তাদের বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। ১৯০৮ সালের ১৫ আগস্ট অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা বাজিতপুরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করে। এতে বিপ্লবীদের হাতে প্রচুর অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বলে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের কয়েকটি সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে। এ সকল সংগঠনের মধ্যে ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি এবং সাধনা সমিতি ছিল অন্যতম। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটনের প্রয়োজনেই পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী সংগঠনগুলোর অর্থ-চাহিদা দেখা দেয়। সে চাহিদা পূরণের জন্যই মূলত ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীরা ডাকাতির পথ বেছে নেন। এ সকল ডাকাতি সাধারণত ধনাঢ্য জোতদার শ্রেণির বাড়িতেই সংঘটিত হতো।

১৯১১ সালের ৩ অক্টোবর বিপ্লবীরা কুলিয়ারচরের এক বাড়িতে ডাকাতি করে ৩১২৫ টাকা হস্তগত করেছিলেন। ১৯১৩ সালের ২৪ নভেম্বর বাজিতপুর থানাধীন সরারচরের এক বনেদী পরিবার থেকে ডাকাতি করে বিপ্লবীরা ৪৩৯০ টাকা সংগ্রহ করেছিল বলে জানা যায়। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগঠনে সম্পৃক্ত থাকাসহ ডাকাতি মামলায় জড়িত থাকার দায়ে সে সময় বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা হয়েছিল। এ সকল মামলাকে 'ষড়যন্ত্র মামলা' আখ্যায়িত করে বিপ্লবীদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড প্রদান করা হতো। 'দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা' নামক এরকম একটি মামলায় ৪৪ জন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ এবং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দলগঠন ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগই ছিল এ মামলার মূল বিষয়বস্তু।[১০] এ মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন এই কিশোরগঞ্জের কৃতীসন্তান কুলিয়ারচর থানাধীন কাপাসাটিয়া গ্রামের আজন্ম বিপ্লবী পুরুষ মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। যিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসাবে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতিতে এবং এ জাতীয় বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনে কিশোরগঞ্জেই অনেক বিপ্লবী সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যেমন অংশ নিয়েছেন, তেমনি বিলেতি পণ্য বর্জনের আন্দোলনেও এঁদের ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। স্বদেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত এসকল বিপ্লবীরা রেখে গেছেন তার পথ ধরেই এ দেশের পরবর্তী রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে মনীন্দ্র চন্দ্র রায় (করিমগঞ্জ), সুরেন্দ্র চন্দ্র মোদক (জাফরাবাদ, করিমগঞ্জ), আনন্দ কিশোর মজুমদার (কিশোরগঞ্জ), রেবতী মোহন বর্মণ (শিমুলকান্দি, ভৈরব), প্রবীর গোস্বামী (বনগ্রাম, কটিয়াদী), সঞ্জীব চন্দ্র রায় (কিশোরগঞ্জ), ক্ষিতীশ চক্রবর্তী (কিশোরগঞ্জ), ওয়ালীনেওয়াজ খান (কিশোরগঞ্জ), নগেন সরকার (তালজাঙ্গা, তাড়াইল), নিবারণ চক্রবর্তী (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ), ফয়েজ উদ্দিন চৌধুরী (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ সদর), জান মাহমুদ (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ সদর), হীরেন্দ্র রায় (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ সদর), সুবোধ দাস (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ সদর), অজিত দাস, (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ সদর), যোগেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য (গচিহাটা, কটিয়াদী), সতীশ চন্দ্র রায় (কাপাসাটিয়া, কুলিয়ারচর), বসন্ত রক্ষিত (যশোদল, কিশোরগঞ্জ), ভূবেশ চন্দ্র রায়, যশোদানন্দ গোস্বামী (বানিয়াগ্রাম, কটিয়াদী), কম্যুনিস্ট নেতা ভূপেশ গুপ্ত (ইটনা), মনোরঞ্জন ধর (কটিয়াদী) হেমজা ধর (কটিয়াদী), প্রফুল্ল কুমার সরকার (রশিদাবাদ, কিশোরগঞ্জ), ডাক্তার মাইনউদ্দিন (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ সদর), অবিনাশ মজুমদার (পাতুয়াইর, কিশোরগঞ্জ সদর), পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী (আচমিতা, কটিয়াদী) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এই বিপ্লবীদের দুঃসাহসী ভূমিকা আজও কিশোরগঞ্জের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।[১২]

ইটনা থানাধীন জয়সিদ্ধি গ্রামের অগ্নিযুগের অগ্নিপুরুষ, অবিভক্ত ভারতের প্রথম র‍্যাংলার আনন্দ মোহন বসু ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ছাত্র আন্দোলনের জনক। তিনি ভারতীয় যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

এ সময় বাজিতপুর থানায় অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বাজিতপুরের বিপ্লবীরা তাদের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এতই তৎপর ছিলেন যে, তাদের তৎপরতায় ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনীও তটস্থ থাকতো। অগ্নিযুগে বাজিতপুরের উল্লেখযোগ্য বিপ্লবীরা হলেন- রমেশ চন্দ্র চৌধুরী, ইন্দুভূষণ দাস, নরেশ চন্দ্র চৌধুরী, অজিত রায়, ধরণী বণিক, ব্রজেন্দ্র রায় উকিল, রামদয়াল মালী, প্রকাশ শীল, হেম রায় প্রমুখ।[১৩]

বাজিতপুরের এই বিপ্লবীরা বিপ্লববাদী নেতা নরেশ চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর (১৯২৮-এর পর) যুগান্তর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে কিশোরগঞ্জে 'নরেশ সেবা বাহিনী' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। এছাড়া বাজিতপুর শহরে স্থাপিত হয়েছিল 'নরেশ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও ক্লাব'।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হলে সরকার নরেশ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও ক্লাবকে বেআইনী ঘোষণা করে। এই গ্রন্থাগারে স্থানীয় যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা নিয়মিত সমবেত হতেন বিধায় সরকার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় এ সকল বিপ্লবীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে সন্দেহ করেছিল।

কটিয়াদী থানাধীন বনগ্রামের বিপ্লবী পুরুষ প্রবীর গোস্বামী যুগান্তর দলের বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি খেলনা পিস্তলের মাধ্যমে মুমুরদিয়া ডাকঘরের সরকারি টাকা ও ডাক লুট করে ব্রিটিশ সরকারের হৃদকম্প বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিশোরগঞ্জের ইতিহাসে বিপ্লবী পুরুষ প্রবীর গোঁসাই কর্তৃক সরকারি ডাক লুটের ঘটনা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তার এই অভিযানে সহযোগী ছিলেন কটিয়াদীর আরেক বিপ্লবী পুরুষ হেমজা ধর (সাবেক মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের ভাই)। সরকারি ডাক লুণ্ঠনের অপরাধে প্রবীর গোস্বামী এবং হেমজা ধরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলে দু'জনই ৪ বছর আত্মগোপনে থাকেন। পরে গ্রেফতার হয়ে উভয়ে অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত হন। প্রবীর গোঁসাই বন্দি হন সেলুলার জেলে আর হেমজা ধর দেশের কারাগারে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কিশোরগঞ্জের অগ্নিপুরুষেরা এভাবেই তাদের জন্মঋণ শোধ করে গেছেন। তাছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম সব ক্ষেত্রেই ছিল কিশোরগঞ্জের সূর্য সন্তানদের অবদান। সেই সাথে করেছেন কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ, অবদান রেখেছেন সমাজ পরিবর্তনে ও বিনির্মাণ করেছেন নুতন ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি। তাই আমার গবেষণার সময়কাল হিসেবে ১৯০৫ সাল পরবর্তী কিশোরগঞ্জকে বেছে নেয়া।

১.৩ তথ্যসূত্র পর্যালোচনা

কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি প্রথমত প্রাথমিক উৎসসমূহকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনমানুষের সাথে আলোচনা ও কথোপকথন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিশোরগঞ্জের অধিবাসী হিসেবে যা বর্তমান গবেষণা কাজে অনেক সহায়ক হয়েছে। ছোটবেলা থেকে এ অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠায় কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করা যেমন সহজ ছিল, পাশাপাশি তেমনি দায়বদ্ধতাও ছিল কঠিন। মানুষের সাথে আলাপচারিতা, পরিচিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছাড়াও অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্য এবং কিশোরগঞ্জের উপর রচিত বেশকিছু মূল্যবান গ্রন্থের সহায়তা আমি নিয়েছি। বর্তমান অভিসন্দভের গ্রন্থপঞ্জিসহ বিভিন্ন অধ্যায়ের রেফারেন্স বা তথ্য নির্দেশনায় এসব গ্রন্থের নাম উল্লেখ রয়েছে। ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জেলা ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারসহ জেলা প্রশাসনের মহাফেজখানা ও পাবলিক লাইব্রেরিতে রক্ষিত কিছু রেকর্ডপত্রও এ গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ অধ্যায় বিন্যাস

কিশোরগঞ্জ জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০৫ সাল থেকে) নিয়ে গবেষণায় বর্তমান গবেষণাপত্রটি ০৭ (সাত) টি সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে:

প্রথম অধ্যায়টি হলো ভূমিকা। এতে রয়েছে- গবেষণার ক্ষেত্র ও সময়কাল নির্ধারণের যৌক্তিকতা, তথ্যসূত্র পর্যালোচনা এবং অধ্যায় বিন্যাস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে- কিশোরগঞ্জের পরিচিতি। যেখানে রয়েছে ভূমিকা, কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি, নামকরণের ইতিহাস, প্রশাসনিক পরিচিতি, নদ-নদী, উপজেলা পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায় বিন্যস্ত করা হয়েছে- কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সামাজিক জীবন শিরোনামে। যেখানে রয়েছে ভূমিকা, সমাজ ও সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা, সামাজিক স্তরবিন্যাস, কিশোরগঞ্জের জনসমাজ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, ধর্ম ও লৌকিক বিশ্বাস, সামাজিক উৎসব, লোকমেলা ইত্যাদি। এছাড়া এ অধ্যায়ে রয়েছে সমাজ সংস্কারক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক জীবনধারা শিরোনামে আলোচিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন শিল্প ও পেশাজীবী সমাজ ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায় বিন্যস্ত করা হয়েছে- কিশোরগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা শিরোনামে। যার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে কিশোরগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ এবং শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ।

ষষ্ট অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করা কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি। এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে সংস্কৃতি, কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন, সাহিত্য, বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ, নাটক ও বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী, সংগীত, বিখ্যাত শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারবৃন্দ, খেলাধুলা ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায় অর্থ্যাৎ শেষ অধ্যায়ে রয়েছে- উপসংহার। এতে অভিসন্দর্ভের অধ্যায় সমূহের সংক্ষিপ্ত সারসহ নিজস্ব পর্যালোচনা ও মতামত স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশঃ

১ । ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ, *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০০-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১

২ । ডক্টর এম.এ রহিম, *বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬)*, ১ম খণ্ড, পৃ.মুখবন্ধ (ছয়)

৩ । Karim A, *Social History of the Muslims of Bengal* (Down to A D. 1538) (Dacca Asiatic Society of Pakistan, 1959)

৪ । Mallick A R, *British Policy and the Muslims of Bengal (1757-1856)*, (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961)

৫ । Ahmed Salahuddin, *Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835)*, (Leiden: EJ Brill, 1965)

৬ । Ahmed Sufia, *Muslim Community in Bengal (1884-1912)*, (Dacca : Oxford University Press,1974)

৭ । ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকা- বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭)

৮ । মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা*, ঢাকা (জুলাই' ৯৮), পৃ. ২৩১

৯ । নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, *The Autobiography of an Unknown Indian*, পৃ. ২৩৭

১০ । মোঃ মনজুর-উল-হক, *বঙ্গদেশে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ*, রামশংকর দেবনাথ (সম্পা:) ছোটকাগজ '*বিভাস*', সেপ্টেম্বর, ২০০৭

১১ । বিস্তারিত- মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, *জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, প্রকাশকাল- ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

১২ । জাহাঙ্গীর আলম জাহান, *কিশোরগঞ্জ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, (গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১১), পৃ. ৪১-৪২

১৩ । প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিশোরগঞ্জের পরিচয়

২.১ ভূমিকা

ইতিহাস জাতির দর্পন বা আয়নাস্বরূপ। ইতিহাসের মাধ্যমেই জাতি তার প্রকৃত রূপ ও প্রকৃতি দেখতে পায়। ইতিহাসের আলোকেই মানুষ তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চলার পথ অনুসন্ধান করে। কিশোরগঞ্জ জেলার ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং তার ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে প্রসারিত। প্রশাসনিক পরিসরে কিশোরগঞ্জ জেলা দেশের অন্যতম বৃহত্তম জেলা হিসেবে পরিচিত ও সর্বজনস্বীকৃত। গ্রাম বাংলার শাশ্বত রূপ বৈচিত্র্য ও সোনালী ঐতিহ্যের ধারায় কিশোরগঞ্জের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস। ১৭৮৭ সালের ১ মে ভারতীয় উপমহাদেশের এক সময়কার বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের কিশোরগঞ্জ জেলা তখনকার ময়মনসিংহের অন্তর্গত ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়- বাজিতপুর, নিকলী, হোসেনপুর ও জঙ্গলবাড়ীর প্রাচীন আমেজ অনেক বেশী তথাপিও ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে কিশোরগঞ্জ আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। কেননা প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ উপরোল্লেখিত অঞ্চলগুলো বর্তমান কিশোরগঞ্জেরই অন্তর্গত। বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত ইতিহাসের উপাদান বিশ্লেষন করে জানা যায়- মহাকাব্যের যুগে এ অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তারপরে গুপ্ত, বর্মন, পাল ও সেন বংশ রাজত্ব করে এ অঞ্চলে। তবে কোন বংশই এ অঞ্চল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তৎকালে এ অঞ্চলে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ছিল স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের পীঠস্থান। মধ্যযুগে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) বৃহত্তর ময়মনসিংহে মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়। কোচ অধ্যুষিত সমগ্র কিশোরগঞ্জ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসে সম্রাট আকবরের সময়।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ মহকুমার জন্ম হয়। মহকুমার প্রথম প্রশাসক ছিলেন মি. বকসেল। বর্তমান কিশোরগঞ্জ তৎকালীন জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও কিশোরগঞ্জ এলাকাটি "কাটখালী" নামে সমধিক পরিচিত ছিল। বিজ্ঞজনের ধারণা ও জনশ্রুতি থেকে অনুমান করা হয় যে, এ জেলার জমিদার ব্রজকিশোর মতান্তরে নন্দকিশোর প্রামাণিকের "কিশোর" এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাট বা গঞ্জের "গঞ্জ" যোগ করে "কিশোরগঞ্জ" নামকরণ করা হয়েছে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা হওয়ায় সময় থানা ছিল তিনটি। যথা-নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি ১৩টি থানা নিয়ে জেলা ঘোষণা করা হয় এবং প্রথম জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব এম.এ মান্নান।

জঙ্গলবাড়ীর কোচ রাজা লক্ষন হাজরা, সুশংরাজ রঘুপতি আর এগারসিন্দুর বেবুদ রাজার কাহিনী কিংবদন্তী। বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা দ্বিজবংশী দাসের পূণ্যভূমি এ কিশোরগঞ্জ। তাঁরই কন্যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

Dhaka University Institutional Repository

তিনিই রামায়ণের সার্থক অনুবাদকারী ফোকলোর কাব্যের নায়িকা। এ জেলার মাটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে লোক সংস্কৃতি। সখিনা, মলুয়া, মাধবী, মালঞ্চী কইন্যার অঞ্চল কিশোরগঞ্জ। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন যে হারানো গীতিকা সম্পদকে উদ্ধার করে ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমাদেরকে বিশ্বের কাছে বরেণ্য করে তুলেছেন তাঁর চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি আমাদের পূর্ব ময়মনসিংহের অর্থ্যাৎ বর্তমান কিশোরগঞ্জের। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিগর্ভা কিশোরগঞ্জের বীরত্বগাঁথা আর বীর সন্তানদের নাম ইতিহাসের বিশাল অধ্যায়। এ অধ্যায়ের ভূবন কাঁপানো নাম- মহারাজ তৈলোক্যনাথ, ব্যারিষ্টার ভূপেশগুপ্ত, নগেন সরকার, বিবরেন চক্রবর্তী, জমিয়াত আলী, গণেশ সরকার, ওয়ালীনেওয়াজ খান, রেবতী বর্মনসহ অসংখ্য খ্যাতিমান স্বাধীনতা সংগ্রামী এ জনপদের বীর সন্তান।

শিল্পক্ষেত্রে এ জেলার অসংখ্য কীর্তিমান দেশ ও দেশের বাইরে রেখেছেন অসামান্য অবদান। তাদেরমধ্যে নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ডঃ ওসমান গণি এবং শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম অন্যতম।

কিশোরগঞ্জের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য হলো এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ শোলাকিয়া ঈদগাহ। প্রায় ৬.৬১ একর জমিতে অবস্থিত এ ঈদগাহে ঈদের জামায়াতে প্রায় দু'লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করে থাকেন। এছাড়াও রয়েছে এগার সিন্দুর ও জংগলবাড়ীয়ার মত ঐতিহ্যবাহী স্থান।

২.২ ভৌগোলিক অবস্থান

হাওর-বাওর ও সমতলভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি বিস্তীর্ন জনপদ হলো কিশোরগঞ্জ। ২৪ ডিগ্রী ০২ মিনিট থেকে ২৪ ডিগ্রী ৩৮ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ডিগ্রী ৩৫ মিনিট থেকে ৯১ ডিগ্রী ১৫ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান।[১] নরসুন্দা নদী বিধৌত এ জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও সুনামগঞ্জ, দক্ষিণে নরসিংদী, পূর্বে হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়ীয়া এবং পশ্চিমে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলা অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে এবং রাজধানী ঢাকার উত্তর পূর্ব অংশে কিশোরগঞ্জের অবস্থান। এ জেলার আয়তন ২৫৫৭ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে স্থলভাগ ২৪৭৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জলভাগ ৮৩ বর্গ কিলোমিটার।[২]

২.৩ জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি

কিশোরগঞ্জের জলবায়ু বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর মতই ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অধীন। এখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের প্রাবল্য দেখা যায়। গ্রীষ্ম শুরু হয় মার্চ মাসে, শেষ হয় এপ্রিলে। গ্রীষ্মকালে বাতাস উত্তপ্ত থাকে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তখন প্রায় ৯০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়। শুষ্ক বা শীত মৌসুম শুরু হয় নভেম্বরে ও শেষ হয় ফেব্রুয়ারিতে। ওই সময়ে আবহাওয়া শুষ্ক ও শীতল থাকে, কখনও আবার সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। কিশোরগঞ্জে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯৪.০ ইঞ্চি (২৩৮৭.৬ মি.মি.), সর্বোচ্চ ১৫৪.৭ ইঞ্চি (৩৯২৯, ৩৮ মি.মি.) ও সর্বনিম্ন ৬৪.৯ ইঞ্চি (১৬৪৮ মি.মি.) ১ ইঞ্চি (২৫.৪ মি.মি.)। তাপমাত্রা ১৯৯০ সালের হিসাব মতে সর্বোচ্চ ৩৩.৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন ১১.৮৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বার্ষিক আর্দ্রতা ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭৩.৬৩ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৩.৭৪ শতাংশ।[৩]

ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার ভূমি মূলত মাটিয়াল, ডাবো ও বালুয়া এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। 'ময়মনসিংহের বিবরণ' গ্রন্থের লেখক কেদারনাথ মজুমদার কিশোরগঞ্জ জেলার ভূমিকে ৮ ভাগে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যথা- বালুয়া, বেতি বা দোয়াশিয়া, পৈন, মাটিয়াল, কান্দা, বাইদ, নালা, ডাবো ও পেশা, করচা, এবং নাঠা। কিশোরগঞ্জের মাটি এঁটেল, বেলে ও দোঁ-আশ প্রকৃতির। মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ও ক্যালসিয়ামের শতকরা হার যথাক্রমে ০.১২, ০.০৯, ১.০৫ ও ০.৬২। এর পিএস মান ৫.৫-৬.৮।[৪]

২.৪ নদ-নদী ও হাওর

নদীমাতৃক বাংলাদেশ এ কথাটি কিশোরগঞ্জের ক্ষেত্রে যথার্থ। কেননা হাওর অধ্যুষিত এই জেলার নদ-নদীর মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ, মেঘনা, ধনু, ঘোড়াউত্রা, বৌলাই, নরসুন্দা, মগরা, বারুনী, চিনাই, সিংগুয়া, সূতী, আড়িয়াল খাঁ, ফুলেশ্বরী, সোয়াইজানী, কালী, কুলা নদী। কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে নেত্রকোণা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কংস, মগরা, বাউলাই এবং এদের অসংখ্য শাখা ও সংযুক্ত নদী ও খাল। এই নদীগুলো দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবের নিকট মিলেছে। কিশোরগঞ্জের উল্লেখযোগ্য নদীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

ব্রহ্মপুত্র

কিশোরগঞ্জের সীমানা বরাবরে হোসেনপুর, পাকুন্দিয়ার টোক হয়ে কটিয়াদী, কুলিয়ারচর ও ভৈরবের প্রান্ত ছুঁয়ে ভৈরব বাজারের নিকট পতিত হয়েছে। এই অংশটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে সমধিক পরিচিত যা মৃতপ্রায়। হোসেনপুর থানার সীমানা থেকে ভৈরব বাজার পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭ মাইল (প্রায় ৭৫ কি.মি.)।[৫]

মেঘনা

প্রায় ১০৪৬ কি.মি. (প্রায় ৬৫০ মাইল) দীর্ঘ মেঘনা নদী কিশোরগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এটি জেলার অষ্টগ্রাম ও কুলিয়ারচর থানার পাশ দিয়ে আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে। কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজার মেঘনার তীরের বিখ্যাত নদী বন্দর।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

ধনু/ঘোড়াউত্রা/বাউলাই

ধনু মেঘনার উপনদী। অপর নাম বাউলাই। এটি সুনামগঞ্জ থেকে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী হয়ে কিশোগঞ্জের ইটনা থানায় প্রবেশ করেছে। মিঠামইন এবং নিকলীর নিকট এ নদী ঘোড়াউত্রা নামে পরিচিত। বাজিতপুরের উপর দিয়ে নদীটি কুলিয়ারচরের কাছে মেঘনায় পতিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জের সীমানায় এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ মাইল (প্রায় ৫৬ কি.মি.)। বাকময় গতির কারণে এর নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে।[৭]

নরসুন্দা

নরসুন্দা নদী হোসেনপুর- পাকুন্দিয়ার সীমানার নিকট ব্রহ্মপুত্রের সাথে সংযুক্ত। অন্যদিকে ইটনা উপজেলার বাদলার নিকট ধনু নদীর সাথে সংযুক্ত। স্থানীয়ভাবে এই সংযোগস্থল ''চৌগাংগা'' নামে পরিচিত। নরসুন্দাকে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী হিসাবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জে মূল নরসুন্দা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল (প্রায় ৫৮ কি.মি.)।[৮] একসময় কিশোরগঞ্জ শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল এই নরসুন্দা এবং অদ্যবধি তা কিশোরগঞ্জ শহরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। একে নিয়ে অনেক গল্প, কাহিনী, কিংবদন্তী, রোমান্টিকতা কিশোরগঞ্জবাসীর মনে এখনো গেঁথে আছে। বর্তমানে মৃত নরসুন্দাকে ঘিরে কিশোরগঞ্জবাসী নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। বর্তমান সরকার নরসুন্দাকে খনন করে মনোরম লেক করার পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছে।

মগরা

মগরা নদীর প্রায় ৪০০ বর্গমাইল (৬৪৩ বর্গ কি.মি.) অববাহিকা রয়েছে। কিশোরগঞ্জের ইটনা থানায় প্রবেশের পূর্বে মগরা নদীর সাথে আরো নদীর স্রোতধারার মিলন ঘটেছে এবং সর্বশেষে নেত্রকোণা জেলার মদন থানার প্রান্ত ছুঁয়ে ইটনার গন্দবপুর গ্রামের নিকট ধনুতে পড়েছে। মগরা নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৯ মাইল (প্রায় ১২৭ কি.মি.)।[৯]

বারুনী

নেত্রকোণা জেলার সীমানা পেরিয়ে বারুনী নদী ইটনা ও তাড়াইল থানার সীমানা বরাবর কিশোরগঞ্জে প্রবেশ করেছে এবং নরসুন্দায় পতিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জ অংশে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ মাইল (প্রায় ৯.৬ কি.মি.)।

চিনাই

নেত্রকোণা জেলা অতিক্রম করে চিনাই নদী ইটনায় প্রবেশ করেছে। মগরা নদীর সাথে মিলিত হয়ে ধনুতে পতিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জ অংশে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মাইল (প্রায় ৪.৮ কি.মি.)।

সিংগুয়া

সিংগুয়া নদী পাকুন্দিয়ার এগারসিন্দুরের খামাবিল হতে উৎপন্ন হয়ে গচিহাটা ও নিকলী হয়ে ঘোড়াউত্রায় মিলিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ মাইল (প্রায় ২২.৪ কি.মি.)।

Dhaka University Institutional Repository

সূতী নদী

গচিহাটা রেল স্টেশনের ৫ মাইল উত্তর পূর্বে-সিংগুয়া নদী হতে উৎপন্ন হয়ে নকলা ফেরীঘাট অতিক্রম করে সূতী নদী চানপুর হাওরের পূর্ব পাশ দিয়ে রউহা বিল হয়ে ঘোড়াউত্রায় পতিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ মাইল (১১.২ কি.মি.)।

আড়িয়াল খাঁ

ব্রহ্মপুত্রের সাথে সংযুক্ত আড়িয়াল খাঁ কটিয়াদী থানার একটি মৃত নদী। কটিয়াদীর কুটির বিল এ নদীর উৎস। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ মাইল (প্রায় ১১.২ কি.মি.)।

ধলেশ্বরী

এ নদী মেঘনা নদীর একটি শাখা নদী। অষ্টগ্রামে মেঘনা নদী থেকে এ নদীর উৎপত্তি। অষ্টগ্রামে এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭ মাইল।

সোয়াইজানী

এটি ঘোড়াউত্রার শাখা নদী, নিকলী থানার অন্তর্ভুক্ত। নিকলীতে ঘোড়াউত্রা ও নরসুন্দার সাথে এই সোয়াইজানীর মিলন ঘটেছে।

কালী নদী

ঘোড়াউত্রা নদী যেখানে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে কালী নদী ভৈরব ও বাজিতপুরের সীমানার মধ্য দিয়ে কুলিয়ারচরে প্রবেশ করেছে। ভৈরবের গজারিয়া ইউনিয়নের মানিকদী পার হয়ে আরো দক্ষিণে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে শেষ হয়েছে।

কূলা নদী

বাজিতপুরের মাইজচর ইউনিয়নের মাইজচর গ্রামের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে ঘোড়াউত্রা নদী সরাসরি দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ অংশটি স্থানীয়ভাবে কূলা নদী নামে পরিচিত। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৫ কি.মি.।

বর্ণি নদী

কিংবদন্তী আছে যে, বৃষ্টির দেবতা বরণ থেকে বারণী বা বরণী নামের উৎপত্তি হয়েছে। নেত্রকোণা জেলার ধানকুনিয়া গ্রামের নিকট থেকে ধলা কলুমা গ্রামের পূর্বদিকে তাড়াইল উপজেলায় প্রবেশ করেছে। তাড়াইল উপজেলার অংশে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কিলোমিটার প্রবাহিত। তাড়াইলের পূর্ব প্রান্তে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে নরসুন্দার সহিত মিলিত হয়েছে। সারা বছর এর নাব্যতা থাকে। এর উভয় তীরে খিরা, ফুটি, তরমুজ, চিনাবাদাম, কাউন, তিশি এবং বাদামের চাষ হয়ে থাকে। তাছাড়া বোয়াল, আইড়, গুছি ও গন্যা মাছের জন্য এই নদী বিখ্যাত ছিল।

ফুলেশ্বরী নদী

ফুলেশ্বরী মদনের জালিয়া হাওর হতে উৎপন্ন হয়ে তেউরিয়ার ভিতর দিয়ে ধলা গ্রামে পশ্চিম দিকে জাওয়ার, সেকান্দরনগরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বোরগাঁও, ছনাটী, ইছাপশর, বিলাসীপাড়া, বেলংকা, হাছলা ও নগরকুলের ভিতর দিয়ে নরসুন্দা নদীতে মিলিত হয়েছে।[১০]

এছাড়াও আরো অসংখ্য ছোট ছোট নদ/নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওর এলাকা জুড়ে। তাছাড়া শুধু নদী নয় কিশোরগঞ্জ জেলায় রয়েছে অসংখ্য হাওর। এ জেলার ভূ-প্রকৃতির অন্যতম বৈচিত্র্য হলো এখানকার হাওর, বিল ও জলাভূমি। হাওর জেলার আকর্ষণীয় অঞ্চল ও অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবেও পরিচিত। বর্ষাকালে হাওরকে সাগরের মতোই বিশাল মনে হয়। এখানকার বড় হাওরটির বিস্তৃতি কিশোরগঞ্জের পূর্বাঞ্চলীয় উপজেলা অষ্টগ্রাম, মিঠামইন, ইটনা, নিকলী এবং বাজিতপুর উপজেলার হুমায়ূনপুর (হুমাইপুর) হাওর, অষ্টগ্রামের সামোই হাওর, নিকলী উপজেলার মাহমুদপুর হাওর, সুরমা বাওনার হাওর, মিঠামইন উপজেলার বাড়ির হাওর পর্যন্ত। জেলার তলার হাওরটি বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম ও নিকলী উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ জেলায় বিলের সংখ্যাও প্রচুর। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেংলা, হালদা, রোয়াদহ, আরগণ, জুক্কা, পাবিয়াদহ, বড়দহ, ধলধলিয়া, পায়কানি, বায়োলিয়া, কুটির বিল।[১১]

২.৫ নামকরণ

ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদও মেঘনা নদী বিধৌত একটি সমৃদ্ধ জনপদের নাম কিশোরগঞ্জ। ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। গবেষকদের ধারণা ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে কিশোরগঞ্জ নামের উদ্ভব হয়েছে। তবে কিশোরগঞ্জ নামের উৎপত্তি বা নামকরণে ব্যাপক কোন গবেষণা হয়নি।

কিশোরগঞ্জের কৃতীসন্তান কেদারনাথ মজুমদার রচিত "ময়মনসিংহের ইতিহাস" ও "ময়মনসিংহের বিবরণ" (১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে প্রকাশিত) নামক ইতিহাস গ্রন্থে কিশোরগঞ্জের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে লেখা নেই। ঐতিহাসিক অভিধান "দেওয়ান ঈসা খাঁ" এবং আরো বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ইতিহাসের বই প্রণেতা কিশোরগঞ্জের আরেক কৃতিসন্তান ইতিহাসবিদ, গবেষক মতিউর রহমান রচিত বইগুলোতেও কিশোরগঞ্জ নামের উৎপত্তি নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। তবে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রাক্তন সিএসপি নুরুল ইসলাম খান সম্পাদিত "*Bangladesh District Gazetteers, Mymensingh*" প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ গেজেটিয়ারে কিশোরগঞ্জ নাম সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে-

> The town was noted for the manufacture of muslin cloth and East India Company had an indigo factory here. One Krishna Das came to settle at Kishoreganj and became a dealer in Muslin cloth. Krisna Das is said to have presented beautiful muslin cloth to Nowab Sirajdowla, which brought him the landlordship of Batrish Patgana and the titel of pramanik. The village Batrish in kishoreganj still bears testimony to the facts. One of the seven sons of krisna Das was Braja Kishore Pramanik, after whose name probably the town was named. [১২]

গবেষকদের মতে নন্দ কিশোর, কিশোয়ার খাঁ থেকে কিশোরগঞ্জ নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু অদ্যাবধি কিশোরগঞ্জ নামের সঠিক সূত্র বা নির্ভুল তথ্য কারও নিকট থেকেই পাওয়া যায়নি। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের মতে কিশোরগঞ্জ নামের পূর্ব নাম ছিল হয়বতনগর। রেনেলের মানচিত্রেও কিশোরগঞ্জ শহরের অবস্থান দেখা যায় হয়বতনগর গ্রাম। বীর ঈসাখাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির এবং আত্মীয় স্বজনদের অবস্থান ছিল হয়বতনগরে। হয়বতনগরের জমিদারদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এই এলাকায়। এর দক্ষিণ পাশের গ্রাম ছিল কাটাখালি। কাটখালি গ্রামটি কোন ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ছিল না। মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের মতে কিশোয়ার থেকে কিশোরগঞ্জ নামের উৎপত্তি হয়েছে। কিশোয়ার উর্দু শব্দ, এর অর্থ নবীন বা নতুন। কিশোরগঞ্জ মহকুমা গঠনের সময় একটি নির্দিষ্ট এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে নামকরণ করা স্বাভাবিক। নির্দিষ্ট নতুন এলাকাকে ফার্সী ভাষায় কিশোয়ার বলে থাকে। এই কিশোয়ার থেকে কিশোর এবং এলাকা শব্দের ফার্সী অর্থ গঞ্জ থেকে কিশোরগঞ্জ হয়েছে। ঐ সময়ে কিশোরগঞ্জের অন্যান্য এলাকার নাম গুলো ও ফার্সী ভাষা থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন- বিন্নাটি (বিন+আটি), নগুয়া (নওগাঁও), ভিন্নগাঁও (ভিন+গাঁও) ইত্যাদি।

রেনেলের মানচিত্রে (১৭৮১) কিংবা ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠাকালে (১৭৮৭) কালেক্টর রিপোর্টে কিশোরগঞ্জ নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এমন কি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন বৃহত্তর ময়মনসিংহে জামালপুর মহকুমার সৃষ্টি হয় তখনো কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে কোন আলোচনা পাওয়া যায়না। তবে এই এলাকায় ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্রজকিশোর (মতান্তরে নন্দকিশোর) প্রামাণিক কর্তৃক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা পরবর্তী গেজেটিয়ারসমূহে লক্ষ্য করা যায় এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে ঝুলন মেলার জমজমাট সমাবেশের কথা জানা যায়। বর্তমান কিশোরগঞ্জ তৎকালীন জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল। সময়ের আবর্তে এই পরগনা নাটোরের মহারাজার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। বিখ্যাত প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের সাথে ব্যবসার সূত্র থেকে নাটোরের মহারাজার যোগাযোগ হয়। নাটোরের মহারাজা এই এলাকার কয়েকটি তালুক দেবসেবার জন্য কৃষ্ণদাস প্রামাণিককে 'লাখেরাজ' দেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নাটোর মহারাজার জমিদারী নিলাম হয়ে গেলে 'খাঁজে কাফরে আরাতুন' নামে এক আর্মানীয় বণিক তা ক্রয় করেন। এতে আরয়াতুনের সাথে প্রামাণিকের দীর্ঘকাল মোকদ্দমা চলে।

এই প্রসংঙ্গে উল্লেখ করতে যেয়ে শ্রীকেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন-

"এই জোয়ারের কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ মহাল লইয়া আরাতুনের সহিত কাটাখালীর (কিশোরগঞ্জ) সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিকদিগের বহুদিন বিবাদ চলিয়াছিল" ।[১৩]

এতে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও কিশোরগঞ্জ এলাকাটি 'কাটাখালী' নামে সমধিক পরিচিত ছিল। জেমস টেলরের বর্ণনায় এলাকাটি জঙ্গলবাড়ী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কিশোরগঞ্জ নামকরণটি হয়েছে। কিন্তু এই নামকরণের উৎস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে বিজ্ঞজনদের ধারণা ও জনশ্রুতি থেকে অনুমান করা যায় যে, বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত বত্রিশ প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের ষষ্ঠ ছেলে এবং প্রামাণিকের কীর্তি একুশ রত্নের স্রষ্টা নন্দকিশোর এর 'কিশোর' ও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় হাট বা গঞ্জের 'গঞ্জ' যোগ হয়ে 'কিশোরগঞ্জ' নামকরণ হয়েছে। প্রামাণিক পরিবারের বংশ তালিকা অনুযায়ী নন্দকিশোর প্রামাণিকের সময়কাল আনুমানিক ১৭৫০-১৮১০ খ্রিস্টাব্দ। এ হিসেবে তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের বহু এলাকার নামকরণ কোন বিশেষ ব্যক্তির নামের সাথে 'গঞ্জ' যোগ করা হয়েছে। সে হিসেবে 'কাটাখালীর' নাম পরিবর্তন করে এলাকার নাম 'কিশোরগঞ্জ' করা বিচিত্র নয়।[১৪]

জেলা গেজেটিয়ারে অবশ্য বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণদাসের ৭ ছেলের একজন বজ্রকিশোর এবং সম্ভবত তাঁর নামানুসারেই 'কিশোরগঞ্জ' নামকরণ করা হয়েছে। তবে প্রথম জনশ্রুতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া মুক্তাগাছার জমিদারের নামের সাথে 'কিশোর' যোগ হতে দেখা যায়। সে থেকেও কিশোরগঞ্জের নামকরণের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ এ এলাকাটি তাদের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল না।

অন্যদিকে একজন কর্মচারী কিশোরী মোহন নাথ মহকুমার প্রতিষ্ঠার সময় সরকারি দায়-দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়ায় তাঁর নাম থেকে কিশোরীর দীর্ঘ ঈ-কার ফেলে দিয়ে কিশোর বানিয়ে সেটি দিয়ে মহকুমার নামকরণ করা হয়েছে মর্মে একটি ধারণা রয়েছে। যা কোন বিচারেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

তাই জেলা গেজেটিয়ার ও অন্যান্য মত থেকে প্রাপ্ত প্রথম মতটিকেই আমার সঠিক বলে মনে হয়। জেলা গেজেটিয়ার অনুযায়ী কৃষ্ণদাসের সাত ছেলের একজন ব্রজকিশোরের নামানুসারেই 'কিশোরগঞ্জ' নামকরণ করা হয়েছে- এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

২.৬ প্রশাসনিক পরিচিতি

১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থানার সংখ্যা ছিল ৩টি। এগুলো হলো- নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ। পরে নিকলীকে কটিয়াদীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হলেও ১৯১৭ সালে আবার নিকলী থানা পুনঃস্থাপিত হয়। *'Bengal District Administration Committee 1913-1914 Report'*-এ উল্লেখ করা হয়েছে- বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাকে ভেঙ্গে ময়মনসিংহ, গোপালপুর ও কিশোরগঞ্জ নামে ৩টি জেলা করার প্রস্তাব করা হয়। এ সময় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীনে ১০টি থানাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ছিল। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ জেলার মোট উপজেলা ১৩টি, ইউনিয়ন ১০৮টি, মৌজা ৯৬৭টি এবং এ জেলায় রয়েছে মোট ৮টি পৌরসভা।[১৫] এ জেলায় সংসদীয় আসন ৬টি।

কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলা হলো-

১. কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা
২. অষ্টগ্রাম উপজেলা
৩. ইটনা উপজেলা
৪. করিমগঞ্জ উপজেলা
৫. কটিয়াদী উপজেলা
৬. কুলিয়ারচর উপজেলা
৭. তাড়াইল উপজেলা
৮. নিকলী উপজেলা
৯. পাকুন্দিয়া উপজেলা
১০. বাজিতপুর উপজেলা
১১. ভৈরব উপজেলা
১২. মিটামইন উপজেলা
১৩. হোসেনপুর উপজেলা

এক নজরে কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার নাম, ইউনিয়ন, পৌরসভা, মৌজা ও গ্রামের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো-[১৬]

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভার সংখ্যা	মৌজার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা
০১	কুলিয়ারচর	০৬	০১	৪৬	৯৭
০২	হোসেনপুর	০৬	০১	৭৩	৯০
০৩	পাকুন্দিয়া	০৯	০১	৯৭	১৪৯
০৪	কিশোরগঞ্জ সদর	১১	০১	১০৭	২১৯
০৫	বাজিতপুর	১১	০১	৯২	১৯৫

০৬	অষ্টগ্রাম	০৮	০০	৫৯	৭২
০৭	করিমগঞ্জ	১১	০১	৮৫	১৮৫
০৮	কটিয়াদী	০৯	০১	৯৫	১৬০
০৯	তাড়াইল	০৭	০০	৭৬	১০৫
১০	ইটনা	০৯	০০	৮৬	১১৬
১১	নিকলী	০৭	০০	৪৩	১৩২
১২	মিঠামইন	০৭	০০	৫৯	১৩৭
১৩	ভৈরব	০৭	০১	৩২	৮৮

২.৭ উপজেলা পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা

ইতিহাসখ্যাত বীর বার ভূঞা প্রধান মসনদে আলা ঈসা খাঁ, বাংলা সাহিত্যের আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নিরোদ সি. চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ অসংখ্য কীর্তিমানের স্মৃতিধন্য জন্মভূমি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা। ভৌগোলিকভাবে ২০° ২১´ ও ২৪° ৩২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৪২´ ও ৯০° ৫২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার অবস্থান। উপজেলাটির আয়তন ১৯৩.৭৩ বর্গকিলোমিটার।[১৭] উপজেলাটির উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা ও কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলা, দক্ষিণে পাকুন্দিয়া ও কটিয়াদী উপজেলা, পূর্বে করিমগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে হোসেনপুর উপজেলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কিশোরগঞ্জ নামকরণ হয়েছে। বিখ্যাত প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের ৬ষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোর প্রামাণিক নরসুন্দা নদীর দুই তীরে 'গঞ্জ' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজকিশোর প্রামাণিকের 'কিশোর' এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গঞ্জ' এ দুইয়ের সমন্বয়ে জনপদের নাম কিশোরগঞ্জ।[১৮] অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৮৪৫ খ্রি. থেকে ১৮৬০ খ্রি. এই ১৫ বৎসরের যে কোন একসময় কিশোরগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর ১৯৮৪ সালে উপজেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন হচ্ছে-

১. রশিদাবাদ

২. লতিবাবাদ

৩. মাইজখাপন
৪. মহিনন্দ
৫. যশোদল
৬. বৌলাই
৭. বিন্নাটি
৮. মারিয়া
৯. চৌদ্দশত
১০. কর্শাকড়িয়াইল
১১. দানাপাটুলী

মানচিত্রে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা
তথ্যসূত্রঃ www.kishoreganjsadar.gov.bd

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির শ্রেষ্ঠ বীরত্বগাথা। মহান যুক্তিযুদ্ধে সদর উপজেলার বীরমুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। অগণিত সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এ উপজেলায় মোট ৭টি বধ্যভূমি রয়েছে। সদর উপজেলাধীন বত্রিশ, মনিপুরঘাট ও মুকসেদপুরস্থ বড়পুলের নিকট বধ্যভূমি রয়েছে। তাছাড়া মহিনন্দ ইউনিয়নের ক্ষিরদগঞ্জ বাজারের নিকট ও কর্শাকড়িয়াইল ইউনিয়নে বড়ইতলা নামক স্থানে বধ্যভূমিতে জেলা পরিষদের অর্থায়নে নির্মিত স্মৃতিসৌধ কালের সাক্ষী হয়ে আছে। সংস্কৃতির দিক থেকে কিশোরগঞ্জের রয়েছে গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। বিশেষ করে লোক সংস্কৃতির এক বিশাল ভাণ্ডার হচ্ছে কিশোরগঞ্জ। এ উপজেলার আঞ্চলিক মেয়েলি গীত, লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, পালাগান ও লোকসাহিত্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে।

অষ্টগ্রাম উপজেলা

কিশোরগঞ্জের হাওর বেষ্টিত একটি উপজেলা অষ্টগ্রাম। কিশোরগঞ্জ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অষ্টগ্রাম উপজেলার অবস্থান। কিশোরগঞ্জ জেলা সদর হতে অষ্টগ্রামের দূরত্ব প্রায় ৬০ কি.মি.। যার ভৌগোলিক অবস্থান ২৪° ১৩´ থেকে ২৪° ২৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৫৯´ থেকে ৯১° ১৫´পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। অষ্টগ্রাম উপজেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও ইটনা, দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাছিরনগর, পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলা ও হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলা, পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর ও নিকলি উপজেলা। এ উপজেলার জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ৫১.৪১%, মহিলা ৪৮.৫৯%; মুসলিম ৮২.৮৪%, হিন্দু ১৫.৬৪%; পৌত্তলিক ও অন্যান্য ১.৫২%। এখানে ১টি কলেজ, ৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ১২টি মাদ্রাসা, ৪৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

অষ্টগ্রাম উপজেলার নামকরণের ক্ষেত্রে তিনটি প্রচলিত মতবাদ রয়েছে। প্রথম মতবাদ- ১। অষ্টগ্রাম ২। আসিয়া ৩। দুবাই ভাটেরা ৪। নরসিংহ পূর্ববাদ ৫। খাসাল ৬। বীরগাঁও ৭। বত্রিশ গাঁও ৮। বারেচর নিয়ে গঠিত হওয়ায় এই জনপদের নাম অষ্টগ্রাম রাখা হয় বলে মতবাদ রয়েছে। বর্তমানে এগুলো মৌজা হিসাবে পরিগণিত। দ্বিতীয় মতবাদ- খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বল্লাল সেনের অধিনস্ত অনন্ত দত্ত অষ্টগ্রামের কান্তুল নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। অনন্ত দত্তের সঙ্গে তাঁর গুরু শ্রী কণ্ঠদ্বিজ এবং অনুচরবর্গ এই এলাকায় আসেন। তাঁরা এই এলাকার আটটি গ্রামে বসতি স্থাপন করার পর অষ্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হওয়ার জনশ্রুতি আছে। তৃতীয় মতবাদ- হযরত শাহজালাল (রঃ) এর সঙ্গীয় আটজন আউলিয়া অষ্টগ্রামে এসেছিলেন। তাই অষ্টগ্রামকে 'আট আউলিয়ার গাঁও' বলা হয়। তবে আটটি গ্রামের সমষ্টির কারণেই অষ্টগ্রাম এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।[১৯]

এই উপজেলার ইউনিয়নগুলো হচ্ছে-

১. আদমপুর ইউনিয়ন
২. অষ্টগ্রাম সদর ইউনিয়ন
৩. বাংগালপাড়া ইউনিয়ন
৪. দেওঘর ইউনিয়ন
৫. কলমা ইউনিয়ন
৬. কান্তুল ইউনিয়ন
৭. খয়েরপুর আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন
৮. পূর্ব অষ্টগ্রাম ইউনিয়ন

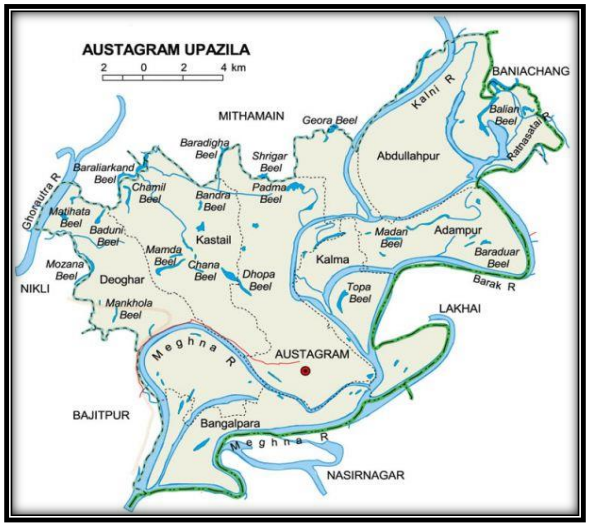

মানচিত্রে অষ্টগ্রাম উপজেলা
তথ্যসূত্র: map.janlewala.com

সুস্বাদু পনির তৈরীর জন্য অষ্টগ্রামের বিশেষ খ্যাতি আছে। দেশ বিভাগের আগে (১৯৪৭) কলকাতায় "ঢাকাই পনির" নামে পরিচিত এখানকার এই পনিরের খুব চাহিদা ছিল।

ইটনা উপজেলা

ইটনা উপজেলা আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজেলাগুলির অন্যতম। এর আয়তন ৫০৩ বর্গকিলোমিটার। ভূ-পৃষ্টের ২৪° ২৩´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪° ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৪৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯১° ১৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে ইটনা উপজেলার অবস্থান। যার উত্তরে নেত্রকোণা জেলার মদন উপজেলা ও খালিয়াজুড়ি উপজেলা, দক্ষিণে মিঠামইন উপজেলা এবং করিমগঞ্জ উপজেলা; পূর্বে আজমিরীগঞ্জ উপজেলা ও শাল্লা উপজেলা আর পশ্চিমে তাড়াইল উপজেলা ও করিমগঞ্জ উপজেলা।

এ উপজেলার জনসংখ্যা ১৩২৯৪৮, তন্মধ্যে পুরুষ ৫২.১৪%, মহিলা ৪৭.৮৬%, মুসলিম ৮০%, হিন্দু ১৮%, বৌদ্ধ ০.১২%, খ্রিস্টান ০.১২%, অন্যান্য ১.৭৬% । এ উপজেলার গড় স্বাক্ষরতা ২১.৫%, পুরুষ ২২.১%, মহিলা ২০.৭% । এখানে রয়েছে কলেজ ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮টি, মাদ্রাসা ২১টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৪টি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০টি ।

১৮৬৪ সনে বর্তমান ইটনা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে বাদলা গ্রামে একটি আউট-পোষ্ট থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপিত হয়েছিল । ১৯০৬ সনের ১৫ই জুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের ৬৬৭৬নং গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাদলা পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করে ইটনায় পূর্নাঙ্গ থানা প্রতিষ্ঠা করা হয় । তখন ইটনা থানায় ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১১টি ।

ইটনা ইউনিয়নসমূহ ছিল- ১. রায়টুটি
২. ধনপুর
৩. মৃগা
৪. ইটনা
৫. বাদলা
৬. বড়িবাড়ী
৭. এলংজুড়ি
৮. জয়সিদ্ধি
৯. কাটখাল
১০. ঢাকী
১১. কেওয়াটজুড়ি

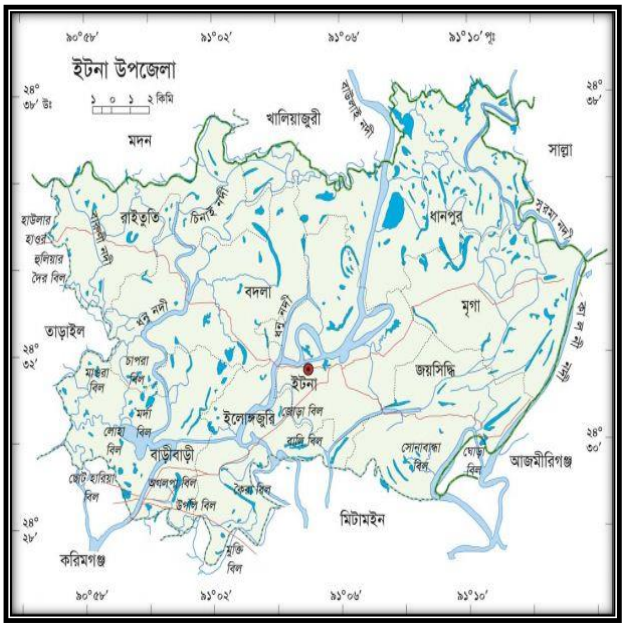

মানচিত্রে ইটনা উপজেলা

তথ্যসূত্রঃ map.janlewala.com

১৯৮৪ সনে মিঠামইন থানা প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকী, কাটখাল ও কেওয়াটজুড়ি এই ৩টি ইউনিয়ন মিঠামইন থানার সাথে যুক্ত হয় । অপরদিকে নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলা থেকে গাজীপুর ইউনিয়নটি ইটনার সাথে যুক্ত হয়ে যায় । পরে বড়িবাড়ী ইউনিয়নটি ভেঙ্গে চৌগাংগা নামে আরও একটি নতুন ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় । সম্প্রতি গাজীপুর ইউনিয়নটি নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলার সাথে সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে ইটনা উপজেলা গঠিত হয়েছে ।

ইটনা থানার বর্তমান ইউনিয়নসমূহ হচ্ছে- ১. রায়টুটি
২. ধনপুর
৩. মৃগা
৪. ইটনা
৫. বড়িবাড়ী
৬. বাদলা
৭. এলংজুড়ি
৮. জয়সিদ্ধি
৯. চৌগাংগা

ইটনা উপজেলার ঐতিহ্য এই এলাকার মাছ। নদী সংলগ্ন এই উপজেলা বেশিরভাগ মানুষ কৃষি নির্ভর। এই এলাকার লোকজন বছরের ছয়মাস কৃষি কাজ করে ছয় মাস মাছ চাষ, নদীতে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকে। এই উপজেলার মাছ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরসহ রাজধানীতে রপ্তানী হয়। একটা সময় ছিল যখন এই মাছ প্রচুর পরিমাণে এই এলাকার মানুষ স্বল্পমূল্যে ক্রয় করতে পারত। বর্তমানে রপ্তানীর কারণে এই এলাকায় মাছের দাম যে কোন জেলা শহর থেকে বেশি। প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ২৫ মণ মাছ আমদানী-রপ্তানী হচ্ছে।

মিঠামইন উপজেলা

কিশোরগঞ্জের হাওর বেষ্টিত উপজেলাগুলোর একটি মিঠামইন। ভৌগোলিকভাবে ২৪° ২২´ থেকে ২৪° ৩০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১° ০০´ থেকে ৯১° ১৫´ পূর্বে দ্রাঘিমাংশের মধ্যে মিঠামইন উপজেলার অবস্থান। উপজেলাটির আয়তন ২২২.৯২ বর্গকিলোমিটার। এর উত্তরে ইটনা ও আজমিরিগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে অষ্টগ্রাম উপজেলা, পূর্বে বানিয়াচং ও অষ্টগ্রাম, পশ্চিমে করিমগঞ্জ ও নিকলী উপজেলা। ১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর মিঠামইন উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলায় উন্নীতকরণের ইতিহাস নতুন এবং নিরবচ্ছিন্ন হাওর এলাকা হলেও এটি একটি প্রাচীন জনপদ। জেমস জে. রেনেল অঙ্কিত বাংলার প্রাচীন মানচিত্রেও (১৭৮১) মিঠামইনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এলাকাটি মিঠামন/ মিঠামইন/ মিটামইন বা মিটামন ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত। মিঠামইন নামের উৎস সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে বর্তমান উপজেলা সদরের পাশ্ববর্তী এলাকায় এক সময় প্রচুর খাগড়া বনের সমাবেশ ছিল। যা থেকে পাওয়া যেত মিষ্টি বা মিঠা রস। এই খাগড়ার বন থেকে মিঠাবন এবং সেখান থেকে মিঠামন বা মিঠামইন হয়েছে। অন্যমতে, এলাকাটিতে এক সময় প্রচুর মইন গাছ ছিল। নদীর ধারে, পতিত জমিতে বা কান্দায় মইন গাছের বিপুল সমারোহ ছিল যা স্থানীয়ভাবে কায়জা নামে পরিচিত ছিল। ইক্ষু গাছের মত উচ্চতা বিশিষ্ট সরু গাছটির ভিতরে মিষ্টি রস ছিল। যারা মইন গাছের রস আস্বাদন করেছেন তারা এখনও স্মৃতিচারণ করে থাকেন। এই মিষ্টি বা মিঠা মইন থেকে মিঠামইন শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকের অভিমত। স্থানীয়ভাবে 'ঠ' কে 'ট' উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা যায় এবং কালক্রমে মিঠামইন থেকে মিটামইন বা মিটামন পরিচিতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত মইন গাছ এখন আর দেখা যায় না।[২০]

মিঠামইন উপজেলায় ৭ টি ইউনিয়ন রয়েছে। যথা:-

১. গোপদিঘী
২. মিঠামইন
৩. ঘাগড়া
৪. ঢাকী
৫. কেওয়ারজোর
৬. কাটখাল
৭. বৈরাটি

মানচিত্রে মিঠামইন উপজেলা
তথ্যসূত্র: www.kishoreganj.gov.bd

মিঠামইন উপজেলার ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোর মধ্যে দিল্লির আখড়া এবং গোধর গোস্বামীর আখড়াগুলো অন্যতম। এছাড়াও এ উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক ঐতিহ্যবাহী মসজিদ। মিঠামইন উপজেলার মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রি এখানকার ঐতিহ্য বহন করছে। এছাড়াও এ অঞ্চলে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী অনেক খেলাধুলা, যেমন- নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা ইত্যাদি। মিঠামইন বাজারের কাঠমহাল এখানকার ঐতিহ্যের আরেক নিদর্শন।

করিমগঞ্জ উপজেলা

কিশোরগঞ্জের ১৩টি উপজেলার মধ্যে করিমগঞ্জ একটি অন্যতম উপজেলা। যার উত্তরে তাড়াইল উপজেলা, দক্ষিণে নিকলী উপজেলা এবং কটিয়াদী উপজেলা, পূর্বে ইটনা উপজেলা ও মিটামইন উপজেলা আর পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা। করিমগঞ্জ উপজেলাটি ২৪° ২২´ এবং ২৪° ৩২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৪৮´ এবং ৯১° ০১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। "করিমগঞ্জ" নামটির প্রথম অংশ 'করিম' এবং দ্বিতীয় অংশ 'গঞ্জ' এ দু'টির সংযোগে হয়েছে 'করিমগঞ্জ'। অর্থ্যাৎ করিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজার বা গঞ্জ। তবে "করিমগঞ্জ" নামটির কে এই করিম এ নিয়ে মতভেদ আছে। করিমগঞ্জ স্থানটি কোন করিমের অধীনে ছিল কি-না তা যাচাই ও ইতিহাস পর্যালোচনায় ঈসা খাঁর সময়ে (১৫৩৭-১৫৯৯) বাংলার বার ভূঁইয়াদের মধ্যে করিমদাদ মূসাজাঁই নামে একজনের নাম জানা যায়।

তবে তিনি অত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন কি-না তা জানা যায়নি। করিমদাদ মূসাজাঁই ছাড়া এ এলাকায় সম্পৃক্ত আর যে দু'জন করিমের নাম পাওয়া যায়; তাঁরা হলেন- বৌলাই সাহেব বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা মোগল প্রতিনিধি আল শায়খ আব্দুল করিম ও অন্যজনের নাম সি.এস. রেকর্ডে তালুক করিম খাঁ নামে উল্লেখ

আছে। তিনি আনুমানিক ১৬২৫ সালে এ অঞ্চলে আগমন করেন। অন্য জন ঈসা খাঁর ১০ম অধঃস্তন করিমদাদ খাঁ। জমিদারী আমলে করিমগঞ্জ বাজারটি বৌলাই জমিদার বাড়ীর অধীনে ছিল। ফলে এটি বৌলাইবাড়ীর পূর্বপূরুষ মীরে বহর আল শায়খ আব্দুল করিম এর নাম থেকে করিমগঞ্জ নামকরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ঈসা খাঁর বংশের করিমদাদ খাঁ উনিশ শতকের প্রথম দিকের লোক এবং করিমগঞ্জ তাঁর জমিদারীর আওতাধীন ছিলনা। স্বাধীনচেতা জমিদারনেতা বীর ঈসা খাঁর বিদ্রোহ মোগল সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগল নৌ-সেনাপতি বৌলাই সাহেব বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা মীরে বহর আল শায়খ আব্দুল করিম এঁর নামানুসারেই এ অঞ্চল করিমগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করে।

করিমগঞ্জ উপজেলাটি ১৯৩২ সালে থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি উপজেলা পরিষদ ও ১১ টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ইউনিয়নগুলো হলো:-

১. কাদিরজঙ্গল ইউনিয়ন
২. গুজাদিয়া ইউনিয়ন
৩. কিরাটন ইউনিয়ন
৪. বারঘরিয়া ইউনিয়ন
৫. নিয়ামতপুর ইউনিয়ন
৬. দেহুন্দা ইউনিয়ন
৭. সুতারপাড়া ইউনিয়ন
৮. গুনধর ইউনিয়ন
৯. জয়কা ইউনিয়ন
১০. জাফরাবাদ ইউনিয়ন
১১. নোয়াবাদ ইউনিয়ন

মানচিত্রে করিমগঞ্জ উপজেলা

তথ্যসূত্র: www.karimgonj.kishoreganj.gov.bd

তাড়াইল উপজেলা

১৪১.৪৬ বর্গ কি.মি. এর তাড়াইল উপজেলাটি ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ২৪ ডিগ্রী ৩০ মিনিট হতে ২৪ ডিগ্রী ৩৭ মিনিট উত্তর উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০ ডিগ্রী ৪৯ মিনিট হতে ৯০ ডিগ্রী ৫৯ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।এর উত্তরে কেন্দুয়া উপজেলা এবং মদন উপজেলা, দক্ষিণে করিমগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে ইটনা উপজেলা আর পশ্চিমে নান্দাইল উপজেলা এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা। উপজেলাটিতে ৭টি ইউনিয়ন, ৭৫টি মৌজা, ১০৪টি গ্রাম রয়েছে।

ইউনিয়ন গুলো হচ্ছে- তালজাঙ্গা, রাউতি, ধলা, জাউয়ার, দামিহা, দিগদাইর, তারাইল-সাচাইল ।

মানচিত্রে তাড়াইল উপজেলা
তথ্যসূত্রঃ map.janlewala.com

এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৩৮৪৮৮ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৫১.৬০%,মহিলা ৪৮.৪০%, মুসলিম ৯৩.৫২%, হিন্দু ৫.৭১%, বৌদ্ধ ০.৩১%, খ্রীস্টান ০.৩২% এবং অন্যান্য ০.১৪% । এখানে গড় স্বাক্ষরতা ১২.৬০%, পুরুষ ২০.২%, মহিলা ৩.৭% । এ উপজেলায় রয়েছে কলেজ ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮টি, জুনিয়র হাই স্কুল ১টি, মাদ্রাসা ৬টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৬টি ও কমিউনিটি বিদ্যালয় ২০টি ।

ব্রিটিশ আমলে পাট ব্যবসা কেন্দ্র রূপে বর্তমানে এলএসডি খাদ্য গুদামের পাশে ‘গঞ্জ’ হিসেবে তাড়াইল এর সূত্রপাত ঘটে । তৎকালীন থানার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এ অঞ্চলটি বাদলা থানার অর্ন্তভূক্ত ছিল । প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাদলা থেকে প্রথমে দামিহা বাজারের উত্তর পার্শ্বে নরসুন্দা নদীর উত্তর তীরে একটি পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ করা হয় । এখন এ স্থানটিকে লোকে থানাহাটি বলে ডাকে । থানাহাটিতে লোকজনের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা । শুকনা মৌসুমে ক্ষেতের আইল দিয়ে জনগণের যেতে হতো । জনগণের সার্বিক যাতায়াতের সুবিধার্থে বর্তমান থানা ভবনটি যেখানে অবস্থিত সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ এবং ১৯০৯ সালে বাদলা থানা স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাড়াইল থানার আত্মপ্রকাশ ঘটে । তৎকালীন উক্ত স্থানটি ছিল তালজাঙ্গা জমিদার রাজ নারায়ণ চৌধুরীর জমিদারীর অংশ । তিনি এ স্থানটি দান করেন জনগণের সুবিধার্থে । তাঁর স্ত্রী তারামন দেবীর নামের ‘তারা’ এবং তৎকালীন যোগাযোগের একমাত্র ক্ষেতের আইল থেকে ‘আইল’যুক্ত করে “তারা+আইল”=“তাড়াইল” নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায় । ধান, পাট ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে উপজেলাটিতে একটি নদী বন্দরের আত্মপ্রকাশ ঘটে । পাট ব্যবসায়ের জন্য পাট ক্রয় করে গুদাম করার জন্য বিভিন্ন কোম্পানী এখানে তাদের গুদাম তৈরী করে ।

কটিয়াদী উপজেলা

ভৌগোলিকভাবে ২৪° ১০´ থেকে ২৪° ২২´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০° ৪৩´ থেকে ৯০° ৫৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। প্রায় ২১৯.২২ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট কটিয়াদী উপজেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জ সদর ও করিমগঞ্জ, দক্ষিণে বেলাবো ও মনোহরদী, পূর্বে নিকলী ও বাজিতপুর এবং পশ্চিমে পাকুন্দিয়া অবস্থিত ।কথিত আছে কটিয়াদীতে একজন পাগল বেশে দরবেশ ছিলেন। সবাই তাকে কটি পাগল বলে ডাকতো। তার নাম 'কটি' থেকেই 'কটিয়াদী' হয়েছে।[২১] এ উপজেলার জনসংখ্যার শতকরা ৫১% পুরুষ ও ৪৯% মহিলা এবং জনসংখ্যার ৯৪% মুসলিম ৪% হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের ২% । এ এলাকার জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% লোকই কৃষি কাজ করে থাকে। মোট জনসখ্যার মধ্যে বিভিন্ন পেশায় রয়েছে-কৃষি ৪৬.৯১%, কৃষি শ্রমিক ২২.১৭%, সাধারণ শ্রমিক ৩.৬৪%, ব্যবসা ১১,০৫%, সেবা ৩.৫৫%, পরিবহন ১.২২%, মাছধরা ১.০৩%, অন্যান্য ১০.৪৩%। এখানে রয়েছে কলেজ ৩টি, উচ্চ বিদ্যালয় ২৪টি, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১টি, মাদ্রাসা ৩৬টি, সরকারি প্রাথমিক স্কুল ১১৩টি।

কটিয়াদী থানা ১৯৮৩ সনে উপজেলায় পরিণত হয়। ৯টি ইউনিয়ন, ৯৫টি মৌজা আর ১৫১টি গ্রাম নিয়ে কটিয়াদী উপজেলা গঠিত। এই উপজেলার ইউনিয়ন সমূহ:

১. বনগ্রাম
২. সহশ্রাম ধুলদিয়া
৩. করগাঁও
৪. চান্দপুর
৫. মুমুরদিয়া
৬. আচমিতা
৭. মসূয়া
৮. লোহাজুরী
৯. জালালপুর

মানচিত্রে কটিয়াদী উপজেলা
তথ্যসূত্র: www.kishoreganj.gov.bd

এখানে মুমুরদিয়া ইউনিয়নের কুড়িগাই গ্রামে হযরত শামসুদ্দীন আউলিয়া সুলতান বুখারি (রঃ) এর মাজার অবস্থিত। যিনি ৩৬০ আউলিয়ার একজন। তিনি ছিলেন হযরত শাহজালাল (রঃ) এর সঙ্গী। তাছাড়া চান্দপুর ইউনিয়নের সেকেরপাড়া গ্রামে হযরত মিয়া চান্দ শাহ এর মাজার অবস্থিত। এ মাজার চুনের মাজার নামে পরিচিত। এছাড়া আচমিতা ইউনিয়নে গোপীনাথ ও লক্ষীনারায়ণ মন্দির অবস্থিত। সত্যজিৎ রায়ের পৈত্রিক বাড়ি রয়েছে মসুয়া ইউনিয়নে। কটিয়াদী থেকে মাত্র ৪ কি.মি. দূরে জালালপুর ইউনিয়নে রয়েছে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় নীলচুল্লির ধ্বংসাবশেষ।

পাকুন্দিয়া উপজেলা

পাকুন্দিয়া উপজেলার আয়তন ১৮০.৫২ বর্গ কি.মি. । এ উপজেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জ সদর ও হোসেনপুর উপজেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলা, পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী, নিকলী ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা অবস্থিত । পাকুন্দিয়া উপজেলা প্রায় ২৪ ডিগ্রী ১৫ মিনিট থেকে ২৪ ডিগ্রী ২৪ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ডিগ্রী ৩৭ মিনিট থেকে ৯০ ডিগ্রী ৪৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ।

বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয় । এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে পাকুন্দিয়া থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয় । এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৩৭,২১৮ জন । যার মধ্যে পুরুষ ৪৯.২% এবং মহিলা ৪৭.২% । এখানে শিক্ষার গড় হার শতকরা ৪৮ ভাগ । এককালে এ পাকুন্দিয়া উপজেলার উত্তাল ব্রহ্মপুত্র নদ বিধৌত এগারসিন্দুর, দগাদগা, মির্জাপুর, মঠখোলা, বাহাদিয়া এবং নগরহাজরাদী প্রভৃতি এলাকায় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল । এখানে খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে ভিনদেশী বণিক ও সওদাগরগণের বাণিজ্য তরী রাজরাজাদের সৈন্য সামন্ত এবং আমীর ওমরাহগণের পদচারণায় এ জনপদ ছিল মুখরিত । খ্রিস্টীয় সপ্তক দশকে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়েন সাঙ্গ এর জীবন বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় সমুদ্র থেকে নব উত্থিত এ ভূ-ভাগ ছিল ঘনঅরণ্য বেষ্টিত । অরণ্যবাসী পাহাড়ী জনগণ এসে এখানে বসতি স্থাপন করতে থাকলে নবম/দশম শতকে এখানে ক্ষুদ্র গোত্র যেমন- কোচ, গারো, হাজং, অহম প্রভৃতি সামন্ত রাজ্যের অধীনে এককেটি রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । বিভিন্ন কারণে এসব সামন্ত রাজাদের মধ্যে অন্তঃ কলহ লেগেই থাকত ।

এগারসিন্দুর আর দগদগা স্থানে
বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্বলোকে জানে
নানা দেশী আসয়ে এতায়
বেচা-কেনা করে সঙ্গে আনন্দ হিয়ায় ।

“পাকুয়ান দেহ” থেকে পাকুন্দিয়া । পাকুন্দিয়া বাজারের দক্ষিণাংশে মির্জাপুর-পাকুন্দিয়া রোডের পশ্চিমপার্শ্বে মলং শাহ নামে একজন আউলিয়া দরবেশের মাজার আছে । তিনি মধ্যযুগে এ এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন । কেউ কেউ বলেন তিনি এগার সিন্দুরে আগত ১১ জন আউলিয়ার অন্যতম একজন ছিলেন । বর্তমান মাজার স্থলে তিনি অবস্থান করতেন । এই মলংশাহ দরবেশের পাকুন(পবিত্র)+দেহ থেকে “পাকুয়ান দেহ” অর্থ্যাৎ উর্দু ভাষী শব্দে ‘পাকওয়ান দেহ’ যা লোকমুখে উচ্চারণ বিবর্তনের ফলে পাকুন্দিয়া শব্দে রূপ নেয় এবং এ অঞ্চলের নামকরণ হয় পাকুন্দিয়া ।[২২]

অন্যমতে ‘পাকুড়’ থেকে পাকুন ও ‘দিয়া’ মিলে পাকুন্দিয়া। বহুভাষাবিদ ও গবেষক ডঃ সুকুমার সেনের মতে ‘পাকুন ও দিয়া’ এ দু’টো শব্দ মিলে এ এলাকার নাম হয়েছে পাকুন্দিয়া। ‘পাকুন’ অর্থ্যাৎ পাকুড় গাছ আর ‘দিয়া’ অর্থ দু’পাশে নদী বা খাল অর্থ্যাৎ জলাভূমি বেষ্টিত টিলাভূমি বা উঁচু স্থান। তাঁর মতে এই অঞ্চলের দু’পাশে খাল-নদী বেষ্টিত উঁচু স্থানে প্রচুর ‘পাকুড় গাছ’ ছিল। ‘পাকুন’ শব্দটি ‘পাকুড়’ শব্দের বিবর্তিত রূপ; এই বিবর্তিত শব্দ পাকুন এবং এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ ‘দিয়া’ মিলে এ এলাকার নামকরণ ‘পাকুন্দিয়া’ হয়েছে। পাকুন্দিয়া উপজেলার ইউনিয়নসমূহ:

১. জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন
৩. চরফরাদি ইউনিয়ন
৪. এগারসিন্ধুর ইউনিয়ন
৫. বুরুদিয়া ইউনিয়ন
৬. পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়ন
৭. নারান্দী ইউনিয়ন
৮. হোসেন্দী ইউনিয়ন
৯. চন্ডিপাশা ইউনিয়ন
১০. সুখিয়া ইউনিয়ন

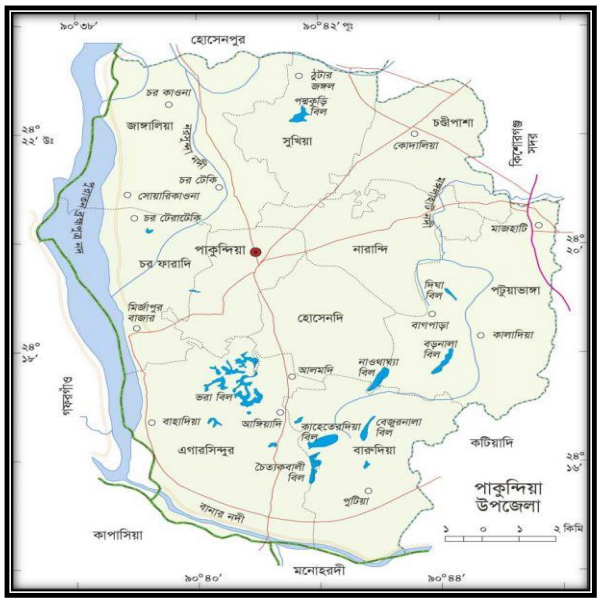

মানচিত্রে পাকুন্দিয়া উপজেলা
তথ্যসূত্র: map.janlewala.com

হোসেনপুর উপজেলা

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরে একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদের নাম হোসেনপুর। ১২১.২৯ বর্গ কি.মি. আয়তনের এ উপজেলাটি ২৪ ডিগ্রি ২৩ মিনিট ও ২৪ ডিগ্রি ৩১ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট ও ৯০ ডিগ্রি ৪৪ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তরে নান্দাইল উপজেলা, পূর্বে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিণে পাকুন্দিয়া উপজেলা ও পশ্চিমে গফরগাঁও উপজেলা।

১৭৮১ খ্রি. জেমস্ রেলেন অংকিত অবিভক্ত বাংলাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে কিশোরগঞ্জ জেলার যে ০৩টি জনপদের নাম উল্লেখ করে সীমানা চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে একটি জনপদের নাম হোসেনপুর। হোসেনপুরকে প্রাচীন কিশোরগঞ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হিসেবে জেমস্ রেলেন এর অংকিত মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। মুঘলসম্রাট বাহাদুর শাহ্ এর আমলে বাংলার তদানীন্তন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ এর নামে এ পরগনাটি পরিচিত ছিল। নয়নাভিরাম হোসেনপুর উপজেলাটি পশ্চিম প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদ দক্ষিণ প্রান্তে নরসুন্দা নদ দ্বারা বেষ্টিত ছিল। নদের পূর্ণ যৌবনে এ জনপদটি এককালীন সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার লাভ করায় এতদ্অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। পালতোলা বড় বড় নৌকা ও জাহাজ আসতো হোসেনপুর উপকূলে।[২৩]

নদী পথে যাতায়ত অত্যন্ত সহজ ছিল বলে এ উপজেলার পিতলগঞ্জ গ্রামে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নীল চাষের জন্য নীল কুঠির স্থাপন করেছিল। আজও এ জনপদের পিতলগঞ্জ গ্রামে ধ্বংসপ্রাপ্ত নীল কুঠির নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। নীলকরদের অত্যাচারে এ জনপদের প্রজারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

বাংলার তদানীন্তন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ হোসেনপুর পরগনার প্রজা সাধারণের জীবন-জীবিকা, সুখ-দুঃখ স্বচক্ষ্যে প্রত্যক্ষ করার জন্য তৎকালীন দুল বাজার নামক স্থানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। জনশ্রুতি আছে পরবর্তীতে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ এর নামানুসারে দুল বাজারের নামকরণ করা হয় হোসেনপুর। হোসেনপুর উপজেলায় ০৬টি ইউনিয়ন রয়েছে।

হোসেনপুর উপজেলার ইউনিয়নসমূহ হচ্ছে-

১. জিনারী
২. সিদলা
৩. গোবিন্দপুর
৪. আড়াইবাড়ীয়া
৫. শাহেদল
৬. পুমদী

মানচিত্রে হোসেনপুর উপজেলা

তথ্যসূত্রঃ map.janlewala.com

ভৈরব উপজেলা

১৯০৬ সালে ভৈরব থানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালের ১৫ এপ্রিল থানাটি মানোন্নীত হয়েছে। এর পূর্ব দিকে মেঘনা নদী (নদীর অপর প্রান্তে বি.বাড়ীয়া জেলার সরাইল উপজেলা), উত্তর-পূর্ব কোণে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর, উত্তর-পশ্চিম কোণে কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর, পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণে নরসিংদী জেলার বেলাব এবং রায়পুরা, পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বি.বাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার সীমানা। ভৌগোলিক ভাবে ২৪° ০২´ থেকে ২৪° ১১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ৫৪´ থেকে ৯১° ০২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ১২১,৭৩ বর্গ কি.মি.। মোট জনসংখ্যা ২,৪৭,১৬৬ জন। যার মধ্যে পুরুষ শতকরা ৪৪.০৮% এবং মহিলা ৩৬.৬% । গড় শিক্ষার হার ৩৬.৬ শতাংশ।

১৭৬৪ থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যে অংকিত ও ১৭৮১ সালে প্রকাশিত জেমস জে. রেনেলের অবিভক্ত বাংলার মানচিত্রে ভৈরব নামক ভূখন্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায়না। ব্রহ্মপুত্র নদ সে সময় ১০ থেকে ১২ মাইল প্রশস্ত ছিল,

মেঘনা ছিল ব্রহ্মপুত্রের উপ-নদী। মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থলেসৃষ্ট বালির চর বর্তমানে জনপদ ভৈরব। জেগে উঠা চরাঞ্চল ও জলাভূমিতে উলু-খাগড়ার বন জন্মানোর কারণে স্থানটির প্রথম নাম হয় উলুকান্দি। উলুকান্দি তৎকালীন ভাগলপুর দেওয়ানদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হলো। নবীনগর উপজেলার বিটঘরের দেওয়ান ভৈরব চন্দ্র রায় ভাগলপুরের জমিদার দেওয়ান সৈয়দ আহমদ রেজা এর কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়ে উলুকান্দি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনবসতি শুরু করেন। জনবসতির পাশাপাশি একটি বাজার গড়ে উঠে। দেওয়ান ভৈরব চন্দ্র রায় তাঁর মা'র নামে বাজারটির নাম দেন কমলগঞ্জ প্রকাশ্যে ভৈরব বাজার। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর নাম দেয়া হয় তাঁর ভাই-বোনদের নামানুসারে ভৈরবপুর, কমলপুর, জগন্নাথপুর, শম্ভুপুর, কালীপুর, চণ্ডিবের ও লক্ষীপুর।[২৪]

ভৈরব উপজেলার ইউনিয়নসমূহ:

১। সাদেকপুর
২। আগানগর
৩। শিমুলকান্দি
৪। গজারিয়া
৫। কালিকাপ্রসাদ
৬। শিবপুর
৭। শ্রীনগর

মানচিত্রে ভৈরব উপজেলা
তথ্যসূত্র: map.janlewala.com

মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে এক সমৃদ্ধ জনপদের নাম ভৈরব। বাবু ভবানী কিশোর আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা জমিদারের নিয়ন্ত্রণ আসার পর তেজারতি, মনোহরী ও আড়তদারী ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ভৈরব বাজারের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটে বহুগুণে। স্থানীয় মুসলমান ব্যবসায়ী ছাড়াও দূরাঞ্চলের অনেক হিন্দু পরিবার ভৈরব বাজারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সওদাগর ও ব্যবসায়ী হিসেবে। ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হলে ভৈরব অঞ্চলটি ছিল বাজিতপুর থানার আওতাধীন। ১৮৮৫ সালে মুক্তাগাছার জমিদারের রাজকাচারী কালিকাপ্রসাদ গ্রামের গরীবুল্লা মিয়ার বাড়ী থেকে ভৈরব বাজারে উঠে আসে। ভৈরব বাজার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রহিসেবে পরিচিত হলে ১৯০২ সালে আইজিএন কোম্পানী ভৈরব বাজারে অফিস এবং স্টীমার ঘাট স্থাপন করেন। এইসূত্রে বার্ক মায়ার কোম্পানী, ডেবিট কোম্পানী, রেলি ব্রাদার্স, আরসীম, লিলি ব্রাদার্স নামক সাহেবী কোম্পানী এবং প্রেম শুকদাস, জয়কিশোর, জাসমল তুলারাম এবং শুকিয়ে নামক

মাড়োয়ারী কোম্পানী তাদের পাট ক্রয় কেন্দ্রখুলে ভৈরব বাজারকে একটি বিরাট বন্দরে পরিণত করেন। এই বন্দরের সাথে দেশের অন্যান্য স্থানের রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে (১৯৩৫-১৯৩৭ খ্রি.) মেঘনা নদীর উপর "রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ সেতু" (যা ভৈরবপুল নামে পরিচিতি) স্থাপন করা হয় এবং এটি নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় ৬৪ লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা। আসাম বেংগল রেলওয়ে এই পুলের উপর দিয়ে প্রথম মালগাড়ী চলাচল শুরু করে ১৯৩৭ সালে ১ সেপ্টেম্বর এবং তা উদ্বোধন করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-এ-বাংলা এ.কে ফজলুল হক। ঐ বছরই ৬ ডিসেম্বর থেকে সেতুটির উপর দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। স্থাপন হয় ভৈরব বাজার জংশন। যোগাযোগ ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে নদীপথ, রেলপথ এবং রেলস্টেশন স্থাপন হওয়ার পর ভৈরবের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভৈরব বাজার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এলাকাটি একটি সমৃদ্ধ ব্যবসা স্থান হিসেবে অর্থ্যাৎ বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালের বিবর্তনে আজও ভৈরব বাজারটি টিকে আছে তার অতীত গৌরবকে অবলম্বন করে মেঘনা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মিলনস্থলে ভৈরব জনপদ গড়ে উঠে। জীবিকা ও বসতি স্থাপনের জন্য বৃহত্তম ময়মনসিংহ, সিলেট, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য প্রতিবেশী এলাকার সাহসী ও উদ্যোগী মানুষ এগিয়ে আসেন নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে। এ জনপদ সৃষ্টি লগ্নে ভৈরবে প্রতি সপ্তাহে একদিন হাট বসতো। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯০২ সালে আই.জি.এন এন্ড আর.এস.এন কোম্পানী নামে একটি ইংরেজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভৈরব বাজারের মেঘনা নদীতে যাত্রী চলাচল এবং পণ্যসামগ্রী আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধার্থে দু'টি ষ্টীমারঘাট স্থাপন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ষ্টীমারঘাট ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে সময়ে দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভৈরবের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং বেশ কয়েকটি ইংরেজ ও মাড়োয়ারী যেমন- লেন্ডন এন্ড ক্লার্ক, ডাকার্স কোং, তুলারাম বসরাজ, মুন্ডিওরা এন্ড কোং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পাটজাত দ্রব্যের ব্যবসা করতে ভৈরবে অফিস স্থাপন করে। ভৈবর থেকে পাটজাত পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হতো। পারস্য, ইউরোপ ও সাবেক ব্রিটিশ ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাইসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন প্রকার পণ্যসামগ্রী ভৈরব বাজারে আমদানী করতো। কলকাতার সাথে ভৈরব বাজারের ব্যবসায়ীদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বিদেশের সাথে ভৈরব বাজারের ব্যবসা সংকোচিত হলেও ভৈরব সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দর নগরী হিসেবে পরিচিত। ব্যবসা বাণিজ্যে এখনও ভৈরব অন্যতম। ভৈরবে একটি পাইকারী মৎস্য আড়ৎ রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ উক্ত আড়তে পাওয়া যায়। প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী জেলা ও উপজেলা থেকে লোকজন এখানে আসে তাঁদের পছন্দ মত মাছ ক্রয়ের জন্য।

বাজিতপুর উপজেলা

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলাটির আয়তন ১৯৩.৭৬ বর্গ কি.মি.। যার উত্তরে কটিয়াদী, নিকলী এবং অষ্টগ্রাম উপজেলা, দক্ষিণে কুলিয়ারচর এবং সরাইল উপজেলা; পূর্বে অষ্টগ্রাম এবং নাসিরনগর উপজেলা আর

পশ্চিমে কটিয়াদী উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। এ উপজেলার জনসংখ্যা ১৯৭০৮১ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ৫০.৪৯%, মহিলা ৪৯.৫১%, মুসলিম ৮৭.৪৯%, হিন্দু ১২.৫১%, পৌত্তলিক ৫৭২টি পরিবার। এ উপজেলায় গড় স্বাক্ষরতা ২২.১%, পুরুষ ২৭.৮%, মহিলা ১৬.৪%।

বাজিতপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দু'টি জনশ্রুতি আছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো- মুঘল আমলে বায়োজিদ খাঁ নামক জনৈক রাজ-কর্মচারী তাঁর অপর তিন ভ্রাতা ভাগল খাঁ, পৈলন খাঁ ও দেলোয়ার খাঁসহ দিল্লী থেকে এসে এখানে অবস্থান করেন। কিছুদিন পর তাঁরা বাজিতপুর এর আশেপাশে ৪টি স্থানে স্ব-স্ব বাসস্থান ঠিক করে নেওয়ার পর বায়োজিদ খাঁর বাসস্থানের নামে বায়োজিদপুর পরে উচ্চারণ বিবর্তনে তা হয় বাজিতপুর। এই রূপে পৈলন খাঁর নামে পৈলনপুর ও ভাগল খাঁর নামে ভাগলপুর এবং দেলোয়ার খাঁর নামে দিলালপুর বলে পরিচিতি লাভ করে।

দ্বিতীয় প্রকাশে জনশ্রুতি মতে- বায়োজিদ খাঁ নামক মুঘল সেনাপতিকে প্রেরণ করা হয়েছিল হাওর অঞ্চলে ঈসা খাঁর অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য। ঈসা খাঁ তখন অবস্থান নেন হাওর এলাকার নদী পরিবেষ্ঠিত ঘাগড়া অঞ্চলে, তখন বায়োজিদ খাঁ অবস্থান নেন ঘোড়াউত্রা নদী হতে দুই মাইল পশ্চিমে বর্তমান বাজিতপুরে। তবে তিনি ঈসা খাঁর সাথে কখনও কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিনা কিংবা হলেও যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত ইতিহাস না থাকায় এটি তেমন বিশ্বাস বা সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়না। আর তাছাড়া এখানে তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাসের কোন নিদর্শণ পাওয়া যায়না। অস্থায়ী বাসস্থানকে প্রথমে বায়োজিদপুর পরে বাজিতপুর নামে ডাকা শুরু হতে পারে। তবে প্রথম জনশ্রুতিটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে বাজিতপুর উপজেলা গঠিত।[২৫]

বাজিতপুর উপজেলার ইউনিয়নসমূহ হলো:

০১) হুমাইপুর
০২) দিলালপুর
০৩) বলিয়ারদী
০৪) সরারচর
০৫) দিঘীরপাড়
০৬) হিলচিয়া
০৭) হালিমপুর
০৮) পিরিজপুর
০৯) মাইজচর
১০) গাজিরচর
১১) কৈলাগ

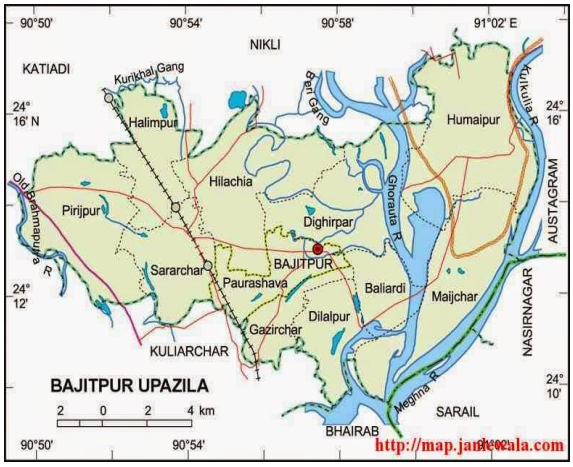

মানচিত্রে বাজিতপুর উপজেলা

তথ্যসূত্র: map.janlewala.com

ব্রিটিশ শাসন আমলে এই উপজেলার দুলালপুরের নদীবন্দর বিখ্যাত হয়েছিল। নীল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল গোপিনাথপুর এবং ঘোড়াঘাটে। ভাটি এলাকার মুক্তা চালান করা হতো এই এলাকা দিয়ে। বাজিতপুর উন্নতমানের মসলিন 'তাঞ্জাব' উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল।"ফকির-সন্ন্যাসী" আন্দোলন বাজিতপুরে প্রচন্ডভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনী পাক আর্মিকে পরাজিত করে বাজিতপুরকে মুক্ত করে ২৬ অক্টোবর তারিখে।

নিকলী উপজেলা

উপজেলার মোট আয়তন ২১৪.৪০ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা কিশোরগঞ্জের মাঝামাঝি স্থানে ২৪ ডিগ্রী ১৫ মিনিট থেকে ২৪ ডিগ্রী ২৭ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০ ডিগ্রী ৫২ মিনিট থেকে ৯১ ডিগ্রী ০৩ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মাঝে অবস্থিত। এর উত্তরে করিমগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে বাজিতপুর উপজেলা, পূর্বে মিঠামইন উপজেলা ও পশ্চিমে কটিয়াদী উপজেলার অবস্থান রয়েছে। মুঘল বাহিনী খাজা ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং তাকে ধাবিত করতে এই এলাকায় এসে পৌঁছায় এবং সেখানে ছাউনি ফেলে। তাদের অস্থায়ী আবাসস্থল স্থানীয় মানুষেরা জড়ো হলে দলের প্রধান সিপাহীদের বলেন- "উছকে নিকালো"। এই ফার্সি শব্দ ভাষা উচ্চারণের বিবর্তন আর বিকৃতিতে 'নিকালো'থেকে নিকলী হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অন্যদিকে, নিকলীর সাবেক নাম 'আগর সুন্দর' বলে নানা গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে। এদিকে নিকলী/নিখলী নামের হুবহু শব্দ উচ্চারণ ব্যবহার উল্লেখ রয়েছে বাংলা ভাষার প্রথম প্রাচীন 'চর্যাপদ' নামক কাব্য গ্রন্থে। অনুরূপ প্রাচীন 'রসুল বিজয়' কাব্য গ্রন্থে নিকলী শব্দ উল্লেখ রয়েছে। অর্থ্যাৎ জনপদ নামে নিকলী নামের সঠিক উৎপত্তির কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও নিকলী এ শব্দ নামে দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৬]

নিকলী কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাচীন জনপদ। ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রথম প্রকাশিত এবং ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে অংকিত ঐতিহাসিক মেজর জেমস রেনেল এর মানচিত্রে নিকলী জনপদের কথা উল্লেখ আছে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মোট ৩৯টি পরগনা নিয়ে যখন ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয় তখন নিকলী ছিল সেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য পরগনার নাম।

সে সময়ে সেই মানচিত্রের কিশোরগঞ্জ নামে কোন গঞ্জ/থানা/মহকুমা নামের কোনো উল্লেখ নেই। জেমস রেনেলের মানচিত্রে নিকলী পরগনার আরো যে সব স্থানের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো- নিকলী, দামপাড়া, সিংপুর, কুরশা, গুরই, ডুবি ও মিঠামইন। থানা হিসেবে এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৫ আগস্ট ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। তখন কিশোরগঞ্জ নামে কোন জনপদের বা থানা অথবা মহকুমা নামকরণ সৃষ্টি হয়নি। সে সময়ে বর্তমান জেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে থানার সংখ্যা ছিল মাত্র ২টি। একটি নিকলী অন্যটি বাজিতপুর। আর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে থানার সংখ্যা ছিল মাত্র ১২টি। এককথায় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে নিকলী থানা

প্রতিষ্ঠার প্রায় ৩৭ বছর পর কিশোরগঞ্জ নামে মহকুমার সৃষ্টি হয়েছে একই সঙ্গে থানা। থানা সৃষ্টির ইতিহাসে নিকলী বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার একটি প্রথম প্রাচীন থানার নাম। নিকলী পরগনা প্রাচীন থানা বর্তমান উপজেলার ভূমি রাজস্বে দু'টি অংশে বিভক্ত। একটি তপে নিকলী অন্যটি জোয়ার নিকলী নামে পরিচিত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ নামে মহকুমার সৃষ্টি হয়। এর অধীনে থানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩টি। যথা: নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠার তারিখ উল্লেখ নেই। ধারণা করা হয় একই তারিখে থানা ও মহকুমা নামের সৃষ্টি হয়েছিল। তারও বহু আগে অর্থ্যাৎ কিশোরগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টির প্রায় ১৫ বছর পূর্বে নিকলী থানাকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা স্থাপনের জন্য একটি সরকারি প্রস্তাব ও রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কি কারণে বাস্তবায়িত হয়নি তা জানা যায়নি। জেলা গেজেটিয়ারে এ তথ্য উল্লেখ আছে।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নিকলী থানা সদরে একটি মুন্সেফী আদালত ছিল। এটি পরবর্তীকালে হোসেনপুর থানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে হোসেনপুরের আদালতটি পুনরায় স্থানান্তরিত করে কিশোরগঞ্জ মহকুমা সদরে পুনঃস্থাপন করা হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নিকলী থানা সদরে পোস্ট অফিস স্থাপিত হয়। অন্যদিকে, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নিকলী থানার পুলিশ ফাঁড়ি স্থানান্তরিত করে কটিয়াদীতে নিয়ে আসা হয়। প্রকাশ থাকে যে, কটিয়াদী সে সময়ে নিকলী থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতপর নিকলীতে পুনরায় থানা স্থাপিত হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নিকলী সদর পোস্ট অফিসে প্রাচীন টেলিগ্রাফ পদ্ধতি ও পরবর্তীকালে টেলিফোন চালু করা হয়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে নিকলী থানায় প্রথম আদমশুমারীর লোক গণনার কাজ শুরু হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ার নিকলী পরগনার বিভিন্ন জনপদের বিভিন্ন ধর্ম-গোত্র-বর্ণের জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা ও পরগনার উল্লেখ আছে। নিকলী সদরে সর্বপ্রথম বেসরকারি পর্যায়ে ভারত চন্দ্র সাহা ডিসপেনসারী নামে একটি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান চালু হয়। বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নামে একটি হাসপাতাল চালু রয়েছে। নিকলি উপজেলার ইউনিয়নসমূহের নাম:

১. নিকলী
২. দামপাড়া
৩. কারপাশা
৪. সিংপুর
৫. জারইতলা
৬. গুরই
৭. ছাতিরচর

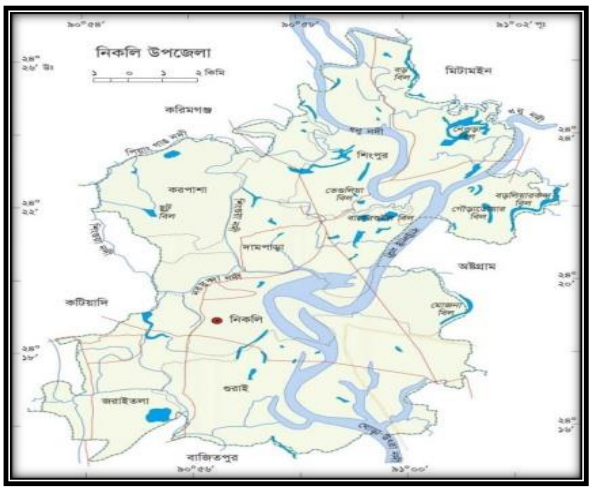

মানচিত্রে নিকলি উপজেলা
তথ্যসূত্র: map.janlewala.com

কুলিয়ারচর উপজেলা

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলাটির আয়তন ১০৪.০১ বর্গ কি.মি. । যার উত্তরে বাজিতপুর উপজেলা, দক্ষিণে বেলাব এবং ভৈরব উপজেলা; পূর্বে ভৈরব এবং বাজিতপুর উপজেলা আর পশ্চিমে কটিয়াদী এবং বেলাব উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত । এ উপজেলার লোকসংখ্যা ২৮০২৭ জন । যার মধ্যে পুরুষ ৫০.৬৫%,মহিলা ৪৯.৩৫% । কুলিয়ারচরের প্রধান নদীগুলো হলো- মেঘনা, পুরানো ব্রহ্মপুত্র নদ, আড়িয়াল খাঁ । তাছাড়া এ উপজেলায় ৫টি বিল রয়েছে ।

মোগল আমলে কুলিয়ারচর-এ কুলি খাঁ নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন । তাঁর সময়ে মেঘনা ও কালী নদীতে জলদস্যুদের উৎপাত ছিল । প্রায়ই জলদস্যুরা ছোট বড় নৌ-যান গুলোর উপর হামলা করে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত । কুলি খাঁর নেতৃত্বে ঐসব জলদস্যুদের পতন ঘটে এবং তাঁর নামানুসারে কুলি খাঁর চর পরবর্তীতে কুলিয়ারচর নামে পরিচিতি লাভ করে । কুলিয়ারচর উপজেলা পূর্বে বাজিতপুর উপজেলার অন্তর্গত ছিল । ১৯২২ সালে কুলিয়ারচর পৃথক থানা হিসেবে পরিচিতি পেলেও ১৯২৩ সালে পৃথক থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ এলাকা ভাগলপুরের বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারের জমিদারের অংশ ছিল । ১৯৮৩ সালের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় কুলিয়ারচর মানোন্নীত হয়ে উপজেলায় রুপান্তরিত হয় । কুলিয়ারচর উপজেলাটি মেঘনা ও কালী নদীর তীরবর্তী পলি বিধৌত উর্বর ভূমিতে অবস্থিত । এ উপজেলায় বিভিন্ন জাতের ধান, গম, কচু, কলা উৎপন্ন হয় । সব্জী আবাদের জন্য এ এলাকার ভূমি খুবই উপযোগী । ধান উৎপাদন সন্তোষজনক আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত ধান অন্যত্র সরবরাহ করা হয় । এ অঞ্চলের মানুষের অন্যতম জীবিকা মাছ চাষ ।[২৭] কুলিয়ারচর উপজেলায় মোট ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে ।

কুলিয়ারচর উপজেলার ইউনিয়ন সমূহ হচ্ছে-

১. গোবরীয়া আব্দুল্লাপুর
২. রামদী
৩. উছমানপুর
৪. সালুয়া
৫. ছয়সূতি
৬. ফরিদপুর

মানচিত্রে কুলিয়ারচর উপজেলা
তথ্যসূত্রঃ www.kishoreganj.gov.bd

২.৮ উপসংহারঃ

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ বিধৌত গারো, হাজং, কোচ অধ্যুষিত একটি জনপদের নাম কিশোরগঞ্জ। যা উপমহাদেশের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহের অর্ন্তভুক্ত ছিল। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এ জেলা ১৮৬০ সালে মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি ১৩টি থানা নিয়ে জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হাওর-বাওর ও সমতল ভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি বিস্তীর্ণ জনপদ হলো এ জেলা। যা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর মতোই ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অধীন। এ জেলার নদ-নদী গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, মেঘনা, ধনু, বৌলাই, ঘোড়াউত্রা, নরসুন্দা, ফুলেশ্বরী, সোয়াইজানী ইত্যাদি। এর একদিকে জলরাশি বেষ্টিত নিম্ন জলাভূমির বিশাল হাওর অঞ্চল অন্যদিকে উচু ভূমির ছোট টিলা আর লাল মাটি যুক্ত সমৃদ্ধ উজান এলাকা।

তথ্য-নির্দেশ

১। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ. ১৩

২। মোহাম্মদ আলী খান, *কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক বিবরণ*, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২০-৩৩

৩। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ. ২২

৪। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২১

৫। মোঃ সাইদুর (সম্পা.), *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস*, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩০-৩২

৬। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩২

৭। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৩

৮। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪

৯। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪

১০। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৬

১১। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ. ২১

১২। Nurul Islam Khan (ed.), *Bangladesh District Gazetters, Mymensigh*, Bangladesh Government Press, Dacca, 1978; Chapter-XV, P.366.

১৩। মোঃ সাইদুর (সম্পা.), *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস*, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ. ১৯-২০

১৪। নুরুল ইসলাম খান (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, (বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯২), পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ৫৬৯

১৫। M A Mannan (ed.), *Kishoreganj District Profile, Kishoreganj District Administration, A Souvenior-1985*, P.1

১৬। *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন* (জুন, ২০১৪), "*এক নজরে কিশোরগঞ্জ*" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (সংগৃহীত ২৬ জুন, ২০১৪)

১৭। মোঃ আঃ হালিম (সম্পা.), *কিশোরগঞ্জ সদরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাহিত্য*, সেবা কম্পিউটার সেন্টার, কিশোরগঞ্জ, পৃ. ২২

১৮। মোঃ গোলজার হোসেন, *বাংলাদেশের জেলা পরিচিতি ও সৃষ্টির প্রেক্ষাপট*, আদনান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ২৫

১৯। আবুল কাসেম, *অষ্টগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্য*, ঢাকা, জুলাই ১৯৯২, পৃ. ৯

২০। মোঃ সাইদুর (সম্পা.), *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস*, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৪

২১। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৫

২২। মোহাম্মদ আলী খান (সম্পা.), *পাকুন্দিয়া উপজেলার কথা*, পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ, পৃ. ৫৩

২৩। শাহ আলম বিল্লাল, *হোসেনপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (১ম খণ্ড), চন্দ্রাবতী প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৬, পৃ. ১১

২৪। মোহাম্মদ আলী খান (সম্পা.), *ভৈরব অতীত ও বর্তমান*, উপজেলা পরিষদ ভৈরব, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২৮-২৯

২৫। মোঃ সাইদুর (সম্পা.), *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস*, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৩

২৬। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৪

২৭। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ২৫

তৃতীয় অধ্যায়

কিশোরগঞ্জের সমাজ ও সামাজিক জীবন

৩.১ সমাজ

মানুষ সামাজিক জীব। একটি সঙ্ঘবদ্ধ জনসমষ্টি পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যখন কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে।[১] গিডিংস (Giddings) "সমজাতীয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কতগুলো স্থায়ী সম্পর্কের দ্বারা সমন্ধযুক্ত ব্যক্তি সমষ্টি"কে সমাজ বলে অবহিত করেছেন।[২] অন্যদিকে ম্যাকাইভার (Maciver) সমাজকে "Web of social relationship" বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] অর্থ্যাৎ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই তিনি সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করেন। আর সামাজিক এ সম্পর্ক গড়ে উঠে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং অন্যান্য আচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন-

> সমাজ হলো আচার এবং কার্য- প্রণালী, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্য, নানা রকম সমবায় এবং বিভাগ, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা- এ সকল কিছুর দ্বারা গঠিত প্রথা। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল প্রথাকেই আমরা সমাজ বলি। এ হল সামাজিক সম্পর্কের জাল।[৪]

আর সমাজের এই পারস্পরিক সম্পর্কের জাল বা আচার ব্যবস্থাগুলো এমন সুগভীর সম্বন্ধযুক্ত যে, এখানে এককভাবে কোন ব্যক্তির যথেচ্ছা আচরণের কোন অবকাশ নেই।[৫] অতএব সমাজের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। টমাস এ্যাকুনাস সমাজকে "প্রজ্ঞাশীল জীবের একটি স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন" বলে উল্লেখ করেন।[৬] সুতরাং একটি সুসংগত সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো-

১। পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা জনসমষ্টি

২। যারা এই সম্বন্ধের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিতৃপ্ত এবং

৩। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ অবশ্যই জীবনধারাগত আদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস

বিভিন্ন উপাদান এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয় তাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। সামাজিক স্তরবিন্যাস ঘনিষ্ঠভাবে সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত।এটি মূলত সামাজিক ঘটনা ও মিথষ্ক্রিয়ার ফলশ্রুতি। সামাজিক গতিশীলতা ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।এখানে সামাজিক ভিন্নতা, অসমতা এবং পার্থক্য স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত এবং কাঠামোবদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে। এটি সমাজের আদি এবং চিরন্তন একটি বিষয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞানে প্রত্যয়টির গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক স্তরবিন্যাস মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। স্তর বিন্যাস নেই এমন সমাজ কল্পনা করা যায় না। তবে রাষ্ট্র ও সমাজভেদে এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিশোরগঞ্জের স্তর বিন্যাসে তেমন কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে।

৩.৩ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন

মানুষের সমাজ জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই সামাজিক স্তরবিন্যাসের শুরু। যা যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হলেও বিলুপ্ত হয়নি। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নোক্ত চারটি ধরনের উল্লেখ করেছেন।[৭] যথা-

১। দাস প্রথা

২। সামন্ত বা এস্টেট ব্যবস্থা

৩। জাতিবর্ণ প্রথা

৪। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণি

দাস প্রথা

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রথম ও প্রধান প্রকরণ হচ্ছে দাস ব্যবস্থা। দাস ব্যবস্থা প্রাচীন ও প্রথম শ্রেণিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আদিম সমাজ ব্যবস্থার মধ্য থেকেই দাস ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরে যখন কৃষি সমাজ ব্যবস্থার গোড়ার দিকে সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা আরোপিত হয় তখন দাস ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। রোমান আইনে দাসকে বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা প্রভুর উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। দাস তাঁর প্রভুর অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। এখানে দাস ও দাস-মালিকের মধ্যে চরম পার্থক্যের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রচলিত ছিল। দাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞায় L. T. Hobhouse বলেছেন-

> দাস হচ্ছে এমন একজন মানুষ আইন ও প্রথা যাকে সম্পত্তিরূপে পরিগণিত করে। চূড়ান্ত বিচারে সে যাবতীয় অধিকার থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি। অন্যদিকে সে কিছু নিশ্চিত বিষয়ে অধিকার সংরক্ষণ করত, কিন্তু এটি অনেকটা ষাঁড় বা গাধার মতই।[৮]

দাস প্রথা প্রথমত একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। মার্ক্সের মতে দাস ব্যবস্থাই প্রথম শ্রেণিভিত্তিক শোষণমূলক সমাজ। এখানে দাস ও দাস-মালিকের দু'টি পৃথক শ্রেণি, যাদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। দাস হচ্ছে দাস-মালিকের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। আইন ও সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সমর্থনে দাস-মালিক তার এ সম্পত্তিকে ব্যবহার করতে পারতেন।

দাসেরা উৎপাদনের জীবন্ত হাতিয়ার। গৃহপালিত পশু আর দাসদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। দাস-মালিকারা তাদের প্রয়োজনে দাসদের প্রতিপালন এবং কেনাবেচা করত। ব্যাপক অসমতা, শ্রেণি বৈষম্য ও শোষণে দাসদের কোনরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। প্রভু যা বলতেন এবং যে কাজ করাতেন তা-ই তার জন্য চূড়ান্ত ছিল।

দাস ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

Bottomore দাস ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।[৯] যেমন-

ক) প্রত্যেক দাসেরই একজন প্রভু থাকে, যার কাছে সে বিষয় হিসাবে গণ্য।

খ) মুক্ত মানুষের তুলনায় দাস নিম্ন অবস্থায় বিদ্যমান।

গ) দাস কাজ করতে বাধ্য।

ঘ) দাস ব্যবস্থার ভিত্তি সব সময়ই অর্থনৈতিক।

এস্টেট ব্যবস্থা

মানব সভ্যতার বিবর্তনে সামাজিক স্তরবিন্যাসের দ্বিতীয় ধরন হলো এস্টেট- যা মধ্যযুগে একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ইউরোপে বিকশিত হয়েছিল। অনেকে এস্টেট বলতে সামন্ত ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকেন। তবে Estate শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- জমিদারের মালিকানাধীন জমি। অষ্টাদশ শতকে এস্টেট দ্বারা বিশেষ বিশেষ শ্রেণিকে বুঝানো হতো। বস্তুত সামন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি ও আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে তিনটি ক্রমোচ্চ শ্রেণি সমাজে অবস্থান করত তাকে এস্টেট বলে। শ্রেণিগুলোই এখানে এস্টেট হিসেবে পরিচিত। এস্টেট B. Bhushan তাঁর "*Dictionary of Sociology*" তে বলেছেন- এস্টেট প্রথা হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ব্যবস্থা যা ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপ ও রাশিয়ায় পরিলক্ষিত হতো অনেকটা বর্ণ প্রথার মত।

ক্ষুদ্র সংখ্যক স্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য এবং স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এস্টেট ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূ-খণ্ড পেত এবং ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হতো। প্রাপ্ত ভূমিকে কেন্দ্র করে এবং যিনি বা যারা ভূমি পেতেন তাদের মতে সমাজ পরিচালিত হতো। সাধারণ শ্রেণি তাদের আনুগত্য থাকতে বাধ্য থাকত। এস্টেট ব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণিকে ঘিরে সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিচালিত ছিল।

শ্রেণি তিনটি হচ্ছে-

১. যাজক শ্রেণি

২. অভিজাত শ্রেণি

৩. সাধারণ শ্রেণি

উল্লিখিত তিনটি এস্টেট সম্পর্কে Bottomore তাঁর Sociology তে বলেছেন-অভিজাত শ্রেণি সবার ভাগ্য নির্ধারণ ও নিরাপত্তা বিধান করে। যাজক শ্রেণি সবার জন্য প্রার্থনা করে এবং সাধারণ শ্রেণি সবার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে।

বস্তুত অভিজাত শ্রেণির তত্ত্বাবধানে এস্টেট ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল। সমাজ পরিচালনায় এবং অন্য শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ শ্রেণি প্রধান ভূমিকা পালন করত। অন্য শ্রেণি দু'টির উপর বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণি ছিল অভিজাতদের অধীন কর্মচারীর ন্যায়। নিরাপত্তার বিনিময়ে এ শ্রেণি অভিজাত শ্রেণির সেবাদাস হিসেবে গণ্য হতো। এস্টেট ব্যবস্থা প্রসঙ্গে Biezanz and Biezanz Zuvi তাঁর *"Introduction to Sociology"* গ্রন্থে বলছেন-

> সামাজিক স্তরবিন্যাসের এস্টেট ব্যবস্থা ভূমিভিত্তিক বংশানুক্রমিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।
> এ ব্যবস্থা কৃষিভিত্তিক সমাজে সর্বাধিক উপযোগী এবং এখানে নূন্যতম শ্রম বিভাজন রয়েছে।[১০]

এ ব্যবস্থায় প্রতিটি এস্টেটের মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও দায়িত্ব অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট ছিল। তাই এস্টেট ব্যবস্থাকে অনেকে বর্ণপ্রথার সাথে তুলনা করে থাকে। এস্টেট ব্যবস্থায় তৃতীয় এস্টেটের মানুষ ছিল নীচু মর্যাদার, শোষিত এবং বঞ্চিত। অভিজাত শ্রেণি ছিল সমাজের এলিট এবং শাসক। তাই সামাজিক স্তরবিন্যাসের এ প্রকরণটি ব্যাপকভাবে শ্রেণি শাসিত এবং বৈষম্যমূলক। বস্তুত এস্টেট ব্যবস্থা সামন্তপ্রথার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা- যা সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি অপরিহার্য প্রকরণ হিসেবে স্বীকৃত। যেখানে সামন্ত প্রথা নেই, সেখানে এস্টেট ব্যবস্থাও নেই। সুতরাং সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি মালিক, যাজক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের ক্রমোচ্চ সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে ধরনটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল তাই এস্টেট ব্যবস্থা।[১১]

জাতিবর্ণ প্রথা

সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে জাতি-বর্ণ-প্রথা। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন রয়েছে। হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রে জাতিকে বর্ণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণ হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা- যা মূলত হিন্দুধর্মের ঘটনা। ভারতীয় হিন্দু সমাজে যে বিভিন্ন শ্রেণি আছে, যাদের পেশা, রীতি-নীতি, সুযোগ-সুবিধা, কর্তব্য ও মূল্যবোধ বংশধারা ও ধর্মীয় নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত তারাই বর্ণ বা জাতি।[১২]

বর্ণ প্রথার সংজ্ঞায় A. Beteille তাঁর '*Class and Power*' গ্রন্থে বলেছেন-

> বর্ণ প্রথা কিছু লোকের ক্ষুদ্র এবং নাম বিশিষ্ট একটি দল হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এটি অন্তর্বিবাহ বংশধারার ভিত্তিতে সদস্যপদ এবং একটি সুনির্দিষ্ট জীবনধারার ভিত্তিতে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এটি মাঝে মধ্যে ঐতিহ্যবাহী সুনির্দিষ্ট পেশা অর্ন্তভূক্তির প্ররোচনা দেয় এবং স্বভাবতই কমবেশি স্বতন্ত্র কিছু অনুষ্ঠান, উঁচু-নীচু ক্রমানুসারে পদমর্যাদাকে সংগঠিত করার প্রয়াস পায়।[১৩]

বর্ণপ্রথার সংজ্ঞায় B. Bhushan (ibd) বলেছেন- বর্ণপ্রথা হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ধরন, যেখানে রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতায় একে অন্যের থেকে উঁচু-নীচু ক্রমানুসারে সংগঠিত এবং পৃথককৃত। মূলত বর্ণ প্রথা হচ্ছে ভারতীয় সমাজের একটি অপরিহার্য সামাজিক সংগঠন। ধর্মীয় নীতিমালা এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এ সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এখানে মানুষের মর্যাদা, পরিচিতি, পেশা, সংস্কৃতি সবকিছু বংশগতভাবে নির্ধারিত হয়।

মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণি

অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-কল্পনার ও চেতনার বিকাশ ঘটে। সামাজিক মানুষের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার জীবনযাপনের বিশেষ রীতির উপর। কেবলমাত্র অর্থ হলেই মানুষ সমাজে উচ্চ শ্রেণির অধিকারী হবার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না, যদি তার মধ্যে মর্যাদাবোধ চেতনা জাগ্রত না থাকে।

অর্থনেতিক শ্রেণি ও মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে সর্বপ্রথম আলোচনার অবতারণা করেন ম্যাক্স ওয়েবার। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক। এক শ্রেণি অপর শ্রেণির সমক্ষ হতে বা অপর শ্রেণি থেকে উপরে যেতে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং, মযাদা-অনুযায়ী শ্রেণি ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক শ্রেণির ন্যায় সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে না। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়না। মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণি ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকে। ফলে, সুখ সমৃদ্ধি আপেক্ষিকভাবে বিবেচিত হয়। মানুষ সর্বদা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। এই মর্যাদা প্রতিযোগিতামূলকভাবে সমাজে অর্জিত হয়। মেযন- প্রতিবেশীদের বা পরিচিত গন্ডির মধ্যে কার কি আছে বা না আছে তার উপর সন্তুষ্টি নির্ভর করে।[১৪]

উপরিউক্ত সামাজিক স্তর বিন্যাসের সাথে বাংলাদেশে সামাজিক স্তরবিন্যাসের রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশের অঞ্চলের স্তর সামাজিক স্তর বিন্যাসের সাথেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল প্রোথিত রয়েছে অতীতের ধর্মব্যবস্থা ও আর্থকাঠামোর ভিত্তিভূমিতে। ধর্মের গতি-প্রকৃতি এদেশের জীবনধারা ও উন্নয়নের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকে প্রভাবিত করলেও অর্থনীতি ও রাজনৈতিক উপাদানগুলির প্রাসঙ্গিকতাও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পেশা, বৃত্তি বা উৎপাদন ব্যবস্থাই সামাজিক স্তরবিন্যাসকে ধর্মরূপের মধ্যে স্থায়িত্ব প্রদান করেছে। কিশোরগঞ্জ জেলার সামাজিক স্তর বিন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি সুপরিচিত শ্রেণি বিভাজন থাকলেও এ অঞ্চলে দৃশ্যমান ছিল ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ-এ দু'টি প্রধান শ্রেণি। অ-ব্রাহ্মণ উপ-শ্রেণিকে সাধারণত পৌরহিত্য সংক্রান্ত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: উচ্চ মিশ্র, মধ্যম মিশ্র এবং নিম্নশ্রেণির মিশ্র। শেষোক্ত শ্রেণিটি ছিল অস্পৃশ্য শ্রেণি।

মুসলমানদের সামাজিক স্তরবিন্যাসে মূলত তিনটি প্রধান গুচ্ছের মধ্যে ছিল আশরাফ বা উচ্চ শ্রেণির মুসলমান, আজলাফ বা নিম্ন শ্রেণির মুসলমান এবং আরজল বা মানমর্যাদাহীন শ্রেণির মুসলমান। প্রথম গুচ্ছে ছিল সৈয়দ, শেখ, পাঠান এবং মুঘল পক্ষান্তরে অন্য দু'টি গুচ্ছে পঞ্চাশটির মতো পেশাজীবী বর্ণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে মুসলমানদের মধ্যে আন্তঃর্বিবাহ বা আন্তঃবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল, কিন্তু শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা বা একত্র আহার সংক্রান্ত বিধিনিষেধের দিকগুলি অনুসরণ করা হতো না।

১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ ভারত বিভাজন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চল গুলোর মত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলেরও বড় গ্রাম অঞ্চলগুলিতে, শহুরে ভূ-সম্পত্তি এবং সরকারি চাকরিতে এবং অর্থ, বাণিজ্য এবং জীবিকা হিন্দু নিয়ন্ত্রিত ছিল। দেশ ভাগের পর বেশিরভাগ হিন্দু রাজনৈতিক ও অভিজাত পরিবারেরা তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো গুটিয়ে কলকাতা এর মধ্যে সীমিত করে নেয়। পরবর্তীতে হিন্দু কুলীনদের এই শুন্যস্থান দ্রুত মুসলিম হাতে চলে আসে এবং পূর্ব বাংলার অর্থনীতি ও সরকার প্রধান প্রথমবারের মতো মুসলিম দখলে আসে। তবে সমাজ ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক অভিজাত পরিবারের হাতে। পরবর্তীতে ১৯৭১ এর স্বাধীনতার পর এর নিয়ন্ত্রণ আসে বাংলাদেশিদের হাতে।

গ্রামীণ সমাজের মৌলিক মূলত বড় অভিজাত পরিবার গুলোই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করত। গ্রামে যত বড় কৃষক পরিবার ছিল তাঁর প্রভাব ছিল তত বেশি। স্বাভাবিকভাবে তাঁরাই ছিল গ্রামীণ সমাজের নিয়ন্ত্রক। ঐতিহ্যগতভাবে চাষাবাদ সবচাইতে কাঙ্খিত পেশা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৮০ হতে গ্রামবাসী তাদের সন্তানদের এই পেশা পরিবর্তন ও শহরের জনবহুল জনপদে নিরাপদ চাকুরীর প্রতি উৎসাহ দেওয়া শুরু করে। সামাজিক সম্মানের ভিত্তি দীর্ঘদিনের চলে আসা জমিদারী, উচ্চবংশ, ধর্মীয় ভক্তি এর পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা, উচ্চ-বেতন ও নিশ্চিত আয় দ্বারা পরিমাপ হতে থাকে। ফলে বর্তমানে শিক্ষাই হয়ে দাড়িয়েছে সামাজিক মর্যাদার মূল ভিত্তি।

৩.৪ জনসমাজ

বাংলাদেশের জনসমাজ নৃতাত্ত্বিকভাবে সংকর জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে অঞ্চলভেদে কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর মাঝে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সে বৈচিত্র্য মূল জনসমাজকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। সুতরাং কিশোরগঞ্জের জনসমাজ এর বাইরের কিছু নয়।

বাঙালি জাতির আদিপুরুষ কারা এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কিশোরগঞ্জের কৃতীসন্তান ড. নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত- এ অঞ্চলের মানুষের শরীরে আদি অস্ট্রেলীয়দের রক্ত সর্বাধিক সঞ্চালিত। তিনি বলেছেন- মাঝারি মণ্ড, প্রশস্ত নাক, কালো বর্ণ, ঢেউ খেলানো কালো চুল, ঘোলা গোল চোখ এবং চ্যাপ্টা মুখবিশিষ্ট আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব এ অঞ্চলের জনধারায় সর্বাধিক।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান- পাঁচ হাজার বছর আগে নিগ্রোটরা এ দেশে বসবাস করত। তারা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। এদের পরে আসামের উপত্যকা পার হয়ে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকজন এ দেশে আগমন করে। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক গড়ন সবকিছুতেই এর প্রভাব বিদ্যমান। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এরাই এদেশে কৃষিকাজের পত্তন করে। ধান, পান, সুপারি, হলুদ, কলা ও সিন্দুর অস্ট্রিকদের অবদান। এরা তুলার কাপড় প্রস্তুত করত এবং নৌশিল্পে পারদর্শী ছিল। অস্ট্রিক জাতি নৌকায় চড়ে বড় বড় নদ-নদী পাড়ি দিতো। আর্যরা এদের নাম দিয়েছিল 'নিষাদ'। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে এ দেশে আগমন করে। স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রিকদের সঙ্গে এই দ্রাবিড় জনসমাজের ভাষা, সংস্কৃতি এবং রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। যদিও জনতত্ত্বের বিশ্লেষণে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৫]

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে এক সময় প্রাচীন কৌম সমাজের মঙ্গোলীয় বোডো উপধারাভুক্ত জনসমাজ ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা সাধারণভাবে কোচ ও হাজং নামে পরিচিত। এরা চ্যাপ্টা নাকের, গালে উচু হাড়, কম গোঁফদাড়ি, চোখের কোণে ভাঁজ এবং গোল বা মাঝারি মাথা হলো এদের চেহারার বৈশিষ্ট্য। কৌম সমাজভুক্ত এই স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী একসময় বর্ণসমাজের চাপে নিজেদের কৌম সমাজের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে এবং অবশেষে বর্ণসমাজের সাথে মিশে যায়। এগুলোই হলো এতদঞ্চলের প্রাচীন জনসমাজের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি। এসব প্রমাণকে ভিত্তি করেই নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বর্ণভেদে বিভক্ত এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জনতাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ এক এবং অভিন্ন।

এ জেলায় জনবসতির সূচনা নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, জলমগ্ন এই অঞ্চলে মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যে কৌম সমাজভুক্ত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় প্রাথমিক পর্যায়ে বসতি স্থাপন শুরু করেছিল। এদের মাঝে মৎস্য ও পশু-পাখি শিকারি কৌম সমাজভুক্ত কোচ, হাজং প্রভৃতি সম্প্রদায় ছিল। অনুমান করা হয়, ব্রহ্মপুত্রের পূর্বের সম্পূর্ণ অঞ্চলটাই তখন জলমগ্ন ছিল কিংবা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত দুর্গম। তাছাড়া প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোও খুব প্রাচীন নয়। সম্ভবত কৌম সমাজভুক্ত ও প্রকৃতিপূজারী কোচ, হাজং জাতীয় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাদের রাজ্য ছিল এবং রাজধানী ছিল জঙ্গলবাড়ী, যশোদল, এগারসিন্দুর, তালজাঙ্গা, হিলচিয়া প্রভৃতি স্থানে। তবে বৌদ্ধধর্মই প্রথম এদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জানা যায়, নাথ, যোগী, সিংহ উপাধিধারী জনগণ বৌদ্ধপন্থি ছিলেন। অবশ্য ধর্মের প্রভাব এই অঞ্চলে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিশেষ করে সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। মুসলমানদের আগমনের পর এসব নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধবাদী অঞ্চলে এসে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বসতি স্থাপন করে। কারণ ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল সেন রাজাদের শাসনমুক্ত এলাকা।

কৌম সমাজভুক্তদের মধ্যে কোচ, হাজং ব্যতীত বৃত্তিমূলক বর্ণসমাজের যারা এই অঞ্চলে আসে, তাদের মাঝে হালুয়া, দাস বা মাহিষ্য, কৈবর্ত, জালো, টিয়র অন্যতম ।

এদের পরপরই আসে বৃত্তিমূলক বর্ণসমাজের কামার, কুমার, সূত্রধর, পাটুনী, বারুই, নাপিত, মাটিয়াল, মালী, তেলী, তাঁতি, চামার, ময়না গন্ধবণিক, নমঃশূদ্র, পাটিকার, সাহা, ধোপা, ময়রা, সুবর্ণবণিক, ছত্রী, বিন্দ কাহার, হদি প্রভৃতি সম্প্রদায় ।

এ অঞ্চলে সুলতানি আমলে শাসন কর্তৃত্ব প্রসারিত হলেও তখনও উল্লেখযোগ্য লোকসমাগম ঘটেনি। পরবর্তীকালে ১৫৭৬ সালে মুঘল সেনাপতি খান জাহানের নিকট রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ খান কররানির পরাজয়ের পর পরাজিত পাঠান সৈন্যরা নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে এ অঞ্চলে আসে। এদের কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। যোড়শ শতকে ঈসা খাঁ লক্ষণ হাজোকে পরাজিত করে জঙ্গলবাড়ীতে রাজধানী স্থাপনের পর নতুন করে আরো কিছু পাঠানদের আগমন ঘটে। ঈসা খাঁ'র সময় বিদ্রোহী মুঘল সেনাপতি মাসুম খান কাবুলির সঙ্গে আগত কিছু দলত্যাগী মুঘল সৈন্যও এ অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। এছাড়া নবাবি আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও এ অঞ্চলে আরও কিছু সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো মাড়োয়ারি ও উড়িয়া। মাড়োয়ারিরা এসেছিল টাকা লগ্নি তথা পোদ্দারি করার জন্য। আর উড়িয়ারা মূলত অকৃষি শ্রমিক। ভৈরব বাজার-ময়মনসিংহ রেললাইন তৈরির সময় উড়িয়াদের আগমন ঘটে। এরা রেললাইন তৈরির কাজ থেকে শুরু করে পরে কুলি এবং মেথরের কাজে নিয়োজিত হয়। এছাড়া তারা পালকি বহন (বেহারা), পাটের গাঁট বাঁধা, বহন করা ইত্যাদি কাজেও পারদর্শী ছিল। পরে এদের অনেকেই এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।[১৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে এ অঞ্চলে আগত কৌম বা বর্ণসমাজের বৃত্তিজীবী জনসমাজের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র। পরবর্তী পর্যায়ে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত লোকের আগমন ঘটেছিল, তবে উচ্চবিত্তের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। পক্ষান্তরে শিক্ষা-দীক্ষার তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। তবে সাধারণ মানুষের মাঝে সহমর্মিতার কোনো অভাব ছিলনা। লোকজন ছিল খুবই অতিথিপরায়ণ।

৩.৫ খাদ্যাভ্যাস

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মত কিশোরগঞ্জের মানুষের প্রিয় খাদ্যও মাছ-ভাত। এ জেলার হাওর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া বিস্তীর্ন হাওর অঞ্চলসহ উর্বর এ জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। যে কারণে "মাছে-ভাতে বাঙালি"এ প্রবাদের যথার্থতা এ জেলার মানুষের খাদ্যাভ্যাসে রয়েছে। ধানের সাথে সাথে এ অঞ্চলে খাদ্যশস্য হিসেবে প্রচুর পরিমাণে গম, ভুট্টা, বিভিন্ন ধরনের ডাল, সরষে, আলুসহ অন্যান্য মসলা জাতীয় ফসল ও সবজীর চাষ হয়। ভাত-মাছ-ডাল যেমন এ

অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রয়েছে তেমনি এ অঞ্চলের কিছু লোকখাদ্য রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো এ অঞ্চলের পিঠা। পিঠা তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলে সুপরিচিত। যে চালে ভাত হয়, সে চালেই পিঠাও হয়। পিঠার প্রধান উপকরণ চালের গুড়োর সংগে নারিকেল, গুড়, দুধ, তালের রস, কলার রস মিশিয়ে কখনো পানিতে সিদ্ধ করে কখনো পুড়িয়ে, কখনও ভাপে দিয়ে বা তেলে ভেজে নানা রকম রসে বা সিরায় ভিজিয়ে তৈরি হয় উপাদেয় খাদ্যবস্তু যাকে লোকখাদ্য বলে। এমনকি ঝাল জাতীয় পিঠাও তৈরি হয়। বিভিন্ন পিঠার নামও আলাদা। যেমন- নকশি পিঠা, পোয়া পিঠা, চিটা পিঠা, ডুবা পিঠা, পাটি পিঠা, পাক্কন পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ পিঠা, পুলি পিঠা, কলার পিঠা, তালের পিঠা, তিলের পিঠা, পাপর পিঠা, বড়া পিঠা, মেরা পিঠা, ভাপা পিঠা, পোয়া পিঠা, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, পাতা পিঠা, মালপোয়া পিঠা, পাটিসাপ্টা পিঠা, ফুল পিঠা ইত্যাদি।

তবে লোকশিল্পের নিরিখে ও শিল্পকর্মের দিক থেকে নকশি পিঠাই সবার সেরা। এ পিঠা শুধু কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু অঞ্চলে তৈরি হয়ে থাকে। নকশি পিঠার নকশার মটিফ সাধারণত লতাপাতা, ফুল, ব্যবহারিক তৈজসপত্র, মাছ, পাখি ইত্যাদি। নকশা তৈরির উপকরণ অতি নগণ্য খেজুর কাটা, সুঁই, মন কাটা, বাঁশের ছিলকা। এগুলোর সাহায্যে অভিজ্ঞ হাতের নিপুণতায় অতি সূক্ষ্ম দাগ কেটে বিভিন্ন নকশা করে থাকে। এসব পিঠার সুন্দর নামকরণও রয়েছে। যেমন- কাজল লতা, শঙ্খ লতা, হিজল লতা, সজনে পাতা, ভেট-ফুল, উড়িফুল (শিমের ফুল), কন্যা মুখ, জামাই মুচরা, সতিন মুচরা, সাগর-দিঘি ইত্যাদি। কিশোরগঞ্জের রসমঞ্জুরী, কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, সন্দেশ, পেরাসন্দেশ, দুধের ক্ষির, দুধের নাড়ু, মিষ্টান্ন ইত্যাদির খ্যাতি রয়েছে লোকখাদ্য হিসেবে। মিঠাই হিসেবে কদমা, বাতাসা, লালচিনি, গুড়, বুইন্দা, জিলাপি, গজা, খাজা, উখড়া, চিরা, মুড়ি, বিন্নিখৈ ইত্যাদি লোকখাদ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। পাক্কন পিঠার সুনামও সুপরিচিতি রয়েছে সারা কিশোরগঞ্জ জুড়ে। কেউ কেউ এ পিঠাকে নকশি পিঠাও বলে থাকে। তবে এ জেলায় পাক্কন পিঠা নামেই বেশি পরিচিত।[১৭]

তাছাড়া চাউলের মধ্যে এক ধরনের ছোট ছোট কণা জাতীয় চাউলকে কিশোরগঞ্জে 'খুদ' বলে। এই খুদ চাউল দিয়ে এক ধরনের ভাত রান্নাকে 'বউ খুদ ভাত' বলে। কেউ কেউ 'খুদ ভাত' বলে। কিশোরগঞ্জ জেলায় আরেক ধরনের লোকখাদ্য রয়েছে তাকে 'কাঞ্জি' বলে। প্রতিদিন রান্নার সময় এক মুঠো চাউল করে একটি হাঁড়িতে ভিজিয়ে রেখে মাসের শেষে এই ভিজানো পঁচা বাসি চাউল রেঁধে কাঞ্জি ভাত তৈরি করে অনেকে খায়। আবার কেউ কেউ এই চাউল দিয়ে পিঠা তৈরি করে খায়। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের অন্যতম উপাদেয় খাদ্য হলো শুটকি মাছ। শুকনো মাছকে শুটকি বলা হয়। শুকনা মাছকে একটি মটকায় মাছের তৈল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে যে ধরনের শুটকি তৈরি করা হয় তাকে কিশোরগঞ্জে 'চ্যাপা শুটকি' বলে। কিশোরগঞ্জের কোথাও কোথাও চ্যাপা শুটকিকে 'সিদল বা হিদল' বলা হয়। কিশোরগঞ্জে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, চ্যাপা-সিদল বা হিদল শুটকির ভর্তা দিয়ে ভাত খেলে জ্বর-সর্দি জাতীয় রোগ থেকে নিরাময় পাওয়া যায়।

ছই বা চই পিঠা চ্যাপা-সিদল বা হিদল শুটকির ভর্তা দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস বা প্রচলন কিশোরগঞ্জে অধিক পরিমাণে রয়েছে। এছাড়াও চটা পিঠা, চিতই পিঠা কিশোরগঞ্জে শুটকির ভর্তা বা তরকারি দিয়ে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। মসলা পিঠা বলতে হলুদ বেটে যে পিঠা তৈরি করা হয় তাকে 'মসলা পিঠা' বলে। তবে হলুদ ছাড়াও বিভিন্ন মসলা এবং শাক-সবজি দিয়ে বড়া পিঠা তৈরি করা হয়। বড়া নামের এসব পিঠা কিশোরগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। সকালের কুয়াশা কিংবা সন্ধ্যায় হিমেল হাওয়ায় ভাপা পিঠার গরম সুস্বাদুধুয়ায় জিভের পানি বেরিয়ে আসে। সাথে গুড়ের গুড়া মিষ্টি খাবার মনে করিয়ে দেয় পিঠার ঐতিহ্য। কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে আজও প্রায় প্রতিদিন 'পান্তা ভাত' খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।[১৮] এ অঞ্চলের লোককথায় উল্লেখ আছে-

চৈতে চাইলতা, বৈশাখে নাইলতা,
জৈষ্ঠে আম খাই, আষাঢ়ে কাঁঠাল দৈ।
শ্রাবণে বাসি পান্তা, ভাদ্রে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শশা মিঠা।
কার্তিকে কচুউল, অগ্রহায়ণে খইলসা মাছের ঝোল,
পৌষে কাঞ্জি-মাঘে তেল, ফাল্গুনে গুড় আর আদা বেল।

এই ছড়াটি যেমন কিশোরগঞ্জে জনপ্রিয়, তেমনি খাদ্যাভ্যাস গুলোও এ জেলায় বেশ প্রচলিত। তাই এ জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে এই ছড়া বচনটি বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন-

বৈশাখ মাসে কাডল মিডা,
জইষ্ঠে মিডা আম।
আষাঢ় মাসে ফুরায়া যাইবে
লেচু আর জাম।
শাওন মাসে শশা মিডা,
ভাদ্র মাসে তালের পিডা।
আশ্বিন মাসে জলপাই আর
কার্তিক মাসে উল মিডা।
আইলানা আইলানা পতি
বেনী বান্ধিব মাথার চুল।
কারলাগি রান্ধি আমি অঘ্রানে
খইলসা মাছের ঝুল।
পোষ মাসে কাঞ্জি পিডা,
মাঘে মিডা তেল।
ফাল্গুনে গুড় আদা মিডা,
চৈতে মিডা বেল।

মাছে ভাতে বাঙালি কথাটি বহুল প্রচলিত থাকলেও নিরামিষ পঞ্চব্যঞ্জন বিচিত্র ধরনের ভাজি-ভর্তায় রন্ধন কুশলতায় খাদ্যরুচির পরিচয় মিলে কিশোরগঞ্জে। এই খাদ্যাভাস সংস্কৃতিরই একটি অংশ। সাধারণ মানুষের মধ্যে সকল প্রকার খাদ্য খাওয়ার পর পান-তামাক খাওয়ার অভ্যাস বা প্রচলন রয়েছে। কেউ কেউ বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি সেবন করেন। এ অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে পান খাওয়ার প্রচলন একটু বেশিই দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে অতিথি আপ্যায়নে কারো বাড়িতে ভাত না খাওয়ালেও এতটা বদনাম হয়না যতটা হয় পান না খাওয়ালে। আর তাই এ জেলার গ্রমাঞ্চলে অতিথি আপ্যায়নে পান অন্যতম একটি অনুসঙ্গ। তাছাড়া পানের সাথে সুগন্ধি জর্দ্দা ব্যবহারও এখানে এক ধরনের আভিজাত্যের বিষয়। এমনকি এ অঞ্চলে পানের সাথে তামাক জাতীয় এক ধরনের পাতাও খাওয়া হয়। এছাড়াও খয়ের নামক এক ধরনের আঠালো বস্তু খাওয়া হয় অতিরিক্ত কালারের জন্য।

কিশোরগঞ্জের জনসাধারণ পূর্বকাল থেকেই অতিথিপরায়ণ এবং আদর আপ্যায়নে অভ্যস্ত। অতিথিকে প্রাচীনকাল থেকে পান, তামাক, চা, চিড়া, মুড়ি, গুড়, নাড়ু, পিঠা, দুধ, কলা, ডাবের পানি, শরবত প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করে। যুগের পরিবর্তনে অবশ্য এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সুদূর অতীতে গ্রাম বাংলার আদিবাসীদের ধান কাটার মৌসুমে নবান্ন উৎসবে মাছ-ভাতের পাশাপাশি উপাদেয় লোকখাদ্য রূপে পিঠার প্রচলন শুরু হয়। চালের গুড়ি, নারকেল কুঁচি, দুধ, আখের গুড়, খেজুর রস, তালের রস ইত্যাদি নানা রকম খাদ্য তৈরির মূল উপকরণ ছিল। এমন এক সময় ছিল যখন অতিথি আপ্যায়ন এবং জামাই তোষণে ধনী-দরিদ্র সবার ঘরে ঘরে পিঠা-পায়েস এর আয়োজন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। তবে পিঠা খাওয়ার আনন্দ-উৎসব যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। সেকালে পিঠা-পুলির বাণিজ্যিক ব্যবহার ছিল না। এখন যান্ত্রিক কর্মজীবনে শহর কিংবা গ্রামে অতীতের মতো ঘরে ঘরে পিঠাগুলো তৈরি হয় না। তবুও খাদ্য রসিক বাংলার মানুষের কাছে পিঠার চাহিদা আগের মতোই আছে। তবে পিঠার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ কমে গেছে। অথচ এমন এক যুগ ছিল সে যুগে পিঠা নামই ছিল 'জামাই ভুলাইন্যা পিঠা'। প্রাচীন যুগ থেকে এই বিবিয়ানা জামাই ভুলাইন্যা পিঠা বানানো আর খাবারের প্রচলন শুরু।

শীতের আমেজে পিঠার চাহিদা বেশি। সরষে বাটা কিংবা শুটকির ভর্তা মাখিয়ে পথের ধারে চিতই পিঠা বানানো আর মজার ঝালে পিঠা মুখে দিলে কান গরম হয়ে শীত যেন পালিয়ে যায়। যা এখন ঘরে তৈরি না হলেও পাড়ার মোড়ে মোড়ে পাওয়া যায়।

তাছাড়া দুধের তৈরি তক্তি, দুধের ক্ষীর দিয়ে ছাঁচের মধ্যে নানা রকম আকৃতির নকশা করা নাড়ু আজও কিশোরগঞ্জে খুবই প্রচলিত। এছাড়া নারিকেল দ্বারা তৈরি নাড়ু ও তক্তি, কাঁচা বা পাকা আম, জলপাই,

চালিতা, তেঁতুল, আমড়া, মরিচ ইত্যাদির আচার, আমসত্ত্ব ও চালকুমড়ার তৈরি মোরব্বা লোকখাদ্য হিসেবে ঘরে ঘরে জনপ্রিয়। চাউলের গুড়ি দিয়ে তৈরি রুটি বিশেষ করে কোরবানীর ঈদের সময় এবং সবে বরাত এর উৎসবের মাধ্যমে মুসলমানগণ প্রস্তুত করে গরীব-দুখীদের মাঝে বিতরণ করে থাকে। হাজার বছর ধরে লোকখাদ্য বাঙালির অধিক প্রিয় খাবার।

তবে আধুনিক জীবনধারার সাথে মিল রেখে মানুষ দিন দিন বাইরের খাবারে অভ্যস্থ হচ্ছে। বাড়ছে চাইনিজ, ইতালীয় ও ফাস্টফুড জাতীয় খাবারের চাহিদা। ঘর থেকে এখন অতিথি আপ্যায়ন কিংবা উৎসবে মানুষ হোটেল-রেষ্টুরেন্টে তৈরি খাবারকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে এটি শহর কেন্দ্রিক জীবনে ব্যাপক হারে দেখা গেলেও গ্রামের মানুষ এখনও অতীত ঐতিহ্য নিয়েই বেঁচে আছে।

৩.৬ পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রাচীনকালে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মানুষের মূল পোশাক ছিল লেংটি। তবে শরীরের উর্ধ্বাংশ খালি থাকত। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই কোমরে কর্তনি ব্যবহার করত। তবে সচ্ছল পরিবারের লোকেরা ধুতি পড়ত। হিন্দু আমলে সেলাই ছাড়া জামার ব্যবহার থাকলেও পুরুষদের মাঝে কুর্তার ব্যবহার শুরু হয় মূলত অষ্টাদশ শতকে। মুঘল আমলে পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তখন থেকে জামা, পায়জামা, আলখাল্লা, পাগড়ি ইত্যাদির প্রচলন হয়। লুঙ্গির প্রচলন শুরু হয় মূলত ফরায়েজি আন্দোলনের সময় থেকে।[১৯]

তৎকালে সাধারণ সমাজের মেয়েরা ডুমা জাতীয় দুই খণ্ড কাপড় পড়ত। শাড়ির প্রচলন শুরু হয় আরও পড়ে। তবে মুঘল আমলে প্রচলন হয় বোরকার। যদিও মেয়েরা ঘোমটা ব্যবহার করত পূর্ব থেকেই। শাড়ির সাথে ব্লাউজ ও পেটিকোট এর ব্যবহার শুরু হয় বিশ শতকের দিকে।

ব্রিটিশ আমলে কিশোরগঞ্জের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষ ধুতি জাতীয় পোশাক পরিধান করতেন। বর্তমানে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু সামান্যতর এই পোশাক চোখে পড়ে। এ যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষেরা লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, শার্ট পড়ে। মহিলা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ পরিধান করে। তবে মুসলমান মেয়ে বা মহিলারা শাড়ি বা সালোয়ার কামিজের উপর বোরকা পড়ে। সকলেই জুতা, সেন্ডেল পায়ে দেয়।

এককালে সকলেই বৌলাওয়ালা খড়ম পায়ে দিত। মুসলমান পুরুষ কেউ কেউ মাথায় নানান রঙের টুপি, পাগড়ি পরিধান করে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক গামছা, তোয়ালে, চাদর, রুমাল, স্যুয়েটার, মাফলার, জ্যাকেট, কোট, প্যান্ট, টাই ইত্যাদি ব্যবহার করে। মহিলারাও চাদর, জ্যাকেট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, ফতুয়া ধরনের পোশাক ছাড়াও টি-শার্ট পরিধান করে।

আর্থিক সামর্থের উপর স্বর্ণালংকার, রৌপ্যলংকার, নকল গয়না, প্লাস্টিক, কাঁচের চুড়ি, ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে। গ্রামের মেয়েদের মাঝে এখনও নাকের নথ, নোলক, কানের দুল, কড়ি, ঝুমকা, মারি, কানপাশা, মাকড়ি, গলার হাঁসুলি, তাবিজ, কবজ, পুতি, পুতির মালা, হাতের বাওটি, বয়লা, চুড়ি, বাজু, হিন্দু মহিলারা শুধু বিবাহিত হলে হাতে শাখা, অন্যরা কোমরের বিছা, গলার হার, পায়ের খাড়, নুপুর, মল ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিয়ে অর্থ্যাৎ বিবাহ সাদী বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মহিলারা সজ্জিত হয়ে বেড়াতে বের হয় ও ঘরে সাজ করে। সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্বারা এটি তৈরি বিছা হার মেয়েদের প্রিয় অলংকার। এটা সবসময় মেয়েদের কোমরের নিচে কাপড়ের উপরে থাকে।

বিয়ের কনে সাজানোর মধ্যে বেশ জাঁক-জমক আছে। প্রাচীন কালে মেয়েরা যে নানারকম অলঙ্কার পরত তার প্রমাণও মধ্যযুগের ময়মনসিংহের সাহিত্যে রয়েছে। মাথায় টিকলি বা সিঁথিপাট; নাকে নোলক, নাকছাবি, নাকমাছি, বেশর, বোলাক, কানে ঝুমকা, কুণ্ডল, কানফুল, কানাত, বালি, কণ্ঠে মালা, হাঁসুলি, হার, হারের এক, দুই, তিন বা সাত লহরি, টাকার ছড়া, তাবিজ, বাহুতে বাজু, বাজুবন্ধ, অনন্ত, তাড়, বাউটি, কেয়ুর, হাতে চুড়ি, খারু, পৈঁচি, বালা, তাড়, কঙ্কন, হাতের আঙ্গুলে আংটি, অংগুরি, অংগুরীয়ক, হাতের পাতায় রতনচূড় (আঙ্গুলে আটকানো), কোমরে চন্দ্রহার, কিঙ্কিনী, ঝুমঝুমি, নীবিবন্ধ, পায়ে নূপুর, ঘুংগুর, মল, বাঁকখাড়, মকরখাড়, বঙ্করাজ প্রভৃতি বিচিত্র আকার ও গড়নের অলঙ্কার নারীর ভূষণ ছিল। এসব অলঙ্কার প্রধানত সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরি হতো। কোন কোন অলঙ্কারে হীরা, মণি, মুক্তা, কাঁচ বা পাথর সংযুক্ত হতো। এছাড়াও দরিদ্ররা বা ফ্যাশন প্রবণ অভিজাতরা তামা, পিতল, সীসা, পশুর শিং বা হাতীর দাঁত দিয়েও অলঙ্কার তৈরি করত। চুলের কাটা সাধারণত সোনা, রূপা বা লোহা দিয়ে তৈরি হতো।

পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেই চুলের প্রসাধনী ব্যবহার করত। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই বাবরী চুল রাখত। তারা পরিপাটি করে চুল আঁচড়াত এবং চুলে নানা রকম গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করত। চুলের প্রসাধন এবং চুল বাঁধার কারুকাজেও বৈচিত্র্য ছিল। মেয়েদের চুলে বেণী বাঁধাতে অনেক কুশলতা ছিল। নানারকম ছাদে বেণী বা কবরী করে নারীদের চুল বাঁধার রেওয়াজ ছিল। এক থেকে সাত পর্যন্ত গুছি দিয়ে বেণী বাঁধা হতো। নানা রকম মনোহর খোপা তৈরি করে চুল বাধার রীতি ছিল। দুপুরের আহারাদি সমাপ্ত হওয়ার পর পাড়ার মহিলারা একত্রে সমবেত হয়ে তাম্বুল চর্বণ ও গল্পগুজবের অবসরে চুল বাঁধত। কারও কারও চুল বাঁধা বিনুনি করা এবং কবরী নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা ছিল। ফুল দিয়ে ফিতা জড়িয়ে যারা চুল বাঁধতে পারত, মেয়ে মহলে তাদের আদর ছিল খুব বেশি। বিয়ের প্রাক্কালে কনে সাজানোতে তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।[২০]

৩.৭ ভাষা

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ ও যোগাযোগের প্রধানতম বাহন। যা সংজ্ঞায় নিরূপন কঠিন। তবে ভাষার একটি কার্যনির্বাহী সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় যে, ভাষা মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা যা অর্থবাহী বাকসংকেতে রূপায়িত (বাগযন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বনিভিত্তিক রূপে বা লৈখিক রূপে) হয়ে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে।[২১] আর বাংলা ভাষা হলো একটি ইন্দো-আর্য ভাষা। যা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালী জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা এবং বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা ও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।[২২] তবে বাংলা ভাষা বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হলেও অঞ্চলভেদে বাংলা কথ্য ভাষায় অনেক পার্থক্য লক্ষ্যনীয়।

প্রমিত ভাষা রীতির বাইরে অঞ্চলভেদে প্রত্যেক অঞ্চলেরই একটি নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার এমন অনেক উপজেলা আছে যেগুলোতে আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে অনেক বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থ্যাৎ সব মিলিয়ে কিশোরগঞ্জের নিজস্ব ভাষা রীতি এ অঞ্চলের মানুষকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বর্তমান কিশোরগঞ্জ অঞ্চল সুদূর অতীতে হাজরাদি পরগণাধীন আসাম-কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল। আসাম-কামরূপের শাসনাধীন এই এলাকা স্থানীয় কোচ-হাজো শাসকদের কর্তৃক শাসিত হতো। তাদের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে এবং নৃ-গোষ্ঠীর চলাচল ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এই এলাকায় কোচ, হাজো জনগোষ্ঠীর সাথে পার্শ্ববর্তী ভাওয়াল গড়াঞ্চলের মান্দি, হদি, রাজবংশী প্রভৃতি আদি জনগোষ্ঠীর ভাষার নিবিড় মিশ্রণ ঘটে। এর সাথে সংযোজন ঘটে এতদ এলাকায় বিভিন্ন সময় আগত মুসলিম ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ীদের ভাষা। পরবর্তীকালে মুসলিম সুলতানী শাসনের প্রয়োজনে আরবী, মুঘল শাসনে রাজভাষার ফারসি এবং সবশেষে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের প্রভাবে ইংরেজির ব্যবহারে এই এলাকার ভাষাকে নানা মাত্রা দেয়। যে কারণে এইসব ভাষারূপের সাথে স্থানীয় লোকজ ভাষার মিথস্ক্রিয়ায় কিশোরগঞ্জের নিজস্ব একটি আদল নির্মিত হয়েছে।

এ জেলার ভাষা রীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় মানুষেরা অতীতকালের শব্দ বর্তমান কালের বাক্যে ব্যবহার করে থাকে। যেমন- খাইতামনা, যাইতামনা, ধরতামনা, করতামনা ইত্যাদি। এসকল শব্দ শুদ্ধ ভাষায় সাধারণত অতীতকালে ঘটিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- (সাধু ভাষায়) 'আমি বাড়ীতে খাইতামনা' (চলিত ভাষায়) 'আমি তার বাড়ীতে খেতামনা'। কিন্তু কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে এই সকল শব্দ বর্তমানকালে ঘটমান অর্থে কথ্য ভাষায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- আমি খাইতামনা (আমি খাবোনা), আমি যাইতামনা (আমি যাবোনা)।

কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি জেলার দূরবর্তী হাওর উপজেলা অষ্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, যা একমাত্র স্থানীয় অধিবাসী ব্যতীত অন্যের পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন। এ ভাষার

স্থানীয় নাম 'ছহুম ভাষা'। ছহুম ভাষার কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ- টাইঙ্গা-সিগারেট বা বিড়িঃ 'সাইরযারে টাইঙ্গা বেড়অ' অর্থ্যাৎ আমাকে একটা সিগারেট বা বিড়ি দাও। এছাড়াও জেলার অনেক কাপড়ের দোকান ও জুতোর দোকানগুলোতে মালিক-কর্মচারীরা একটি দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে থাকে। মূলতঃ ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদ থেকেই এ ভাষার উদ্ভব। কবে এবং কিভাবে এ সাংকেতিক ভাষার সৃষ্টি তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও সুদীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমিকভাবে দোকানগুলোতে এ ভাষার প্রচলন বলে জানা যায়।

কিশোরগঞ্জ এলাকার লোকজন সাধারণত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণতায় এবং ঘোষধ্বনি অঘোষরূপে উচ্চারণ করে থাকে।[২৩] যেমন-

অভাব-অবাব

অবস্থা-অবস্তা

আন্ধার-আন্দার

কথাবার্তা-কতাবার্তা

কার্তিক-কাতি

গাড়িয়াল-গাইরল

ঘন্টা-গন্টা

ঘর-গর

ঘাঁটু-গাঁড়ু

দখল-দহল

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে অনুনাসিক ধ্বনির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।[২৪] যেমন-

অঙ্কা-(এখন)

অচৈন্ন্যা-(অস্থির, উদ্বেগাকুল)

আঁইচ্‌লা-(আঁইশ, মাছের ছোট ছোট খোলস)

আঞ্জা-(আলিঙ্গন, বাহু বেষ্টন)

আঁচ্-(তাপ, অনুমান)

আঁস-(হাঁস)

কুঁইড়্যা-(কুড়েঁ, অলস)

হাঁইঞ্জা-(সাঁঝ, সন্ধ্যা)

কিশোরগঞ্জের লোকভাষায় দ্বিস্বর ধ্বনিযুক্ত শব্দের বহুল ব্যবহার সাধারণত দেখা যায়। এছাড়া ত্রিস্বর বা তদুর্ধ্ব সংখ্যক যৌগিক স্বরধ্বনির অদ্ভুত মিশ্রণে কথা বলা এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন-

অগ্রহায়ণ ---------- আঘুন

আসুন ---------- আইন/আওহাইন

আসবেন ---------- আইনজেন

চোখ ---------- চউক

বসুন ---------- বইন/বওহাইন

রোদ ---------- রইদ

এ অঞ্চলে অনেক সময় সংবৃত উচ্চারণের স্থানে বিবৃত স্বরের ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন-

দেশ>দ্যাশ, পেঁচা>প্যাঁচা, ঠ্যেলা-ঠ্যালা।

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে বেশিরভাগ শব্দ ও সেগুলোর ধ্বনি নিজেদের আঞ্চলিক ঢঙেই উচ্চারণ করে থাকে। এর মাঝে একটা ব্যাপক ব্যবহারের উদাহরণ হলো 'ক' ও 'খ' ধ্বনিকে 'হ'-তে পরিবর্তন করে উচ্চারণ করা।[২৫] যেমন-

দখল-(দহল)

মুখে-(মুহঅ)

কাঁখে-(কাঁহঅ)

পোকা-মাকড়-(পুহা-মাহর)

খিড়কি-(খেরহি)

চৌকি-(চহি)

চৌকিদার-(চহিদার)

কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে 'ট'-কে 'ড'-রূপে ব্যবহারও অহরহ দেখা যায়। যেমন-

আটা > আডা

কথাটা > কতাডা

ঘাটে > ঘাডে/ ঘাড

ছোট > ছুডু

বাটা > বাডা।

বাড়িটা > বারিডা

বেটা > ব্যাডা

মাটিতে > মাডিত্

মূলাটা >মুলাডা

হাটে > আডে

কিশোরগঞ্জ জেলায় শুধু 'ক' ও 'খ'-কে 'হ' উচ্চারণ নয়, 'শ', 'স'-কেও 'হ' উচ্চারণের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় ।[২৬] যেমন-

সূঁচ - (হুঁইছ)

সকল - (হগল)

সকলে- (হগলে, হগলতে)

সজাগ- (হজাগ)

সৎ মা- (হতাই মা)

সতীন- (হতীন)

সস্তা- (হস্তা)

সাধা- (হাদা)

সাপ- (হাঁপ) ।

সে- (হে)

শেয়াল - (হেয়াল)

৩.৮ প্রবাদ-প্রবচন

বিশ্ব লোকসাহিত্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এরই একটি অংশ লোক সাহিত্যে উর্বর কিশোরগঞ্জ জেলা । এই কিশোরগঞ্জ জেলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ছড়া, গাঁথা, কিংবদন্তী, মেয়েলী গীত, প্রবাদ বাক্য এবং আরো কত কি । কিশোরগঞ্জ জেলার অজপাড়াগাঁয়ে লোক মুখে প্রচলিত রঙ বেরঙের বাক্য হচ্ছে এসব প্রবাদ ।[২৭] যেমন-

১ । কারো স্বভাব দোষ বর্ণনা করার বেলায় বলে থাকেন:

(ক) নেরার বিবি (খড়ে শুয়ে অভ্যস্থ রমনী) খাডঅ (পালংকে) যায়,
ফিরেয়্যা ফিরেয়্যা (ফিরে ফিরে) নেরার দিকে ছায় (তাকায়) ।

(খ) ডেহি (ঢেঁকি) স্বর্গে গেলেও বারাবানে (ধান ভাঙ্গে) ।

(গ) নডি (পতিতা) বুড়্যেয়া অইলেও ফতঅ (পথে) বইয়া মুতে (প্রস্রাব করে) ।

২। নিজের দূরাবস্থার কথা বর্ণনা করার বেলায় অন্যেরা এ প্রবাদ ব্যবহার করে থাকে:

(ক) মরা গরু গাং দিঘালে হাতারায় (নদীর সর্বত্রই সাঁতার)।

(খ) গরীবেরও একটা মরা, কলেবলে বুজ্যেয়া থাহন (**কোন**ক্রমে বুজে থাকা)।

(গ) গরীব অইয়া ধেখছনা (দেখনি), ফুইল্ল্যা খেতাত্ কি রহম উম (ছেঁড়া কাঁথায় কেমন গরম)।

(ঘ) আবাগ্যেয়ার বাইগ মন্দ (অভাগার ভাগ্য), হেয়ালে ফাদে ফুবের বন্দ (শিয়ালে বায়ু ছাড়ে)।

(ঙ) আবাগ্যেয়া হাতার দিছে (সাঁতার), গাংও ছিওইছে (নদীও প্রশস্থ হয়েছে)।

(চ) গরীবের গরীবানা, নুন দিয়া পিডা বানা (লবণ দিয়ে পিঠা তৈরীর বর্ণনা করা হয়েছে)।

৩। স্বামীকে তুচ্ছার্থে:

(ক) আয় হাইয়ের হইডেয়া (স্বামীটা), থইলাম খুসঅ (কুচকীতে), ফরেয়্যা গেল তুষঅ (ধানের তুষ)।

(খ) লহর ডহর হাইয়ের থাক্যেয়া (অকর্মা স্বামীর থেকে), বিদবাই বালা।

(গ) ঘর জামাইয়া (ঘর জামাই) গোলামের ফুত (পুত্র), হিতান (শিথান) থইয়া ফৈতানে (পায়ের কাছে) হুত (শুয়ে থাক)।

৪। প্রকৃত প্রেমের বর্ণনা:

(ক) গাইয়ে বাছুরে মিল থাকলে, বন্দও খিরানী যায় (বনেও দোহন করা যায়)।

(খ) যদি থাহে (থাকে) বন্দের মন (বন্ধুর কথা), গাং ফার অইতে (নদী পাড়ি দিতে) কতক্ষন?

(গ) ফিরীত কি আর বুড়্যেয়া অয় (প্রেম কি বুড়ো হয়), দেখলেই মনে লয়।

(ঘ) গাং দেখলে (দেখলে) মুতে ধরে, লাং দেখলে আসি (হাসি) উডে।

৫। নিজের শত দোষ থাকা সত্ত্বেও অন্যের সমালোচনা করার বেলায়:

(ক) কাজীর গরঅ (ঘরে) আডারঅ ফুঙ্গাঁ (আঠার জারজ), কাজী বিছরায় গর গর (ঘরে ঘরে খুঁজে) ফুঙ্গাঁ।

(খ) এক এরি (অগোছালো রমনী), আরেক এরিরে কঅ, এরি তুই অইর অইয়া বঅ (ঠিক মত বস)।

৬। বিলাসিতা করার বেলায়:

(ক) না ফায়া (পেয়ে) ফাইছে দন (ধন), বাফে ফুতে (পিতা পুত্রে) কির্তন।

(খ) ফুতকিতে (পায়ু পথে) গু থাকলে, জিলাফী বানায় আগে (মল ত্যাগ করে)।

(গ) মাংনা লোয়া ফাইলে ছেডের আগঅ, হামি লাগায় (পুরুষাঙ্গের মাথায়) (লোয়া-লোহা, ছেডের আগঅ-পুরুষাঙ্গের মাথায়, হামি-লোহার আংটা)।

৭। অমনোযোগিতার বেলায়:

(ক) আমি করি জি জি (ঝি/মেয়ে), জিয়ে করে হাই হাই (প্রেমিক)।

(খ) বাউনে (ব্রাহ্মনে) মন্ত্র কয়, ফাডার ফেলে হুনে না (পাঠার অন্ডকোষও শুনেনা)।

(গ) জিয়ের (মেয়ের) উডে তন (স্তন), মায় ফায় না মন, ফুতের (ছেলের) উডে দাড়ি, ফিরে বাড়ি বাড়ি।

৮। নিজের ত্রুটি ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস:

(ক) ছুরের (চোরের) মার বড় গলা।

(খ) কানা, মনে মনেই জানা।

(গ) ছুরের মনে ফুলিশ ফুলিশ (পুলিশ)।

(ঘ) যার মনে যেডা (যাহা), ফালদেয়া উডে হেইডেয়া (লাফিয়ে উঠা অর্থে)।

৯। এক ঢিলে দুই পাখি বা এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ সম্পাদনের বেলায়:

(ক) ছেলামালির ছেলামালি (ছালাম দেওয়া), কফাল খাজ্জুয়ানির কফাল খাজ্জুয়ানি (কপাল চুলকানো)।

(খ) এক গাছের বেল, কুডুরা (ডুমুড়) গাছের তেল, মাউগ (স্ত্রী) থইয়া তার জেওয়াইশ লইয়া গেল।

(গ) মুত্তো বইয়া (প্রস্রাব করতে গিয়ে), আগ্যেয়া দিছে (মল ত্যাগ করে ফেলেছে)।

(ঘ) আউশ কড়্যেয়া আনছি জামাই ছেরি (মেয়ে) দিতাম কেয়া, নিজের মনে ছট ফট করে নিজেই বইতাম বেয়া।

১০। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিভা প্রকাশ পেলে:

(ক) দাদা যে বেডা উরাত ছিন্ন (উরুতেই চিহ্ন)।

(খ) যে ডা (যে) বেডা অয়, ছডি ঘরই (আতুরঘরে) দন (লিঙ্গ) খাড়ায়।

১১। কারো গুন কির্তন শুনে যদি তার সংস্পর্শে গিয়া মিথ্যা প্রতিয়মান হয়, তখন:

(ক) শব্দেতে হুনছিলাম দালান আর কুডা (দালান কোঠা),
আতায় ফিতায়া দেহি (পর্যবেক্ষণ করে দেখি) কুডুরার গুডা (ডুমুরের বিচি)।

(খ) যারে না দেকছি সে বড় সুন্দরী, যার আতে (হাতে) না খাইছি সে বড় রান্দনি (রাঁধুনি)।

(গ) ছামরা (চামড়া) সুন্দর কুমড়ার বাহল (বাকল), খায়না তার গন্দে ফাগল (গন্ধে পাগল)।

(ঘ) কতা (কথা) আছে ছন্দে বন্দে (রসাতাক), ঘুম আইয়ে না ফুগার গন্দে (দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু)।

১২। অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কাজের গুরুত্ব দেয়ার বেলায়:

(ক) ফরজের নাম নাই, নফল লইয়া দৌড়াদৌড়ি।

(খ) আগ্যেয়া হছেনা (মল ত্যাগ করে পানি লয়না), ফাদ মাইড়া (বায়ু ছেড়ে) গলা ফানিত (পানিতে)।

(গ) কাম নাই বেদি (রমনী) হাই কোলঅ লইয়া (স্বামী কোলে নিয়ে) বেড়ায়।

১৩। গভীর জলের মাছ বুঝাতে:

(ক) ছুদুমুড়ু বাতারী (ছোট্ট ইঁদুর) ঠারে কতা কয়, কাজ্যেয়া লাগায়া বাতারী চাঙ (সিলিং এ) উঠ্যেয়া বয়।

(খ) জাগ্যেয়া করেনা রাও, জানে হগল (সকল) কথার বাও।

(গ) মিরমিড়্যোয়া গুড়া (ঘোড়া) কালাই খাওনের যম।

(ঘ) কি করবো সুজন ফুতে (পুত্রে) কাঠ কুরালী (গাছ ছিদ্রকারী পাখি) তার সাথে হুতে (শোয়)।

১৪। কাজের কিছুইনা, অথচ বড় বড় বুলি:

(ক) আগেনা ফুকটি (মলশূন্য পায়ু), ফেরফেরাইয়া ডাক।

(খ) বাপ দাদার নাম নাই ছান মল্লের (চাঁন মড়লের) বেয়াই।

(গ) ছেম (পুরুষাঙ্গ) নাই বেডার বেয়া শুক্কুর বারে।

(ঘ) ডাক বড় মাইর ঠস্ (টিলা)।

(ঙ) মার নাম কেছলী বান্দী, ফুতের (পুত্রের) নাম সুলতান খাঁ।

(চ) বাড়ি উল্যেয়ার বাড়ী নাই, বাউল্যেয়র মুহঅ (পরের বাড়িতে বসবাসকারীর মুখে) ছাগদাঁড়ি।

(ছ) ছাল নাই কুত্তার বাঘা ডাক।

১৫। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পরও কারো সহানুভূতি পেতে ব্যর্থ হলে :

(ক) বক্ত অইলো বুরা (ভাগ্য হলো মন্দ), যার লাগ্যেয়া করি ছুরি (চুরি), হেই ডাহে ছুরা (চোরা)।

(খ) ফুটকি ফাইট্যেয়া মুরগী মরে , গিরসে কয় ছুড়ু ছুড়ু আন্ডা ফারে।

(গ) হাইএ কয়না ইস্তিরি (স্বামী স্ত্রী বলে স্বীকার করে না), ফাছে ফাছে (পিছনে পিছনে) ফিরি।

১৬। অসময়ে কাজের লোকে সাক্ষাত পেলে কাজের ত্বরা:

(ক) ফতঅ (পথে) ফাইছে কামার, দাও দারায়া দে আমার।

(খ) নাফিত দেখলে কুনি নুখ (নখ) বাড়ে।

১৭। অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী বুঝাতে:

(ক) দুই দিনের যুগী অইয়া বাতেরে (ভাতেরে) কয় অন্ন।

(খ) কালফোয়র (কালকের) মুরগী, আজগোয়াই (আজকেই) টুককুর।

(গ) জালর ফুত (জেলের ছেলে) সরহার অইল (শিক্ষিত হলে), বেঙ্গেরে কয় বেরেং।

১৮। অসামঞ্জস্য জিনিসের তুলনা করার বেলায়:

(ক) কই আগরতলা, আর কই উগারতলা (মাচারতলা)।

(খ) কই রাম রাম, আর কই টে টে।

(গ) কই মহারানী, আর কই ছুতমারানী (এক প্রকার গালি)।

(ঘ) কই লিয়াকত আলী, আর কই জুতার কালি।

এছাড়াও আরোও কিছু প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১। হসার (শসার) গুডাও গুডা, লাউয়ের গুডাও গুডা (বীজ),
দখ্যেয়ার মায় হাঙ্গা (নিকা) বইবো, এইডেয়াও একটা (এটাও) খুডা?

২। ঘর কাড়ুরী (ঘরে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী) হুতা (সুতা) কাডে,
কিছু ছিহন (চিকন), কিছু মোডা (মোটা)।

৩। কুতায়া (কুঁথ দিয়া) আগেনা (মল ত্যাগ করে না),
ফেদঅ বুক (পেটে ক্ষুদা) লাগবো কড়্যেয়া।

৪। রারী (বিধবা) বেডির আডারঅ (আঠার) লাং (প্রেমিক)।

৫। গরীবের বউ, বেহেরেই বাউজ (সকলের ভাবী)।

৬। কর্তা বলে ছুদির ভাই (সালা বলে গালি), আনন্দের আর সীমা নাই।

৭। এমনেই নাছুন্যেয়া বুড়ি (নাচে অভ্যস্থ), আরো ফাইছে ঢোলের বারি (শব্দ)।

৮। মাউগ (স্ত্রী) অইছে মহারানী, মা অইলো ছুতমারানী (এক প্রকার গালি)।

৯। ছাডিত্তে মাডিত ফরে (চাতি থেকে মাটিতে পরে), হাইয়ের (স্বামীর) আদর বাড়ে।

১০। ফান (পান) খাইলে স্বাদ লাগেনা, স্বাদ লাগে তার ছুনে (চুনে),
রূপ দেখ্যয়া মন বুলেনা, মন বুলে (ভুলে) তার গুনে।

১১। কামের কাম কি আর বলে অয়?

১২। বেককলর তিন আসি (হাসি)।

১৩। যার বেয়া (বিয়া) হের খবর নাই, ফাড়া পড়শীর (পাড়া প্রতিবেশির ঘুম) নাই ।

১৪। আগিলাগো আগিলা কত ভালা আছিলা।

১৫। যেমন তেমন দুই বাই (ভাই), আর যেমুন তেমুন দুই গাই (গাভী)।

১৬। জামাইরা সাত বাই (ভাই), এহকা (একা) জামাই না থাকলে কেউ নাই।

১৭। বাগ (বাঘ) নাই দেশঅ হেয়াল (শিয়াল) রাজা ।

১৮। দুধ দেয় গাইয়ের লাত্তিও বালা (ভাল)।

১৯। মার ফুরে না (ব্যাথা লাগেনা) মারানীর (স্ত্রীর) ফুরে।

২০। থাকতে কাচি (ধান কাটার দা), আরাইলে (হারালে) দাও (দা)।

২১। উছিত কতায় বন্দু (বন্ধু) বেজার, তত্তা (গরম) ভাতে বিলাই বেজার।

২২। মার সাতে (সাথে) মামুর বাড়ীর গপ্প (গল্প)।

২৩। দুদের (দুধের) দর দেখ্যেয়া, মেরা মেরী (ভেড়া ভেড়ী) উর নামায়।

২৪। বওনের জায়গা আইলে হুতনের বাও অয়।

২৫। ঠেলার নাম বাবাজী।

২৬। গাও মানে না আফনেইও (নিজেই) মড়ল।

৩.৯ লৌকিক বিশ্বাস

পৃথিবীর সব দেশে বা সমাজেই কম-বেশি কিছু লৌকিক আচার বা প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকেই চলে আসছে। রয়েছে বহু বিচিত্র বোধ, বিশ্বাস। সংস্কার-কুসংস্কার দৈনন্দিন জীবনে এমন ভাবেই শেকড় বাকরে ছড়িয়ে জড়িয়ে আছে যে সেসব একেবারে লঙ্ঘন বা এড়িয়ে যাওয়া সকল ক্ষেত্রে অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রচলিত সেসব লোকাচারের অনেকগুলিরই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বা এগুলো নিছক বিশ্বাস। লোকজ ঐতিহ্য, প্রথা, আচার, অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনন্য দেশ। এসব নানামাত্রিক বোধ, বিশ্বাস ধর্ম, প্রার্থনা, পরিবার সমাজ, চাষবাস, রোগ ব্যাধির নিরাময়ে, জুটী বন্ধন, সৎকার, প্রকৃতি, আবাহাওয়া প্রায় সকল বিষয়ে সুবিস্তৃত। লোকায়িত বাংলার এসব লোকাচার চলে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। প্রকৃতির স্নেহ সান্নিধ্যে অথবা বৈরিতায় মানুষ যখন নানা মিশ্র-সংকটে জীবন নির্বাহ করছে সম্ভবত তখন থেকেই মানুষ আশ্রয় খুঁজেছে নানা লৌকিক অথবা স্ব-সৃষ্ট নানা কল্প অস্বত্বিতের কাছে।

কিশোরগঞ্জের জেলার সমাজ ব্যবস্থার দৃশ্যপটে সামগ্রিক লোকাচারের বহুবিধ বৈচিত্র্যিক প্রথাবদ্ধতা এখনো দৃশ্যমান। যদিও উন্নত জীবনযাপনের সহজতর হাতছানি, রঙিন আধুনিকতার অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ, নবায়িত শিক্ষার প্রায়োগিক আলোক, যুক্তিবুদ্ধির সুক্ষ্মতর বিশ্লেষনী যোগ্যতার বিকাশ সেসব লোকজ কর্মকান্ডের অনেকাংকাশেই বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায়। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের লোকজ এসব সামাজিক প্রথার যেমন রয়েছে প্রচুর মিল, তেমনি অনেক গুলোর রয়েছে একান্তই নিজস্বতা এবং স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। সূদুর অতীতকাল থেকেই এই জেলার রয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতির অতি উদ্ভাসিত প্রোজ্জ্বল ধারাবাহিকতা, যা জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে বিপুল ভূমিকা রেখেছে। তার সিংহভাগই লোকজ-কথা, গাঁথা ও প্রথা নির্ভর।

কিশোরগঞ্জের নিরক্ষর বা নিরক্ষর প্রায় প্রাকৃতজ মানুষজন কৃষক, দিন মজুর, গাতক (গায়ক), জারি-সারিওয়ালা, মাঝিমাল্লা, গ্রামীণ বুড়োবুড়ি, কর্মক্লান্ত-ঘর্মক্লান্ত গৃহবধূ, কৃষানী কন্যাদের নিয়ে যে জীবনধারা চলে আসছে আবহমান কাল ধরে তাদের মুখে মুখে, আচার আনুষ্ঠানিকতার ভিতর দিয়েই পরিচয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে অদ্যাবধি। সেসব ভালো কি মন্দ, যৌক্তিক বা অযৌক্তিক তা কি অনগ্রসরতা বা পশ্চাদপদতা- এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার প্রয়োজনীয়তা এখনকার ব্রাত্যজনদের কাছে একান্তই গৌণ। তারা তাদের দাদা-পরদাদাদের দেখে বংশ পরম্পরায় সেসব দেখে দেখে, শিখে শিখে অভ্যস্ত হয়েছে। সেগুলা তাদের সুখ-দুঃখের সাথী, আনন্দ-বেদনার সহযাত্রী হয়ে রয়েছে। কালের ধোপে টিকে থাকতে না পেরে সেগুলোর অনেকগুলো গতায়ুও হয়েছে। বাকি গুলো ভবিষ্যতে থাকবে কিনা বলা কঠিন।

গ্রাম বাংলার জন-জীবনধারায় তন্ত্রমন্ত্র এবং লোকচিকিৎসার মূলে রয়েছে নানান ধরনের কুসংস্কার ও লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস। দেশীয় গাছ-গাছড়া-লতা-পাতার গুণাগুণ এবং ঝাড়ফুঁক দিয়ে এমন চিকিৎসা জনমনে সমন্বিত হয়ে আছে। আবার আয়ুর্বেদিক বা কবিরাজী প্রক্রিয়ার সঞ্চায়নও এমন ধরনের চিকিৎসা প্রক্রিয়া বর্তমান। কিশোরগঞ্জেও এমন তন্ত্রমন্ত্র এবং চিকিৎসাপ্রকরণের অপ্রতুলতা নেই। প্রাচীনকাল থেকেই এগুলো এ অঞ্চলে চলমান। চিকিৎসার প্রথম দিকে যখন কোনো ঔষধ আবিষ্কার হয়নি, তখন প্রাচীন গ্রামীণ কবিরাজী চিকিৎসাই ছিল একমাত্র প্রধান চিকিৎসা। এ চিকিৎসায় ব্যবহার হতো লতাগুল্ম আর হতো তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তাবিজ কবজ আর ঝাড়-ফুঁক। এ ধরনের চিকিৎসায় যিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, তার নাম ছিল কবিরাজ। কবিরাজেরা শারিরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে আমাশয়, আমবাত, অর্শ, বেরিবেরি, হাঁপানী, মাথাবিষ, পেটবিষ, গায়ের জ্বালা-যন্ত্রণা-বিষ, জ্বর, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, চোখ ওঠা, চোখে ছানি পড়া, চোখে কিছু পড়া, কলেরা, বসন্ত, জন্ডিস, হাড়ভাঙ্গা, হাড় মটকা, অর্ধাঙ্গ বা পক্ষাঘাত, মৃত সন্তান প্রসব করানো, মৃত সন্তান প্রসব বন্ধ করা, শীঘ্র সন্তান প্রসব করা, গর্ভপাত ঘটানো ইত্যাদি।

এক কথায় বলতে গেলে এমনি ধরনের কত শত শত প্রকার রোগের লক্ষণ আছে, আর করিরাজেরা সেসব রোগের চিকিৎসা করতেন। এসব রোগের চিকিৎসার সময় তারা যেসব তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করতেন, সে মন্ত্র ছড়া বা গান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়।

কিশোরগঞ্জের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে লোক চিকিৎসার একটি বিশেষ ভাণ্ডার রয়েছে। এ ভাণ্ডারে যেসব লোকছড়ার সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলো কোথাও কোথাও মন্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- তন্ত্র-মন্ত্র, যাদু-টোনা, শিঙ্গা লাগানো, হাঁড়ভাঙ্গা, ঝাঁর ফুক, তেলপড়া, পানিপড়া, গুড়পড়া, কড়িপড়া ইত্যাদি কাজে মন্ত্রপাঠের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লোকচিকিৎসার সাথে সমাজে একটি বিশেষ সম্প্রদায় যুক্ত। এরা হলেন- পীর-দরবেশ, সন্ন্যাসী-পুরোহিত, ফকির-ওঝা, গুনীন, বৈদ্য, বেঁদে, দাই, বইদ, হাকিম, কবিরাজ উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রাচীন মসজিদ, মন্দির, দরগা, ভিটা, পীরবাড়ি, মুন্সীবাড়ি,

বৈদ্যবাড়ি, কবিরাজ বাড়ি নামে লোকচিকিৎসার উল্লেখযোগ্য স্থান বা এলাকা রয়েছে। যেমন- কিশোরগঞ্জ উপজেলা সদর 'যশোদলপুর' নামক গ্রাম, কটিয়াদী উপজেলার 'ভাণ্ডা' নামক গ্রামে আজও 'হাড় ভাঙ্গার' লোকচিকিৎসার বিখ্যাত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।[২৮]

তারা সাধারণত যেসকল রোগে লোকচিকিৎসার কাজ করেন সেগুলো হলো- দাঁতের রোগ, বিশেষ করে দাঁত তোলা এবং দাঁতের পোঁকা বের করা, চোখের রোগ, চোখ ওঠা, চোখে কিছু পড়া, গলায় মাছের কাটা আটকানো, কলেরা, বসন্ত, শিয়াল-কুকুর-বিড়ালের কামড়, সাপে কাটা, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ, মাথাধরা, জন্ডিস, হাঁড়ভাঙ্গা বা মচকানো, শিশু বিছানায় প্রসাব করা, স্বপ্নদোষ, ভূত-পেত্নীর আছড়, কু-নজর, নারীপুরুষ বশীকরণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি। নিম্নে লোকচিকিৎসার কিছু লোকছড়ামূলক তন্ত্রমন্ত্র তুলে ধরা হলো-[২৯]

অচ্কা ঝাড়া মচ্কা ঝাড়া
বিলাই আগে ছড়া ছড়া
কুত্তা আগে দৈ।
এমুন ঝাড়া ঝাইড়া দিয়াম
চৌদ্দ গুষ্টি সই।

এই লোকছড়াটি কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে হাড়ভাঙ্গা বা মচকানো হাড়কে মন্ত্রের মাধ্যমে সারিয়ে তোলার একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেন। ছড়াটি উজানভাটির হাওর জনপদে প্রচলিত।

আইদ্যা ঝাড়া বাইদ্যা ঝাড়া
আরো দিলাম তেনা ঝাড়া
তেনার ভিতর কালো ভইস
ভূত-পেরত যা-ই অইস
ঐ দূরের গাছ অ যা।
আমার রোগীরে ছাইরা যা।

জ্বীন-পরী, ভূত-পেরত কত না রোগে বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। আর এসব এ জেলার গ্রামাঞ্চলে ভূত-প্রেত্নীর আছড়ে রোগীর দেহে মন্ত্র পাঠ করা হয়-

করাত করাত মহা করাত
ভাল মন্দ আমার বরাত।
মাথা বিষ, পেট বিষ,
যত আছে নাগের বিষ।

ডাইনে কাডে বায়ে কাডে,
মন্ত্র পড়ার দামে কাডে ।
দেবীর দোহাই চলে ব্যথা
দিব্যি রইল আমার মাথা ।

মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, কোমর ব্যথা, পা ব্যথা, গা ব্যথা অর্থ্যাৎ সারা অঙ্গের ব্যথা-বেদনা-বিষ জ্বালা যন্ত্রণার উপর কবিরাজের এ লোকছড়াটি মন্ত্র হিসেবে কাজ করে-

ভূত-প্যারতে লাগুক গায়,
হাড়-মাংস খোয়াইয়া খায় ।
দৃষ্টি নজর বাউছুল্লির বান
কাইট্টা করি খান খান ।

তাছাড়া কিশোরগঞ্জে লোকছড়ায় গবাদিপশুর তান্ত্রিক চিকিৎসা বিষয়ে চিকিৎসক গোয়ালদের কথাও ফুটে উঠেছে। মানুষের পাশাপাশি পশুদেরও গ্রামীণ গোয়ালদের দ্বারা তন্ত্র-মন্ত্র যোগে চিকিৎসা করা হতো। চতুর গোয়ালারা গ্রামীণ মুর্খ কৃষকদের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে গবাদি পশুর চিকিৎসা করত। রোগ-বালাই ও কল্পিত 'শনির দৃষ্টি' থেকে রক্ষা করার জন্য গোয়ালেরা গ্রামের রাস্তা-ঘাটে উচ্চস্বরে 'হো-ও-ও' সুর স্বর ধ্বনি তুলে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করতেন। শব্দ শুনে কৃষকেরা তাদের ডেকে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতেন। চিকিৎসক গরুকে ধরে প্রথমেই 'বশ' করার জন্য এক ধরনের 'রশি' বা দড়ি ব্যবহার করতেন। গরুর শরীরে কিংবা পায়ে বেঁধে অদ্ভুত তন্ত্র-মন্ত্র যোগে লোকছড়া পাঠ করতেন। সবচেয়ে ভয়ানক হলো আগুনে পোড়ানো লোহার তৈরি একধরনের অস্ত্র তাকে বলা হয় 'আকড়া'। এই আকড়া গরম করে গরুর গায়ে ঠেসে ধরে চ্যাকা দিত। গরুর শরীরের কিছু অংশ পুড়ে গিয়ে গনগনে লাল ক্ষতের সৃষ্টি হতো। এ ক্ষত শুকিয়ে গেলেও পরবর্তীতে সাদা দাগের চিহ্ন দেখা যেত। আকড়া হচ্ছে লোহার 'শিক' দ্বারা তৈরি এক ধরনের আংটা। যা দ্বারা কবিরাজ চিকিৎসা করতেন। পকেটে থাকত কিছু লতা পাতার তৈরি ভেষজ ঔষুধ। বিনিময়ে কৃষকের কাছ থেকে টাকা-পয়সা-চাল-ডাল ইত্যাদি গ্রহণ করত।

সুদূর যশোর-ফরিদপুরের গোয়াল সম্প্রদায়ের এ অঞ্চলে আগমনে তাদের কদর ছিল বেশি। স্থানীয় গোয়ালদের ও উপস্থিতি ছিল। এ পেশাধারী গোয়ালদের এখনও কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে পূর্বের তুলনায় কম হলেও দেখা যায়। কিশোরগঞ্জ জেলা সদর গাইটাল নামক এলাকায় এখনও কয়েকঘর স্থানীয় গোয়ালদের বসতি রয়েছে।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আজও গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওঝার ঝাড়ার তন্ত্রমন্ত্র প্রচলিত আছে। গ্রাম্য ওঝা-বৈদ্য-গুণীনদের তন্ত্রমন্ত্র সাধনার কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরু আছে ।আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেই এর উদ্ভাবক হিসেবে পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে লোকচিকিৎসা ক্ষেত্রে কবিরাজ, ফকির, পীর-দরবেশ, সাপুড়ে বা ওঝা যেসব মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করে মুমূর্ষ রোগীকে নিরাময় করে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে যারা সাপের বিষ ঝাড়ে তাদেরকে 'ওঝা' বলা হয়। ওঝারা ব্যক্তিগত জীবনে বহু নিয়ম-কানুন রক্ষা করে চলে। অনেকে ছাতা মাথা দেয় না, জুতা পরে না, সাপ মারে না কিংবা রোগীর বাড়িতে জলস্পর্শও করে না। ওঝারা ঝাড়তে গিয়ে যে মন্ত্র ব্যবহার করে তা হলো-[৩০]

ধর্ম চালম কর্ম চালম
সাপের মই টক চালম
আসা আসি কমন চালম
ধর্ম চালম কর্ম চালম।

ওঝার হাতে ঘটিতে রাখা পানি। সাধারণত পানি তোলার সময় ঘাটের পানি আনা হয়। পানি পড়ার মন্ত্র নিম্নরূপ-

সাধের বুড়ারে চিকনী করে রাও,
কোনখানে দংশিলেরে বুড়া যইবত নারীর গাও?
সাধের চিলারে বাঁকা বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে চিলা যইবত নারীর গাও?
সাধের মাছছায়া রে মাছোয়া বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে মাছছায়া যইবত নারীর গাও?
সাধের কাইল্যা রে কাইল্যা বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে কাইল্যা যইবত নারীর গাও?

এরপর শুরু হয় ঝাড়ার মূল অংশ-

এ পাড়ে ধোবা ধুবনী সে পাড়ে তার পাও,
মাঝখানে দিয়া বইয়া যায় সওদাগরের নাও।।
সওদাগরের নাওখানি ঝুমুর ঝুমুর করে,
হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া বিষ ভূমে আইসা পরে।।
ভূমেতে আসিয়া বিষ চায় চতুরদিকে,
ঝাড়িতে লাগিল নেতা পদ্মার সাক্ষাতো।।

নেতা বলে পদ্মাবতি কিবা ঝাড়া ঝাড়ো,
'জলসাফা' 'কুলি ভাঙ্গা বীর' সকল জ্ঞানের বড়
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব,
রহিতে না পারো বিষ মা পদ্মার তলব ।।

কোনো কোনো ওঝা সাপে কাটা রোগীকে দশ পনের হাত দূরে গাইলের উপর বসিয়ে ঝাড়া শুরু করেন। প্রথমে ওঝা ঘটির পড়া পানি দিয়ে মাটির উপর হাত ঘোরাতে ঘোরাতে পানি ঢালে। পানি মাটিতে কাদা হয়ে লেপার মত হয়। হাত কাদা মাটির উপর প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে। 'দোয়াই আল্লার', 'দোয়াই পয়গম্বরের', 'দোয়াই আলীর', 'দোয়াই কালীর', 'দোয়াই পদ্মার', 'দোয়াই ওস্তাদের' বলে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে মন্ত্র আওড়ায় এভাবে-

কর্ম ছালি ধর্ম গো ছালি
ছালি আর গো যত দেব ধরম গো ।।
পঞ্চম পাণ্ডব ছালি অষ্ট মাতা তবে গো,
চৌষট্টি নগরে ছালি ধর্মপুরের মধ্যে গো ।
চল চল হাতরে চল
চল আরগো যেখানে সাপের বিষ গো ।

এ অবস্থায় ওঝা হাত ঘোরাতে ঘোরাতে রোগীর পিঠে এবং মাথায় থাবা দেয়। তারপর আবার শুরু করে মন্ত্র এভাবে-

থাবায় ধরলাম বিষ
চিপায় করলাম পানি
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব,
রহিতে না পারে বিষ পদ্মার তলব ।।

এরপর শুরু হয় মূলমন্ত্র। মূলমন্ত্র এ রকম-

সাধের বুড়ারে চিকনী করে রাও
কোনখানে দংশিলে বুড়া যইবত নারীর গাও?
যইবত নারী জলে যায় গোলখাড়য়া তার পায়
পথে পথে নারী জাতে যৈবন বিলায়।
ময়ূরা ময়ূরী নাচে উলু খেতে থাইক্যা,
গুইয়াডায় লড়ালড়ি যায় সেই পারে থাইক্যা;
সেই পার সাধু সদাগর ডিঙ্গা বাইয়া যায়
এই পাড়ে পোবা ছেড়ি এ কাপড় ধুলাই করে।

এর পরবর্তী অংশ ভারী অশ্লীল। তাই এখানে উল্লেখ করা হলো না। এগিয়ে চলে ঝাড়-ফুঁক, আর মন্ত্র পড়েন। যেমন-

ওরে কেউট তুই মনসার বাহন
মনসা দেবী আমার মা
ওলট পালট পাতার ফোঁড়
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে,
তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
দুধরাজ মণিরাজ
কার আজ্ঞা-বিষহরির আজ্ঞা

৩.১০ সামাজিক উৎসব

বলা হয়ে থাকে 'বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ'। আচার-অনুষ্ঠান প্রিয় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ শাস্ত্রীয়, লৌকিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন করে থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকেই এ জেলা সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানে প্রসিদ্ধ। আচার অনুষ্ঠান প্রিয় এ জেলার মানুষ এ দেশের জাতীয় উৎসব নববর্ষ, বিজয় উৎসব, ঈদ উৎসব, দুর্গা উৎসব ইত্যাদি থেকে শুরু করে লৌকিক বিভিন্ন লোকউৎসব পালন করে আসছে। নিম্নে কিশোরগঞ্জের কিছু উৎসব তুলে ধরা হলো:

নববর্ষ

বাংলা বছরের প্রথম দিন অর্থ্যাৎ পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়ে থাকে। বারো মাসে তের পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। বাংলার বর্ষ তালিকায় প্রথম স্থান বৈশাখ মাসের। ১লা বৈশাখ তাই বাঙালির নববর্ষ উৎসব। বাংলা নববর্ষ শুরু হয় ৯৬৩ হিজরির ২রা রবিউস-সানি, রোজ শুক্রবার, ইংরেজি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল থেকে। তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট মহামতি আকবরের সময়ে তার রাজসভার অন্যতম রত্ন রাজ-জ্যোতিষী আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজীর উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়।সে সময়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরবী প্রথম মাস মহররমের 'নওরোজ' উৎসবের মত সকল ভারতীয়দের হিন্দু-মুসলিম বাঙালিসহ সৌরবর্ষের প্রথম মাস বৈশাখী উৎসব পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। এর পূর্বে বাংলা বছরের প্রথম মাস হিসেবে ধার্য হয় অগ্রহায়ণ মাস। বাংলায় এককালে অগ্রহায়ণ মাসেই বছরের প্রথম নববর্ষ হতো। মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন বাংলার শাসক তখন খাজনা আদায়ের জন্য ধার্য হয় বৈশাখ মাস। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে নববর্ষ উৎসব ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে জমিদার, তালুকদার, অভিজাত, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীদের পুণ্যাহ, হালখাতা প্রভৃতি উৎসবকে কেন্দ্র করে।

সে সময়ে পায়রা উড়ানো, ঘুড়ি উড়ানো ছাড়াও যাত্রা, বাউল, টপ্পা, মারফতি, মুর্শিদি প্রভৃতি গান বাজনার সাথে গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হতো। রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদারদের বাড়ির আঙিনা কিংবা কোন নদীর তীরবর্তী বটবৃক্ষের নীচে বসা এসব মেলায় চিড়া, মুড়ি, মিষ্টিসহ নানান জিনিস কিনতে পাওয়া যেত। বাংলাদেশ সরকার বাংলা নববর্ষকে জাতীয় জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি দিনটিকে সরকারি ছুটি ষোষণা করেছে। বর্তমান বাংলাদেশে নববর্ষ জাতীয় দিবসের মর্যাদায় স্বীকৃতি পেয়েছে। আগের দিনে নববর্ষ বলতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হালখাতা নবায়ন করে আনন্দ উৎসব হতো সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে এবং শহরতলীতে। এক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে নববর্ষ যেন জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। নববর্ষে এখনো গ্রাম বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের হালখাতায় মিষ্টি দ্রব্য পরিবেশন করে থাকে। নববর্ষ উৎসব উদযাপন গ্রাম থেকে শহরমুখী হতে শুরু করেছে। বাংলা নববর্ষ পালনে বাঙালি এক গৌরব দীপ্ত জাতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।

এ উপলক্ষে গ্রামবাংলার কৃষক পরিবারে চৈত্রসংক্রান্তির রাতে গৃহিণীরা 'আমানি' প্রস্তুত করে। এতে শরীর ঠান্ডা থাকে বলে তাদের বিশ্বাস। চৈত্রসংক্রান্তির দিন সকালে বিভিন্ন ঔষধি গাছের রস তৈরি করে খাওয়ায় গ্রামের বয়স্ক লোকেরা। তাছাড়া সাত রকমের শাক রান্নার প্রচলনও দেখা যায় এ জেলার গ্রামাঞ্চলে। ১লা বৈশাখে সবাই সাধ্যমত উন্নত ভোজের আয়োজন করে। এর মূলে তাদের এই বিশ্বাস কাজ করে যে, বছরের প্রথম দিন ভাল ভোজ হলে সারা বছরই ভাল ভোজ হবে। এ উৎসবকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন শহরে, নগরে ও গ্রামাঞ্চলে মেলা বসে।

বিবাহ উৎসব

বিয়ে বা বিবাহ একটি অন্যতম সামাজিক উৎসব। ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অত্যধিক। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কিশোরগঞ্জ জেলায়ও জাঁকজমকভাবে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান মূলত বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকে বিয়ের পরের সপ্তাহখানেক ধরে চলতে থাকে। কনে বা বর দেখাশুনা পরবর্তী পাকা কথার দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় উৎসবের প্রস্তুতি।

বর্তমানে অবশ্য আংটি বদলও বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় যুক্ত হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজনরা কয়েকদিন আগে থেকেই আসতে শুরু করে। মূলত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় গায়ে হলুদ দিয়ে। গায়ে হলুদ বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। অঞ্চলভেদে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন- তেল হলুদ, তৈল-কাপড়, হলুদ-গোসল, কুলোই ভাঙ্গা, উঠনা দেওয়া, কুড় দেওয়া, হলুদ কুটন, হলুদ ভাঙ্গা, খায়তাগা ইত্যাদি। হিন্দু বিবাহে অধিবাসের পরিবর্তে গাত্রহরিদ্রা কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরগঞ্জের অঞ্চলভেদে একে 'হলুদ কোটা' বা 'গায়েহলুদ' বলা হয়। মূলত এটি একটি দেহশুদ্ধি অনুষ্ঠান। এর দ্বারা দেহ কেবলমাত্র যে দুর্গন্ধমুক্ত হয় তাই নয়, দেহের ঔজ্জল্যও বৃদ্ধি করে। এইজন্যে ভেষজ দ্রব্যাদির সঙ্গে দুধের সর

মিশ্রিত করা হয়ে থাকে। বর্তমানে অবশ্য আচার-অনুষ্ঠান পালনের ধরনের সাথে সাথে এর নামেরও কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন- হলুদ সন্ধ্যা, মেহেদি সন্ধ্যা, হলুদ ছোঁয়া ইত্যাদি। এ অঞ্চলে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয় বিবাহের দুই-তিনদিন পূর্বে। এখন অবশ্য বিয়ের আগের রাতেই বেশির ভাগ গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর এবং কনে উভয়ের বাড়িতে বেশ ঘটা করে এর আয়োজন করে। দুইপক্ষেই হলুদের ডালা সাজানোর রেওয়াজ আছে। নতুন ডালা হলুদ, সিঁদুর এবং আলতা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। এতে হলুদ, মেহেদি পাতা, মেথি, গিলা, আফসান, আমলা প্রভৃতি থাকে। পাত্র ও পাত্রী পক্ষ পরস্পরের বাড়িতে হলুদের ডালা পাঠায়। এছাড়া পান-সুপারি ও মিষ্টি পাঠাতে হয়। পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রের বোন, ভাবী এবং প্রতিবেশী প্রমুখ হলুদ নিয়ে কনের বাড়ি যায় এবং একইভাবে কন্যাপক্ষ থেকেও পাত্রের বাড়িতে যায়। পাত্র এবং পাত্রীর মায়ের জন্য উভয়পক্ষ থেকে তেলাই শাড়ি পাঠানো হয়।

গায়ে হলুদে সর্বপ্রথম পাত্র-পাত্রীর মা দুধের সর মিশ্রিত হলুদ বাটা, গিলা কপাল স্পর্শ করেন। এরপর চাচি, ফুফু, খালা তা অনুসরণ করেন। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাদের শরীরের তাবিজ, গয়না-গাটি খুলে ফেলা হয়। মুসলিম বিবাহে পাত্র-পাত্রীকে পশ্চিমমুখী হয়ে একটি জলচৌকি অথবা সিঁড়ির উপর বসানো হয়। গায়ে হলুদের দিন মা-বাবা রোজা রাখেন। গ্রামাঞ্চলে হলুদ বাটার পর পাঁচ/সাতজন এয়ো সারিবদ্ধভাবে মাথায় আঁচলঢাকা কুলা নিয়ে গোসলের স্থানে যায়। এয়োরা মিলে তার গায়ে হলুদ দিয়ে গোসল করায়। এই সময় হলুদ কুটার গান গায়। বরের বাড়িতেও অনুষ্ঠান হয়। গায়ে হলুদের পর থেকে বর না-আসা পর্যন্ত কনে ঝাল-ভাত খেতে পারে না। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের পর পাত্র-পাত্রীর সন্ধিকাল চলতে থাকে। ঐ সময় তাদের বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। কাউকে স্বাধীনভাবে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। লোকবিশ্বাস আছে যে, হলুদের গন্ধে ভূত-প্রেত, জ্বীন-পরী প্রলুব্ধ হয়। তাই বেশ সতর্ক থাকতে হয়। আর এজন্য রক্ষাকবজ হিসেবে হাতের কাছে লৌহ নির্মিত কিছু রাখা হয়।

মুসলিম বিয়ে উপলক্ষে বর এবং কনেকে পৃথক পৃথকভাবে বৃহৎ থালা বা বাসনে বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করা হয়। বরের সাথে তার বন্ধু-বান্ধব এবং কনের সাথে তার বিশেষ বান্ধবীরা একই থালা বা বাসন থেকে পরিবেশিত খাবার খেয়ে থাকে। এ ধরনের খাবারের সাথে সামর্থ অনুযায়ী আস্ত কচি খাসি অথবা আস্ত মোরগ। বর-কনেসহ তার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককে একটি করে 'মোসল্লাম' পরিবেশন করা হয়। কখনো কখনো কোনো আনন্দঘন পরিবেশে এই 'মোসল্লাম' খাসি কিংবা মোরগ খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি থেকে শুরু করে হুড়োহুড়ি হয়ে যায়। বর-কনের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত এই বিশেষ খাবারকে 'সদরভাতা' বলে। কিশোরগঞ্জের স্থানীয় ভাষায় সদর ভাতা খাবারকে 'হদরভাতা' খাবার বলে। সদরভাতা খাবার প্রাচীন কাল থেকে সামর্থ অনুসারে পরিবেশন করার রীতিনীতি আজও চালু রয়েছে।

সদরভাতা খাওয়ার সময় বর ও কনের হাতে এক ধরনের রাখি পড়া থাকে। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় কাঙ্গনী বা কাঙ্গেনা। সরিষা, শুকনো নালিতাপাতা, ছোট্ট এক টুকরো হলুদ আর সোনা-রূপার ছোট দু'টি কণা একটি ছোট্ট সাদা কাপড়ে মুড়ে বরের ডান হাতে এবং কনের বামহাতে বেঁধে দেওয়া হয়। কাঙ্গনী হলো বর-বধূকে অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার বিশ্বাস দ্রব্য।[৩১]

হিন্দু শাস্ত্রমতে কন্যার বিবাহের আগে শ্বশুর বাড়ি থেকে কনের জন্য পাঠানো অলংকার, কাপড়, মিষ্টি, মাছ, পান-সুপারি ইত্যাদি উপহার স্বরূপ দিয়ে কন্যাকে আর্শীবাদ করা হয়। কন্যার এই আর্শীবাদ স্বরূপ নতুন কাপড় পরে অলংকারাদি পড়ে সাজ-সজ্জার অনুষ্ঠানকে মঙ্গলাচরণ বলে। কিশোরগঞ্জের সর্বত্র হিন্দু ধর্ম মতে এই অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ে পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে বধূবরণ সাড়ম্বরে পালিত হয়। এটি একটি আনন্দঘন স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠান। বর যখন নববধূকে নিয়ে নিজ গৃহে আগমন করে তখন এক পিড়িতে দুইজনকে দাঁড় করিয়ে প্রথমে পুত্রের ও পরে বধূর মাথায় তিনমুষ্টি ধান দিয়ে মা এবং পরে চাচি, নানি, দাদি ও অন্যান্যরাও বরণ করে। হিন্দু সমাজে শাঁখ বাজে, উলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়। বরণকুলায় সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্যের দ্বারা বর ও বধূকে বরণ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাবার পথে ঘরের মেঝে হতে দরজা পর্যন্ত কাপড় বিছানো থাকে, বর ও বধূ তা মাড়িয়ে যায়। কিশোরগঞ্জের কোথাও কোথাও নববধূ ও বরকে পালকি থেকে নামিয়ে ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করে বধূকে কোলে করে চাদর-বিছানা পথ দিয়ে ঘরে তোলা হয়। তাদেরকে ঘরে এনে পশ্চিমমুখী করে বসানো হয়। এরপর নববধূর মুখদর্শনের পালা শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা নববধূর মুখদর্শন করে টাকা-পয়সা উপহার দেন। পালকি ছাড়াও কিশোরগঞ্জে এককালে 'মাপা বা মাফা-মাহা' নামক বাহনের প্রচলন ছিল। এ যুগে স্থানভেদে রিক্সা, কোথাও নৌকা, টমটম, ভটভটি ইত্যাদি বাহনের প্রচলন রয়েছে। তবে বর্তমানে অবশ্য গ্রামাঞ্চলেও বিয়েতে মাইক্রোবাসের ব্যবহার দেখা যায়।

বিবাহের পরবর্তী বরের বাড়িতে বউভাতের আয়োজনে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। কনের আত্মীয়স্বজনও নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। বধূকে অন্দরমহলে সুন্দর করে সাজিয়ে বসানো হয়। সামনে পান ভর্তি পানদানি থাকে। বধূদর্শন করে তার হাতে টাকা-পয়সা, গয়না এসব উপহার সামগ্রী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ এবং সম্প্রদায়ে এই বৌভাত প্রথার রীতিনীতি প্রচলিত আছে। বৌভাত একটি উৎসবমুখর অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে বর-কনের উভয়পক্ষ এসে যোগদান করেন। হিন্দু সমাজে প্রথা আছে নববধূকে প্রথম শ্বশুর বাড়িতে রান্নাঘরে নেওয়া হয় তার হাতে তৈরি রান্না খাবার সবাইকে খাইয়ে বউকে সমাজভুক্ত করা হয়। বৌভাত সমাপ্তির পর নববধূকে কন্যার বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। একে 'ফিরানী বা মেলানী' বলে। হিন্দু পরিবারে বর এসে আট দিন কন্যার পিত্রালয়ে অবস্থান করে।

এই অবস্থানকে 'অষ্টমঙ্গলা' বলে। মুসলমান সমাজে চার থেকে পাঁচ দিন কন্যার বাড়িতে অবস্থানের লৌকিক আচার দেখা যায়। এই অবস্থানের পর বর যখন নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন শ্বশুরালয় কর্তৃক বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রাপ্ত হন।

তবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কিশোরগঞ্জেও বর্তমানে বিবাহের ধরনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে বিয়ের সকল অনুষ্ঠানাদিই করা হতো বর ও কনের পিত্রালয়ে। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় ব্যস্ত মানব জীবনে ঝামেলা এড়ানোর জন্য বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা মূলত কমিউনিটি সেন্টার গুলোতেই সামর্থ অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বর ও কনের বাড়ির অনুষ্ঠান এক সাথেই করা হয়ে থাকে। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানেও এরকমটাই দেখা যায়। ফলে গ্রামীণ বিয়ের আমেজটা এই আধুনিকতার যুগে অনেকটাই ফিকে মনে হয়। এমনকি গ্রামীণ বিয়েতে যে মেয়েলি গীত গাওয়া হতো তার জায়গা দখল করে নিয়েছে আধুনিক যুগের গান-বাজনা ও লাউড স্পিকার।

ঈদ উৎসব

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা মুসলমানদের দু'টি শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। পূর্ণ এক মাস সংযম সাধনা, ত্যাগ ও কঠোর ঈমানি পরীক্ষার পর ঈদুল ফিতর আনন্দের বাণী বহন করে আনে। ঈদ আনন্দ ও খুশির সাথে উৎসব আমেজ বয়ে আনে। মুসলমানদের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে মহান আল্লাহ তায়ালা কঠিন পরীক্ষার জন্য তার প্রিয় পুত্র ঈসমাইলকে কুরবানি দেওয়ার আদেশ পালন থেকে ঈদুল আজহায় কুরবানি পদ্ধতি চালু হয়েছে।

ইসলামে ঈদ মুসলমানদের মধ্যে এক মহামিলন। আমিরের সঙ্গে ফকিরের মিলন, শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মিলন, মিত্রের সঙ্গে মিত্রের মিলন, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মিলন, পিতার সঙ্গে পুত্রের মিলন, মাতার সঙ্গে কন্যার মিলন, ধনীর সঙ্গে ভিখারীর মিলন, বৃদ্ধের সঙ্গে শিশু-যুবক-যুবতীর মিলন সে এক মহামিলন কাহিনি। ঈদুল ফিতরের পূর্বে রমজান মাসে দীর্ঘ একমাস রোজা পালন করতে হয়।

এই রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল মহান আল্লাহ তায়ালার ঐশী বাণী আল-কুরআন। এই মাসের লাইলাতুল কদরের রজনিতে পৃথিবীতে প্রথম নাজেল হয়েছিল পবিত্র কুরআন। মুসলমানগণ ঈদুল ফিতরে সেমাই, সিরনি, পায়েস ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে ঈদগাহ্ মাঠে নামাজ পড়তে যায়। ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করার পর সাধ্য অনুযায়ী মুসলমানগণ গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, উট, মহিষ ইত্যাদি কুরবানি দিয়ে থাকে। ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা এই দু'টি ঈদের নামাজ শেষে ছোট-বড় সবাই বুকে বুকে কোলাকুলি করে ভ্রাতৃত্ব এবং আত্মত্যাগের এক নিদর্শন সৃষ্টি করে।

কিশোরগঞ্জ জেলাবাসীর জন্য ঈদ অন্যরকম এক আনন্দ বয়ে আনে। কেননা দেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় এ জেলায়। কিশোরগঞ্জ শহরের পূর্বপ্রান্তের বিস্তীর্ণ এলাকার নাম শোলাকিয়া। এই শোলাকিয়ার প্রধান আকর্ষণ সারা বাংলাদেশের বৃহত্তম ঈদগাহ্ মাঠ এবং ঈদের জামাত। এই ঈদগাহে ঈদুল ফিতর এর যে জামাত হয়ে থাকে, তা শুধু বাংলাদেশের নয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জামাত। জানা যায়, এখানে এককালে সোয়া লাখ মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় থেকে এই ঈদগাহের নামকরণ করা হয়েছিল 'সোয়ালাখিয়া' থেকে শোলাকিয়া। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উপলক্ষে শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠের পাশে এক বিরাট লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ঈদে এ অঞ্চলে ঘরে ঘরে তৈরি হয় হাতে তৈরি সেমাই, চাউলের রুটি ও পিঠা এবং মিষ্টি কুমড়ার মোরব্বা। নতুন জামা-কাপড় পড়ে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ানো হলো শিশু কিশোরদের ঈদের আনন্দ। বড়দের কাছ থেকে সালামি নেওয়া প্রথা চালু রয়েছে কিশোরগঞ্জে। ঈদ আসলে এককালে কাসা-পিতলের বাসন ছিল এরপরে আসে চীনা মাটির বাসন-কোসনের ব্যবহার। ঈদ উৎসব শেষ হলে আবার পরের ঈদের জন্য তুলে রাখা হয়। এভাবেই এক ঈদ উৎসব থেকে আরেক ঈদ উৎসব পর্যন্ত চলে আনন্দের অপেক্ষা।

দুর্গা উৎসব

বাঙালি হিন্দু সমাজে যতগুলো পূজা পার্বণ আছে তার মধ্যে দুর্গাপূজা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। দুর্গাপূজা শরৎকালে হয়ে থাকে এজন্য এ পূজাকে শারদীয় পূজা বলা হয়ে থাকে। সাধারণত আর্শ্বিন মাসেই এ পূজা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় কার্তিক মাসেও এ পূজা হয়। বসন্ত ঋতুতে যে দুর্গাপূজা হয় তাকে বাসন্তী পূজা বলে। শরৎকালের কার্তিক মাসে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের গ্রামাঞ্চলে এ পূজা উৎসব খুব আনন্দের সাথে উপভোগ্য হয়। শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নয় হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের লোক এ পূজা উৎসবে অংশগ্রহণ করে পূজার আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

কিশোরগঞ্জের সকল উপজেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামাঞ্চলের পূজামণ্ডপে দুর্গাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাদেবীর মূর্তির সামনে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মূর্তি সাজানো হয়। দেবী সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আর্শ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এ পূজা শুরু হয়ে দশমীতে শেষ হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এ তিনদিনের পূজাই প্রধান। ষষ্ঠী তিথিতে দুর্গাদেবীর বোধন ও দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জন দেওয়া হয়। এ কয়দিন পূজা বাড়িতে নানাবিধ ফলমূলসহ মিষ্টি সন্দেশ ইত্যাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ তিনদিন সমাজের সকল স্তরের মানুষ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পূজা বাড়িতে সমাগম হয়। আড়ম্বর করে খিচুরি খাওয়ানো হয়। সাধারণত ধনী শ্রেণির হিন্দুরা এই পূজা তারা একাই করে থাকেন। বর্তমান যুগে সমাজের সকল শ্রেণির হিন্দু সদস্যগণ সম্মিলিত চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে দুর্গাপূজা করে থাকেন। আজকাল

ধনী-দরিদ্র সকলে মিলে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন আখড়া মন্দিরে সার্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন করেন এবং সকলে পূজায় অংশগ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করেন। পূজায় পাঠা বলী দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। প্রবাসী আত্মীয়-স্বজন দেশ-বিদেশ থেকে ছুটি নিয়ে দুর্গাপূজায় বাড়িতে এসে দেবীর আরাধনার সাথে আনন্দ উপভোগ করেন। এ উৎসবে হিন্দু সমাজে ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা সকলেই সাধ্য অনুযায়ী নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে আনন্দ উল্লসিত হয়ে ওঠে। দশমীর দিন দুর্গাদেবীর জন্য সকলেই কান্নাকাটি আর প্রার্থনা করে বিসর্জনের পর কোলাকুলি করে। যারা ছোট তারা বয়সে বড় পূজনীয়দের নিকট থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে এই আশীর্বাদকে বিজয়ার আশীর্বাদ বলে। দুর্গাপূজায় ঢাঁক-ঢোলের বাদ্য বাজনায় এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে।

দুর্গাপূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির বিভিন্ন মালসি গানসহ রামায়ণ গানেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোর ছাড়াও সকল শ্রেণির সদস্যদের মাঝে আনন্দের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। তিনদিন ব্যাপী ব্যাপক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শঙ্খধ্বনি ছাড়াও ঘণ্টাধ্বনি ও উলুধ্বনি পরিবেশকে আরও গুরুগম্ভীর করে তোলে।

অষ্টগ্রামের চৌদ্দমাদল উৎসব

হাওর অঞ্চলের অষ্টগ্রাম উপজেলার বাঙালপাড়ায় প্রতিবছর মাঘ মাসে উদযাপিত হয় সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দমাদল উৎসব ও বর্ণাঢ্য গ্রামীণ মেলা। মেঘনার তীরে অবস্থিত বাঙ্গালপাড়া গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সুবৃহৎ এই উৎসব ৭০ বছর ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে। যে কারণে দিনে দিনে চৌদ্দমাদল উৎসব হাওরের সর্বস্তরের মানুষের প্রধান বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। চৌদ্দমাদল হচ্ছে ১৪টি মৃদুল বা খোল নামক বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলন। উৎসবে আসা কীর্তনীয়া দলসমূহ ১৪টি খোল ও জোড়া কর্তাল বাজিয়ে একসঙ্গে কীর্তন পরিবেশন করে।

জানা যায়, বাঙ্গালপাড়ার চারজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে চৌদ্দমাদল উৎসবে অংশ নেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ১৩৭৭ সালের ৪ঠা মাঘ বাঙ্গালপাড়ায় চৌদ্দমাদল উৎসবের গোড়াপত্তন করেন। মাঘের প্রথম দিন উদ্বোধনের পর টানা তিনদিন চলে পাঠ ও অধিবাস কীর্তন। দু'দিন শ্রীমতভগবত গীতা পাঠের পর অনুষ্ঠিত হয় অধিবাস কীর্তন। ৪ঠা মাঘ উদযাপিত হয় উৎসবের মূল অনুষ্ঠান। এ দিন সকাল থেকে রাত অবধি পূজা, ভোগ, নগর কীর্তন, হরিলুট ও আরতী অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজার হাজার লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বাঙ্গালপাড়ার ৪টি স্থায়ী সম্প্রদায় প্রায় প্রতিবছর নগর কীর্তনে অংশ নেয়। এগুলো হচ্ছে নাথ হাটির গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়, ওসমানপুরের অদ্বৈত সম্প্রদায়, মনোহরপুরের শ্রীনিবাস সম্প্রদায় ও হরিদাস সম্প্রদায়। ১৪টি খোল ও ১৪ জোড়ার কর্তাল সমেত চারটি কীর্তনীয় দলের লীলা কীর্তন

পরিবেশনের সময় ধর্মপ্রাণ ভক্তদের আকুল করা কান্নায় চৌদ্দমাদল উৎসবে ভিন্নরূপ ধারণ করে। ৫ই মাঘ দিন রাত এই কীর্তনে হাজার হাজার ভক্ত অংশ নেন। ৬ই মাঘ অগণিত মানুষের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৭ই মাঘ চৌদ্দমাদল উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। স্থানীয় চারটি দল ছাড়াও অন্যান্য স্থান থেকেও কীর্তনীয় দল উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে। অন্যদিকে উৎসব প্রাঙ্গণ জুড়ে বসে বর্ণাঢ্য গ্রামীণ মেলা। ১০ই মাঘ পর্যন্ত এ মেলা অব্যাহত থাকে।[৩২]

চৌদ্দমাদল উৎসব উপলক্ষে অষ্টগ্রাম উপজেলায় হয়ে থাকে এ অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম মেলা। মেলায় প্রচুর বিক্রি হতে দেখা যায় কাঠের যাবতীয় ফার্নিচার, মাটির হাড়ি-পাতিল, খেলনা, মিষ্টান্ন দ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অসংখ্য রকমের দ্রব্যাদি যেমন- প্রাচীন নকশি পালঙ্ক, খাট, সোফা, ড্রেসিং টেবিল, শোকেস, কৃষি উপকরণ- লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, মিষ্টান্নদ্রব্য, কদমা, তিলা, বাতাসা, বিন্নি ও ভ্যাটের খই, শিশুদের বিভিন্ন রকম খেলনা যেমন- মাটির পুতুল, ক্ষুদে গিন্নিদের ইলি-মুচি, বাঁশের বাঁশি, কাঠের ঘোড়া, কাগজের কুমির, রং বেরঙের বেলুন, গ্রামের কিশোরীদের সস্তা প্রসাধনী লাল-নীল ফিতা, পুঁথির মালা, কাচের চুড়ি ইত্যাদি সহস্র আইটেম। চৌদ্দমাদল উৎসব ও মেলা উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার হাওরের ১০/১২টি থানায় সাজ রব পড়ে যায়। শ্বশুড়বাড়ি থেকে মেয়েরা বাপের বাড়ি 'নাইয়র' আসে। ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক তৈরি হয়। বাড়ি বাড়ি পিঠা-পুলি তৈরি হয়। একসময় এই মেলায় সার্কাস, পুতুল নাচ, যাত্রা পালার দল এগুলো প্রদর্শন করত, বসত নাগরদোলা।

গোপীনাথের রথযাত্রা

শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ। কিশোরঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় ভোগবেতাল গ্রামে অবস্থিত ঈসা খাঁ ও রাজা নবরঙ্গের ঐতিহাসিক হিন্দুধর্মীয় তীর্থস্থান শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দির জেলার অন্যতম প্রত্নসম্পদ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামন্ত রাজা নবরঙ্গ রায় এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কোটামন দিঘি ও বাউলসাগর নামের নদী তীর থেকে কৃষ্ণবর্ণের দু'টি নিম কাঠের খণ্ড দিয়ে গোপীনাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে মন্দিরে স্থাপন করেন। এর সংস্কার করেন ঈসা খাঁ। এই জায়গাটির নাম ভোগবেতাল। এখানে প্রতিবছর রথযাত্রা, বার্ষিক উৎসব, দোলপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, ঝুলনযাত্রা, বাসন্তীপূজাসহ নিত্য পূজাপার্বণ হয়ে আসছে। গোপীনাথ মন্দিরে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান রথযাত্রা।

১৫৮৫ সালে সামন্ত রাজা নবরঙ্গ রায় এই মন্দিরে প্রথম শুরু করেন এই রথযাত্রা। প্রাচীন বাংলার সর্ববৃহৎ রথযাত্রা ছিল গোপীনাথের রথযাত্রা। এককালে রথযাত্রা উপলক্ষে স্থায়ীত্ব ছিল ১৫ দিনব্যাপী মেলার। ভাটি এলাকা ও হাওরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসত নৌকা ও বজরার বহর। জড়ো হতো বাউলসাগর

নদীতে। এককালে ১০৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ৩২ চাকার রথ স্থানীয় জমিদারদের পোষা হাতি দিয়ে গোপীনাথ মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল সড়কপথ দিয়ে ভক্তরা রথ টেনে নিয়ে যায় গুণ্ডিচাবাড়িতে (শ্বশুরবাড়ি)। আবার আট দিন পর ফিরে আসে নিজ বাড়িতে। রথ ছিল তিনটি- একটি পিতলের, অন্য দু'টি কাঠের তৈরি। আজও বাংলাদেশের মধ্যে এটিই দূরপাল্লার রথযাত্রা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ২৫ একর ৮ শতাংশ জমি রয়েছে। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে রথটি ঝড়ে পতিত হলে এর সংস্কার করা হয়। ৩২ চাকার রথটি কালক্রমে ২৪ ও ১৬ চাকা হয়ে বর্তমানে ৯ চাকায় এসে ঠেকেছে। বর্তমানেও রথটি অতীত কারুকার্যের কিছু স্মৃতি বহন করছে। আজ পর্যন্ত প্রতিবছরই রথযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির পাখির হাট বসে। রথযাত্রা উপলক্ষে পাঁচ গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। তারা তাঁদের মেয়ে-জামাইসহ কুটুম্বদের দাওয়াত করে থাকেন। এটা এই এলাকার একটি পার্বণ। রথযাত্রা উপলক্ষে হিন্দুদের মধ্যে দু'টি সংস্কার প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস এদিন কলা গাছ রোপণ করলে তাতে বেশি কলা ধরে এবং দিনের পূর্বভাগে মেঘ ডাকলে অগ্রিম বর্ষা আর পরভাগে ডাকলে বর্ষার আগমন বিলম্বিত হয়।[৩৩]

নবান্ন উৎসব

অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল ওঠার পর নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে এ উৎসবের প্রচলন রয়েছে। এদিন নতুন চাল ঢেঁকিতে কুটা হয়। নতুন চালের তৈরি পিঠার গন্ধে মম মম করে সারা বাড়ি। গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে তখন পিঠা কুটার শব্দ শুনা যায়। আর আয়োজন চলে সারারাত ব্যাপী পিঠা তৈরির। নানা রকম পিঠা তৈরি করে তা প্রথমে দেয়া হয় ভূত-পেতকে উদ্দেশ্য করে। যাতে সারারাত ব্যাপী পিঠা তৈরিতে কোন ব্যাঘাত না আসে বা কারো কু-নজর না পড়ে। তাছাড়া এ সময় গ্রামাঞ্চলে নেড়া পোড়ানো হয়। অর্থ্যাৎ নতুন ধানের চালের তৈরি এক ধরনের পিঠা খড়ের মধ্যে দিয়ে পোড়ানোর মাধ্যমে শুরু হয় নবান্নের প্রস্তুতি।

এ সময় মেয়েরা বাপের বাড়িতে আসে বেড়াতে। গ্রামের ঘরগুলো মুখরিত হয়ে উঠে লোকাগমনে। তাছাড়া নবান্নকে কেন্দ্র করে অনেক জায়গায় বসে মেলা। বর্তমানে যা পিঠা উৎসবে রুপান্তরিত হয়েছে। শুধু গ্রামেই নয় এখন শহরাঞ্চলেও বেশ ঘটা করে পালন করা হয়ে থাকে নবান্নের উৎসব।

বেরাভাসান বা ভেলাভাসান উৎসব

বেরাভাসান বা ভেলাভাসান উৎসবটি নদ-নদী ও হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে জলের সবরকম অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত হয়। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খোয়াজ-খিজিরের (জলের দেবতা বরুণের

স্থলাভিষিক্ত) উদ্দেশ্যে উৎসবটি নিবেদিত হয়। কিশোরগঞ্জের লোক-জীবনে এর প্রভাব এত গভীর যে, স্থানীয় ক্রিয়াচার এবং লৌকিক সংস্কারকে ভর করে এটা এখনও এ অঞ্চলে টিকে আছে। এ উৎসবে এক নিঃশ্বাসে কলা গাছ কেটে ভেলা বানানো হয় এবং তাতে নানা রকমের সিরনি সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীতে বা পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। হাওর প্রধান এলাকা হিসেবে কিশোরগঞ্জের মানুষের লৌকিক জীবনাচরণের একটি অন্যতম লৌকিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

৩.১১ লোকমেলা

বিভিন্ন উৎসব বা পূজা-পার্বণে মেলা এ দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের উৎসব আয়োজনের এক অন্যতম অনুসংগ। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম নয়। এ জেলার নানা স্থানে লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলায় খেলাধুলা, নাচগান, অভিনয় এবং বিভিন্ন পণ্য কেনাবেচা হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি বিখ্যাত লোকমেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

চিলপূজা বা বৈশাখী মেলা

পহেলা বৈশাখ বা তার কাছাকাছি সময়ে আয়োজিত বৈশাখী মেলা বাংলাদেশের অন্যতম লোকজ মেলা। তবে বর্তমানে আয়োজিত বৈশাখী মেলা এ নামে প্রচলিত ছিলনা। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে চিলপূজাই ছিল এতদঅঞ্চলের বৈশাখী মেলা। যুগের পরিবর্তনে শুধু নামেরই পরিবর্তন হয় না সেই সাথে সমাজ জীবন ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানেরও পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তনের হাওয়ায় হারিয়ে গেছে বহুযুগ যুগান্তরের পরিচিত নাম 'চিলপূজা'। এখন চিলপূজার পরিবর্তে সকলের কাছে পরিচিত বৈশাখী মেলা। কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানার গাগলাইল, পাকুন্দিয়া থানার চিলাকাড়া ও পূড়াবাড়িয়া গ্রামে তখনকার বৈশাখী মেলার নাম ছিল 'চিলপূজা'। আগে চিলপূজাই ছিল সারা বছরের কেনাকাটা ও আনন্দ উৎসবের একটি মাধ্যম। প্রত্যন্ত গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ সারাটি বছর ধরে উন্মুখ প্রতীক্ষায় দিন গুনত সে দিনটির জন্য।

এ মেলায় বাঁশ, কাঠ, বেতের জিনিসপত্র, মাটির হাড়ি-পাতিল, বাঘ-ভাল্লুক, হাতিঘোড়া, গাছ-গাছালী, গেরস্থালীর সরঞ্জাম বিক্রি হতো। চিলপূজার উঠতি বয়সের কিশোরদের আকর্ষণ ছিল ঘুড়ি। মেয়েদের জন্য ছিল নানা রকম কানের দুল, নথ, আলতা, ফিতা, আরও অনেক প্রসাধনি। নানা রকম বাঁশিতে বিচিত্র ছন্দ দোলায়িত হয়ে উঠতো গ্রাম গ্রামান্তর। কাগজের ফুল, ভেপু এসবের ছিল ছড়াছড়ি। চরক গাছ, ঘোড়া দৌড়, আতশবাজী, হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, যাদুখেলা ছিল চিলপূজার আকর্ষণ। ছিল নানারকম মিষ্টি মিটাই জিলাপী, সন্দেশ, মুঘলাই, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি।

অষ্টমী স্নান ও মেলা

চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথি বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করা হয়। সাধারণত ১৫ চৈত্র থেকে ১/৩ দিন এ মেলা স্থায়ী হয়। এ উপলক্ষে সবচেয়ে বড় উৎসব হয় হোসেনপুরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে। তাছাড়া পাকুন্দিয়ার মঠখলা, ভৈরব, কটিয়াদী, বাজিতপুর, তাড়াইল, কুলিয়ারচর, অষ্টগ্রাম,

ইটনা, নিকলী ও করিমগঞ্জেও উৎসব হয়। ইটনার সুভদ্রাপুরে অষ্টমী স্নান উপলক্ষে বাসন্তী দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনে একদিন স্থায়ী অনুষ্ঠিত হয় অষ্টমী স্নান মেলা। মেলায় দেবতার উদ্দেশ্যে পাঠা বলি দেওয়া হয়। এছাড়া মৃৎশিল্পের দ্রব্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয় এবং গরুর দৌড় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঐ দিন ধনু নদীতে হিন্দুধর্মের লোকেরা স্নান করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় বিভিন্ন খেলনা, পুতুল, মাটি, চিনামাটি ও কাসার বাসনপত্র, কাঠের আসবাবপত্র ও মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

হোসেনপুরের অষ্টমী মেলা

হোসেনপুরের উল্লেখযোগ্য মেলা এই অষ্টমী মেলা। হিন্দু সম্প্রদায়ের অষ্টমী উপলক্ষে একদিন ব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ মেলার বৈশিষ্ট্য হলো দূর-দূরান্ত থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এসে আদি ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করেন। সূর্য উঠার আগেই হাজারো মানুষের ভিড় করে এখানে। কে আগে স্নান করবে এ নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। স্নান করার সময় ভেলায় ভাসানো হয় পাঁঠা, কবুতর এবং অন্যান্য প্রাণী। ভাসানো প্রাণী গুলোকে যে আগে ধরতে পারবে সে হবে ঐটির মালিক। যে বেশি ধরতে পারে সে নিজেকে পুণ্যার্থী হিসেবে বিবেচনা করে। নর-নারী সর্বস্তরের পুণ্যার্থী স্নানে অংশ নেয়। স্নান শেষে হোসেনপুরের সদর বাজারে আঠারবাড়ী কাচারি, কুলেশ্বর বাড়ি মন্দির, উপজেলা পরিষদ চত্বর, বাজারের বিভিন্ন খালি জায়গায়, রাস্তার পাশে বসে বিভিন্ন খেলনা, পুতুল, মাটি, চিনামাটি ও কাসার বাসনপত্র, কাঠের আসবাবপত্র ও মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। অষ্টমী মেলা উপলক্ষে এ এলাকায় আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসে। জামাইকে দেওয়া হয় অষ্টমী 'পার্বণ'। মেলা উপলক্ষে যাত্রা, পালাগান, সার্কাস দেখানো হয়। চড়ক গাছে উঠে ছেলেমেয়েরা দিনভর আনন্দে মেতে উঠে। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমে যাওয়ায় এখন আর আগের মতো মেলা জমে উঠে না।[৩৪]

নিকলীর রথমেলা

নিকলী উপজেলা সদরে রথযাত্রা উপলক্ষে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। নিকলী উপজেলা সদরে এ রথযাত্রা উৎসব মেলা প্রাচীনকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কাঠ দ্বারা নির্মিত বড় ধরনের একটি রথ রয়েছে নিকলীতে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর শ্রী কৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের স্মরণে এই উৎসব পালন হয়ে থাকে।

এখানে কাঠের তৈরি জগন্নাথের মূর্তি রয়েছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠান শুরু করে শুক্লা একাদশীর দিন পুণ্যযাত্রা বা উল্টো রথযাত্রা অনুষ্ঠান নিকলীতে খুবই জাঁকজমকভাবে হয়ে থাকে। রথযাত্রা উপ লক্ষে এ মেলায় পাওয়া যায় কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, চীনা মাটির বাসন-কোসন, মাটির হাড়ি-পাতিল, বিভিন্ন ধরনের খেলনাসহ অন্যান্য জিনিসপত্র ও মুড়ি-মুড়কিসহ বিভিন্ন মিষ্টান্ন।

পোড়াবাড়ীয় মেলা

কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ও জমজমাট মেলার নাম পোড়াবাড়ীয়া মেলা। পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের পোড়াবাড়ীয়া নামক স্থানে এ মেলার আয়োজন করা হয় বলে এ মেলাটি 'পোড়াবাড়ীয় মেলা' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হয়ে তিনদিন এ মেলা চলে। জানা যায় এ এলাকার পাল বংশের লোকজন পূজা উপলক্ষে এ মেলার আয়োজন শুরু করেন। বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে এ মেলা উদযাপিত হয়। গ্রামের পুরনো বটবৃক্ষের নিচে বসে যেত হরেক রকমের সামগ্রীর মেলা। অতীতে মেলা উপলক্ষে ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, সার্কাস, কবিগান, যাত্রাপালা, ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হতো। এ মেলায় প্রচুর কাঠের সামগ্রী পাওয়া যায়।

কুড়িখাই মেলা

কটিয়াদীর কুড়িগাই মেলা এ অঞ্চলের বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ মেলা হিসেবে পরিচিত। কুড়িখাইয়ের মেলা প্রায় চারশ বছরের পুরনো। প্রতিবছর মাঘ মাসের শেষ মঙ্গলবার বসে ১০দিন ব্যাপী এই মেলা। বাংলাদেশে এত পুরনো মেলা রয়েছে কিনা সন্দেহ। হযরত শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার বার্ষিক উরস উপলক্ষে এ মেলার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে দেশ-দেশান্তর থেকে হাজার হাজার মানুষ উরস ও মেলায় অংশ নেয়। এ সময় কুড়িখাই গ্রামসহ আশপাশের প্রায় কুড়ি মাইল এলাকার গ্রাম-গ্রামান্তর হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। ঐ সময় কর্মরত লোকজন ফিরে আসে গ্রামের বাড়ি। দূর-দূরান্ত থেকে আসে আত্মীয়স্বজন। দূর অঞ্চলে বিয়ে হওয়া এলাকার মেয়েরা বাবার বাড়িতে মেলা উপলক্ষে 'নাইয়র' আসে। শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার মাজার শরীফকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় একর এলাকা জুড়ে বসে বহু দোকান। মৃৎশিল্প থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, খেলনা, তৈজসপত্র, বিলাসসামগ্রী, হেন জিনিস নেই- যা কুড়িখাইয়ের মেলায় মেলে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেলা শুরুর সপ্তাহকাল আগে থেকেই ব্যবসায়ীরা দোকান বরাদ্দ নিয়ে পণ্যসহ মেলায় আসতে শুরু করে। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, সিলেট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও আজমীর শরীফ থেকে শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার ভক্ত এবং আশেকানগণ উরস ও মেলায় অংশ নিতে আসেন। জানা যায়, বুখারা থেকে আগত কামেল শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়া মুঘল আমলে এই এলাকায় এসে তার আস্তানা গাড়েন এবং সুফিবাদ প্রচার করেন। সম্রাট আকবরের সময় এই আস্তানার আশপাশ এলাকা 'লাখেরাজ' ঘোষণা করা হয়। জনশ্রুতি হচ্ছে, তদানীন্তন সময়ে শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার ভক্ত বুখারার এক সুলতান 'কুড়ি খাঁ' এ অঞ্চলে আসেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর নাম কুড়ি খাঁ থেকে কুড়িখাই নামের উৎপত্তি। হিজরী ১০০৩ সালে শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার ইন্তেকালের পূর্বাহ্নে তার তিন সাগরেদ শাহ কবীর, শাহ নসীর ও শাহ কলন্দর খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং ফার্সি ভাষায় শাহ শামছুদ্দীন তাদেরকে স্বহস্তে অসিয়তনামা লিখে দিয়ে যান। লিপিটি এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। এর বাংলা অনুবাদ থেকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়।[৩৫] শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার অসিয়ত প্রাপ্ত সাগরেদ শাহ কবীর, শাহ নসীর ও শাহ কলন্দরের অধঃস্তন বংশধরগণই পর্যায়ক্রমে আজ পর্যন্ত মাজার শরিফের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হয়ে আসছেন এবং মূলগতভাবে উরস ও মেলা পরিচালনা করছেন। এই আউলিয়ার মাজার, উরস মোবারক ও মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কিংবদন্তি এবং সংস্কার প্রচলিত রয়েছে।

ঝুলন মেলা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভাধীন বত্রিশ থেকে শুরু করে প্রামাণিক বাড়ির দক্ষিণাংশের আমলীতলা পর্যন্ত এলাকাটি মেলাবাজার বা ঝুলন বাজার নামে খ্যাত। প্রামাণিক পরিবারের কীর্তি "একুশ রত্ন" ও তাদের আরাধ্য দেব-দেবীর বিগ্রহ স্থাপনকালে নন্দকিশোর প্রামাণিক পক্ষকাল ব্যাপী আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসব উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জমিদারদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কথিত আছে, জমিদারদের আগমন উপলক্ষে শহরের বড় বাজার মাছ মহাল সংলগ্ন নরসুন্দা নদী থেকে সূতি নদী পর্যন্ত একটি খাল কাটা হয়। সে থেকে এ খালটি কাটাখাল হিসেবে পরিচিত। এ উৎসবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ নর-নারীর সমাগম হয়েছিল। নর-নারীর এ বিপুল সমাগম "একুশ রত্ন" ও প্রামাণিক পরিবার দোল ও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বছর এলাকাটিতে বিরাট দু'টি মেলার আয়োজন করতেন। পরবর্তীকালে এ দু'টি মেলাই শ্রাবণের দোলপূর্ণিমা থেকে কার্তিকের রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত একটি স্থায়ী মেলায় রূপ নেয়। সমগ্র জেলায় কিংবা সমগ্র বাংলাদেশে তখন এত দীর্ঘ ৪ মাস ব্যাপী একাধারে কোন মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস বিরল। সেকালে এ মেলাটি ক্রমান্বয়ে দেশি-বিদেশি পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, এই এলাকা ছাড়িয়েও সিলেট, কলকাতা, মোম্বাই, দিল্লীর ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব এলাকার পণ্যসামগ্রী নিয়ে এ মেলায় উপস্থিত হতেন এবং ফেরার পথে স্থানীয় পণ্য সামগ্রী ও রপ্তানী পণ্য হিসেবে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন। নরসুন্দা নদীতে ও কাটাখালের উভয় তীরে শতসহস্র নৌকা সারিবদ্ধভাবে ভিড়ানো থাকত। এই সমাবেশ এতই জমজমাট ছিল যে, এক নৌকা থেকে আর এক নৌকার মাঝে কোন জায়গা থাকত না। মেলাটি এই এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী একটি বিরাট অঞ্চলে লোকশিল্প ও কারুপণ্যের প্রধান বিপণন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে প্রামাণিক বাড়ির জৌলুষ কমে গেলে এই মেলার জমজমাট অবস্থাও কমে আসে। তথাপি মেলাটি অতীত গৌরবের ধারা রক্ষা করে এখনো নিয়মিত বসে থাকে। প্রতি বছর বাংলা ১৪ শ্রাবণ শুরু হয়ে ৭ দিন মেলাটি স্থায়ী হয়। মেলায় মাটি, কাঠ, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী ছাড়াও প্রসাধনি সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

চরপলাশ মেলা

রইছ উদ্দিন ফকিরের বার্ষিক ওরস উপলক্ষে এ মেলার আয়োজন করা হয় পাকুন্দিয়া উপজেলার চরপলাশ এলাকায়। প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষ শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে তিন থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী এ মেলা চলে। এ মেলার ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। জানা যায়, প্রায় ৭০/৮০ বছর পূর্বে এ এলাকায় রইছ উদ্দিন ফকির নামে এক কামেল ব্যক্তি ছিলেন। তার বাড়ির সামনে রয়েছে একটি পুকুর। কথিত আছে, রইছ ফকিরের ফুঁক দেওয়া এই পুকুরের পানি পান করলে যে কোন রোগ বালাই ভাল হয়ে যেত। এভাবে তার কথা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন এলাকায়। রইছ উদ্দিন ফকিরের মৃত্যুর পর তার শিষ্য সাগরেদরা এখানে মাজার তৈরি করে প্রতি বছর ওরসের আয়োজন করে। ওরস উপলক্ষে এখানে বসে বিরাট মেলা। মেলায় কাঠের তৈরি জিনিসপত্র, খেলনা, মাটি ও বাঁশ বেতের সামগ্রী প্রভৃতি বেচা-কেনা হয়। অনেকেই মানত করতেও তার দরগায় আসেন।

বারুণী পূজা মেলা

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে করিমগঞ্জ, তাড়াইল, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, নিকলী, ইটনা, মিঠামইন, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, সরারচর, বাজিতপুর, ভৈরব ও অষ্টগ্রামে চৈত্রের তিথি উপলক্ষে প্রতি বছর ১৫ই চৈত্র থেকে চারদিন ব্যাপী এ মেলা চলে। এ মেলা সম্পর্কে অনেক আচার অনুষ্ঠান ও কল্প-কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুদের বহু দেবতার মধ্যে মেঘের দেবতা হলো বরুণ। এই বরুণ থেকেই বারুণী কথাটি এসেছে। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে যখন সর্বত্র হাহাকার করে তখন বরুণ দেবতার পূজা করা হয়। কথিত আছে, কোন এক রাজ্যের রাজার দুই রানি ছিল। বড় রানি ছিল নিঃসন্তান। ছোট রানি সন্তান সম্ভবা হলে বড় রানি কুমন্ত্রণা আটতে থাকে। আতুর ঘরে ছোট রানি সন্তান প্রসব করলে বড় রানি সন্তানের মাথায় এক ধরনের ঔষধ ছিটিয়ে দিলে সন্তানটি ব্যাঙে পরিণত হয়। এ অবস্থায় রাজা অগ্নিরূপ ধারন করে ছোট রানিকে বনবাস দেন। ছোট রানি কাঁদতে কাঁদতে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে আরেক রাজ্যে এসে উপস্থিত হন। এ রাজ্যে তখন অনাবৃষ্টিতে চারদিকে চলছিল হাহাকার। ফসলের মাঠ পুরে ছাই। রাজ্য জুড়ে নেমে এল দুর্ভিক্ষ। এ অবস্থায় রাজা ঘোষণা দিলেন, যে মেঘ নামাতে পারবে তার কাছে রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে দেবেন। অনেকেই বৃথাই চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এমন সময় ব্যাঙ এসে রাজ দরবারে ঘোষণা দিল যে বৃষ্টি নামিয়ে দেবে। রাজা সভাসদের সামনে ঘোষণা দিলেন যে, বৃষ্টি নামাতে পারলে রাজা তার কন্যাকে বিয়ে দেবেন। বৃষ্টির আরাধনা করে ব্যাঙ অবশেষে বৃষ্টি নামিয়ে দিল। রাজ্য জুড়ে এল অনাবিল সুখ আনন্দ। শর্ত অনুযায়ী রাজা ব্যাঙের কাছেই কন্যাকে বিয়ে দিলেন। এদিকে ব্যাঙের কাছে বিয়ে হওয়ায় রাজ কন্যার চোখে নেমে এল অঝোর ধারার পানি। বাসর ঘরে রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে যেই না চোখের পানি ব্যাঙের মাথায় পড়ল, তখন ব্যাঙ রূপ নিল এক সুদর্শন রাজকুমারে। রাজকন্যার আনন্দ আর ধরেনা। রাজা পরদিন ব্যাঙ রাজার জন্য উৎসবের আয়োজন করলেন। এ উৎসবে ব্যাঙ রাজার পিতাও এলেন। পরিচয় পর্বে সকলের মিলন হলো। ব্যাঙ রাজার পিতার ছোট রানিকে সসম্মানে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং বড় রানিকে শাস্তি দিলেন। এ কল্প-কাহিনির মত এখনো গ্রামে গঞ্জে ব্যাঙের বিয়ের প্রচলন চলে আসছে। গ্রামের মেয়েরা এ সময়ে ব্যাঙের গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আর মেঘ প্রার্থনা করে-

"ব্যাঙাজির বে
সোনার মুকুট দে
কি-রে ব্যাঙা
মেঘ দেস না কে"।

আবার-

"আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লা মেঘ দে"।

চৈত্রের এ সময়টিতে গ্রাম-গঞ্জে অনেক মেলা বসে। এসব মেলায় মাটি, বাঁশ, বেত ও কাঠের আসবাবপত্র, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

অষ্টগ্রামের মহররম মেলা

কিশোরগঞ্জের হাওর বেষ্টিত উপজেলা অষ্টগ্রামে বহুকাল ধরে মহররম উপলক্ষে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর ১লা থেকে ১২ই মহররম পর্যন্ত অষ্টগ্রাম ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপকভাবে এ অনুষ্ঠান ও শোক পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটি যদিও শিয়াদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথাপি অনুষ্ঠানের সাথে যারা জড়িত তারা সবাই সুন্নী মুসলমান। তাছাড়া স্থানীয় হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নর-নারীও এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অষ্টগ্রামের এই অনুষ্ঠানটি তাই দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত মহররম থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। অষ্টগ্রামের দেওয়ান বাড়ি যা আঞ্চলিক উচ্চারণে 'হাবেলী বাড়ি' নামে খ্যাত তাকে কেন্দ্র করেই মহরত অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়।

জানা যায়, জমিদার বাড়ির শেষ জমিদার চান বিবির কোন পুত্র সন্তান না থাকায় নকোষা জমিদারির উত্তরাধিকারী একমাত্র কন্যা জিন্নত চানবিবিকে তৎকালীন সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার সুলতানসির বিখ্যাত নাসির উদ্দিন সিপাহশালার বংশের জনৈক সৈয়দজাদার সাথে বিবাহ দিয়ে জামাতাকে অষ্টগ্রাম নিয়ে আসেন। এই জিন্নত চানবিবির গর্ভে সৈয়দ আব্দুল করিম (আলাই মিয়া), সৈয়দ আব্দুল রহিম (মলাই মিয়া) ও সৈয়দ আব্দুল আজিম (জলাই মিয়া) এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ আব্দুল করিম ওরফে আলাই মিয়ার সময়েই (১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ) অষ্টগ্রামের নকোষা জমিদারিটি বাকি খাজনার দায়ে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। এ সময়েই জমিদারি বাজেয়াপ্ত হওয়া ও অন্যান্য কারণে আলাই মিয়া সংসার বিবাগী হয়ে ঐশ্বরিক ধ্যানে মগ্ন হন এবং সাধক পুরুষ হিসেবে কিছুদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সাধক পুরুষ আলাই মিয়া অষ্টগ্রামে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে মহররম পালনের সূচনা করেন এবং জমিদার বাড়ির আঙ্গিনায় একটি 'ইমামবাড়ি' তৈরি করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই ইমামবাড়ির পাশেই সর্বদা অবস্থান করতেন এবং সাধনায় মগ্ন থাকতেন। মৃত্যুর পর ইমামবাড়ির পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীকালে তার কবরস্থানটির উপর একটি সুদৃশ্য দালান তৈরি করে মাজারে রূপান্তরিত করা হয়। তখন থেকে পুরুষানুক্রমে এ বাড়ির বা বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তানই মাজার দেখাশুনা এবং প্রতিবছর অষ্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সমগ্র মহররম অনুষ্ঠান পরিচালনার উত্তরাধিকারী বা পীর নির্বাচিত হন। চাঁদ দেখার পূর্ব রাত থেকেই ইমামবাড়িটিকে রং বেরঙের কাগজ ও কাপড়ের ছোট বড় অসংখ্য পতাকায় সজ্জিত করা হয়। একই সাথে সজ্জিত করা হয় আলাই মিয়ার সমাধিকেও। চাঁদ দেখার পরদিন থেকে আশুরার পূর্বদিন পর্যন্ত সারা অষ্টগ্রামে চলে জারিগান, সিরনি তৈরি ও বিতরণ, দরগায় 'তাবুত' তৈরি, বাড়ি বাড়ি 'তাজিয়া' তৈরি আর বাদ্য বাজনা সহযোগে মাতম জারি পরিবেশন।[৩৬]

১০ই মহররমই হয়ে থাকে মূল অনুষ্ঠানটি। অষ্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি মহল্লাতেই একটি করে মহররমের স্থায়ী দরগা দেখা যায়। দরগাগুলো সাধারণত উঁচু স্থানে আরও মাটি ভরাট করে অনেকটা বেদীর মতো তৈরি করা

হয়। প্রতিটি পরিবারেই তৈরি করা হয় মহররমের বিশেষ সিরনি। জারিয়াল দলগুলো বড় বড় দা, লাঠি, বল্লম, নেজা, তরবারী, বর্শা, ঢাল ও বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঢাঁক, ঢোল, কাঁসি, সাঁনাই ইত্যাদি বাদ্য বাজনা সহযোগে শোক ও মাতম জারি গাইতে গাইতে মহল্লা প্রদক্ষিণ করে। রাত ৮ টা থেকে মহল্লা প্রধানের নেতৃত্বে এ দলগুলো মিছিল সহকারে রওনা হয়ে যায় হাওলী বাড়ি। প্রতিটি দল ইমামবাড়ি ও মাজারটি একবার প্রদক্ষিণ করে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে জারি শুরু করে এবং সারারাত অনুষ্ঠান চলে। পরদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মহল্লায় মহল্লায় শোক, মাতম ও জারি গান হয়। অষ্টগ্রামের এ মেলায় বা মহররম উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা আসে পণ্য সামগ্রী নিয়ে। মেলায় দা, বাঁশের লাঠি, কুটির শিল্প সামগ্রী, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কাইমার বাউলী মেলা

কিশোরগঞ্জের একটি পুরনো মেলা হিসেবে পরিচিত কাইমার বাউলী মেলা। বাজিতপুর উপজেলার পূর্বাঞ্চলে হাওর এলাকায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলাটি স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভুত। প্রায় চারশ বছর আগে থেকে এ মেলার প্রচলন বলে জানা গেছে। বর্তমানে কালীপূজা উপলক্ষে ১লা পৌষ থেকে ৩দিন ব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় পুতুল নাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ছাড়াও আসবাবপত্র ও খেলনা সামগ্রী বিক্রয় হয়ে থাকে।

জানা যায়, কোন একসময় জেলেরা নদীতে কাটাল (মাছের আশ্রয়স্থল) ভাঙ্গার সময় এখানে মহিষ জবাই করত। মহিষের রক্ত নদীতে ছিটিয়ে দিত। যদি নদীতে কুমির থাকত তবে রক্ত খেতে আসত এবং জেলেরা সাবধান হতো। কুমির না থাকলে জেলেরা সহজেই কাটাল ভেঙ্গে মাছ ধরত। এ মেলা উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক জেলে নর-নারী ও শিশু কিশোর আসত। কথিত আছে, জেলেদের এই সমাবেশ থেকেই কাইমার বাউলী মেলার উৎপত্তি।

গোসাই বাড়ি মেলা

করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রাম বর্তমানে 'গোসাই বাড়ি' নামে পরিচিত। শ্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মোহন গোস্বামী এর নামে সি.এস রেকর্ড হিসেবে দেখা যায় যে, আগর শংকর দেবালয় নামে এক হিন্দু ধর্মালম্বী গোসাই এসে এখানে আস্তানা করে এবং একটি মন্দির ও কীর্তন ঘর বর্তমানে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে বিরাজ করে। দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ৫.৪৭ একর জায়গা খাজনা বিহীন ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এর অস্তিত্ব মাত্র ০.৩০ একর ভূমি গোসাই বাড়ি আখড়া হিসেবে দখল আছে এবং বর্তমান সেবায়ত শ্রী অখিল চন্দ্র গোসাই।[৩৭]

জানা যায়, রামনগর গ্রামে নরসিংহ ও হরিদাস চক্রবর্তী নামে দুইজন জমিদার ছিলেন। তাদের পূর্ব পুরুষগণ গোসাই বাড়ি আখড়া হিসেবে জমি দানসহ আখড়াটি স্থাপন করলেও নরসিংহ ও হরিদাস চক্রবর্তী

জমিদারগণের আমলেই মেলাটি পরিচিতি পায় বেশি। প্রায় ১৫০ বছর যাবৎ মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় বলে আনুমানিক ধারনা। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে শুরু করে ৭ দিন যাবৎ মেলাটি বর্তমানেও অনুষ্ঠিত হয়। রামনগর গোসাইবাড়ি মেলাটি একসময় করিমগঞ্জ থানার ইতিহাস ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহনকারী ঐতিহ্যবাহী মেলা।

ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইয়ের আখড়া ও চান্দখালি মেলা

প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গোসাই নামে এক হিন্দু সাধু চান্দখালি গ্রামে বসবাস করতেন এবং মন্দিরটি তৈরি করেন বলে জানা যায়। তার ঐশ্বরিকক্ষমতা বলে তিনি আখড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নরসুন্দা নদীকে আরও খরস্রোতা করে আখড়া সংলগ্ন নদীর পাশে স্ত্রীর অষ্টমী স্নান করার উপযোগী করে তুলেন বলে জনশ্রুতি আছে। চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টমী স্নান হিন্দু রীতিনীতির কারণে অষ্টমী স্নান অনুষ্ঠিত মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রচুর লোক সমাগম করতে গিয়ে এই চান্দখালি মেলার শুরু বা সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইর মৃত্যুর পরও চান্দখালি মেলাটি প্রতিবছর যথাসময়ে এ দিনই অনুষ্ঠিত হতো। ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইর মৃত্যুর পর দীর্ঘ ১২২ বছর যাবৎ মূল আখড়ায় মেলাটি অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে স্থানীয় কিছু লোকের সহায়তায় মেলাটি বাণিজ্যিক স্বার্থে ১৯৮২ সালে মূল স্থান থেকে স্থানান্তরিত করে ন্যামতপুর বাজার সংলগ্ন ন্যামতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বুধবার হাটবার থাকায় দেখা যায় যে, মেলার নির্ধারিত তারিখ চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে বুধবার হলে তারিখ পিছিয়ে পরের দিন মেলার আয়োজন অনুষ্টিত হয়। মেলার সামগ্রী হিসেবে মাটির তৈরি বিভিন্ন ধরনের খেলনা, কাঠের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র, সকল প্রকার মেলার সামগ্রীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মেলায় পাওয়া যায়। খাবার জাতীয় জিনিসের মধ্যে সবচাইতে বেশি বিক্রয় করা হয় লাল ও সাদা জিলাপী, বিন্নি খই, লাল ও সাদা চিনির খেলনা মিষ্টি।

কিশোরগঞ্জের অন্যান্য লোকমেলা গুলো হলো- কিশোরগঞ্জ শহরস্থ শোলাকিয়া পণ্ডিতবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বেড়াভাসান উৎসব উপলক্ষে মেলা, ভাগলপুর দেওয়ান বাড়ির মেলা (ফাল্গুনের প্রথম মঙ্গলবার থেকে এ মেলা ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়), ভাগলপুর ইমাম বাড়ির মেলা, সরারচর কামালপুর মেলা (অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম মঙ্গলবার হতে ৩দিন অনুষ্ঠিত হয়), সরারচর ভান্ডার মেলা (ইসমাইল ফকিরের ওরস উপলক্ষে ফাল্গুনের প্রথম সোমবার থেকে ৩দিন ব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), আলীয়াবাদ শীতলা পূজার মেলা, দিঘির পাড়ের মেলা (কালীপূজা উপলক্ষে এ মেলা বাজিতপুর উপজেলার দিঘিরপাড় এলাকায় বিলিপাড়ায় ফাল্গুন মাসের অমাবস্যার দিন অনুষ্ঠিত হয়), হিলচিয়া মেলা (বাজিতপুর উপজেলার হিলচিয়া ভশনাথের মেলা মাঘ মাসের

শেষ শুক্রবার এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে), সরারচর মেলা (বারনী পূজা উপলক্ষে বাজিতপুর উপজেলায় সরারচরে অনুষ্ঠিত হয়), ভোগবেতাল মেলা (অষ্টঘরিয়ায় মাঘ মাসের প্রথম মঙ্গলবার থেকে ৭দিন ব্যাপী এ মেলা কটিয়াদী ভোগবেতাল গোপীনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়), চারিপাড়া মেলা (কটিয়াদী উপজেলার চারিপাড়া নামক গ্রামে চৈত্র মাসের ১ম মঙ্গলবার দিন থেকে ২দিন ব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), দাসেরগাঁও মেলা (চৈত্র মাসের ১৭ তারিখ থেকে ২দিন ব্যাপী শীতলী পূজা উপলক্ষে এ মেলা কটিয়াদীর দাসেরগাঁও অনুষ্ঠিত হয়), হালুয়া পাড়ার মেলা, মণ্ডলভোগ মেলা, মসুয়া মেলা (কটিয়াদীর মসুয়া নামক স্থানে এ মেলা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়), হোসেনপুর অষ্টমী মেলা, কোদালিয়ার মেলা (পাকুন্দিয়া উপজেলার কোদালিয়া নামক এলাকায় এ মেলা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়), হর্ষি মেলা, নিকলীর নৌকা বাইচ মেলা, সাইটধার মেলা, নিকলী অষ্টমী মেলা, নিকলী শীতলী মেলা, নিকলী দরগাহ বাড়ির মেলা, নিকলী উপজেলার মজলিশপুর ফকির ভিটার মেলা, নিকলীর গুরুই মেলা, চন্দ্রনাথ গোসাইর আখড়ার মেলা, জারুইতলার মেলা (নিকলী উপজেলার জারুইতলা ইউনিয়ন সদরে শীতলী পূজা উপলক্ষে চৈত্র মাসে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), নিকলী উপজেলার সিংপুরের মেলা, কুলিয়ারচর মেলা (পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়), সালুয়ার মেলা (কুলিয়ারচর উপজেলার সালুয়া নামক গ্রামের পাশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়), চরকামালপুর মেলা, ভৈরব মেলা (ভৈরব উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত বৈশাখী মেলা), কালিকাপ্রাসাদ মেলা, অষ্টগ্রাম উপজেলার বাঙ্গালপাড়া মেলা, অষ্টগ্রাম মহররম মেলা, অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তল মেলা, মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়ার মেলা, মিঠামইন উপজেলার দিল্লীর আখড়ার মেলা, বৌলাই মেলা (কিশোরগঞ্জ উপজেলার বৌলাই ইউনিয়নে পৌষ মাসে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), গাগলাইল মেলা (কিশোরগঞ্জ উপজেলার দানাপাটুলী ইউনিয়নের গাগলাইল নামক স্থানে চৈত্র মাসের শেষ দিনে বারনী পূজা নামে মেলা অনুষ্ঠিত হয়), করিমগঞ্জ মেলা, জঙ্গলবাড়ী মেলা, গোজাদিয়া মেলা (করিমগঞ্জ উপজেলার গোজাদিয়া ইউনিয়নে রয়েছে বিখ্যাত নাগরনাথ গোসাইর আখড়াকে কেন্দ্র করে এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়), নেয়ামতপুর মেলা, চিলাকারার মেলা (পাকুন্দিয়া উপজেলার চিলাকারা নামক এলাকায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), মনিপুর ঘাট মেলা, বৌলাই পীরসাহেব বাড়ির মেলা, আশুতিয়া মির্জাপুরী ফকিরের মেলা, মাঝিরকোণা মেলা (করিমগঞ্জ উপজেলার মাঝিরকোণা নামক গ্রামে চৈত্র মাসের ৩ তারিখ থেকে ৩দিন ব্যাপী এক ওরস উপলক্ষে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), চৌদ্দশত মেলা, দামপাড়া মেলা (নিকলী উপজেলার দামপাড়া নামক গ্রামে পীরে কামেল হযরত গুন জালাল ইয়ামেনী সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে অগ্রহায়ন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ওরস উপলক্ষে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), জাওয়ার মেলা (তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার নামক গ্রামে সুফি সাধক সৈয়দ আবদুল্লাহ সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষে এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়), শাহ গরীবউল্লাহর মেলা (এগারসিন্দুর গ্রামে পিরে কামেল শাহগরীবুল্লা'র মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়), জইনউদ্দিন শাহ'র মেলা (ইটনা উপজেলা সদর গ্রামে পীরে কামেল হযরত

জইনুউদ্দিন শাহ'র মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়), শোলাকিয়ার মেলা, বনগ্রাম মেলা (কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম নামক এলাকায় শ্রী শ্রী শিব শীতলা মন্দির প্রাঙ্গনে ১৭ চৈত্র পূজা উপলক্ষে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়), চান্দুপুর চুনের মেলা (কটিয়াদী উপজেলার চান্দুপুর এলাকার প্রখ্যাত অলি হযরত মিয়া চান্দ শাহ এর মাজারকে স্থানীয় লোকজন চুনের মাজার বলে। এই চুনের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়), কটিয়াদী ঢাকের মেলা, পাকুন্দিয়া উপজেলার হোসেন্দী মেলা, পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা মেলা, মলং শাহের মেলা (পাকুন্দিয়া উপজেলার পাকুন্দিয়া ইউনিয়ন সদরে প্রখ্যাত পীরে কামেল ঐতিহাসিক মলং শাহের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়), সরারচর মাদার দরগাহর মেলা, দিলালপুর মোয়াজ্জেম শাহর মেলা, হোসেনপুর নারায়ণ ডহর বাজার মেলা ইত্যাদি।

৩.১২ সমাজ সংস্কারক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬)

বাঙালি রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবক আনন্দমোহন বসু কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানায় জয়সিদ্ধি গ্রামে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ জজ আদালতের পেশকার পদ্মলোচন বসু ছিলেন তার পিতা। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বোন স্বর্ণপ্রভা বসু তাঁর স্ত্রী। আনন্দমোহন বসু সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তার প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় ময়মনসিংহেই। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে মেধা তালিকায় ৯ম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এফএ এবং বিএ পরীক্ষা দেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। উভয় পরীক্ষায়ই শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ইংল্যান্ড যান। সেখানে ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে উচ্চতর গণিত বিষয়ে পড়াশোনা করেন। অনার্সসহ ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি লাভ করে প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩৮] ১৮৭৪ সাল থেকে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। আনন্দমোহন বসু ১৮৮৪, ১৮৯০ এবং ১৮৯৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। ময়মনসিংহ শহরে ময়মনসিংহ ইনস্টিটিউশন নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৮৩), যা বর্তমানে আনন্দমোহন কলেজ নামে পরিচিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় কলকাতায় সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৯)। এটি এখন আনন্দমোহন কলেজ (কলকাতা)। কলকাতায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (১৮৭৬)।

হেমেন্দ্র মোহন বসু (জন্ম-১৮৬৬)

হেমেন্দ্র মোহন বসু ১৮৬৬ খ্রি. ইটনার জয়সিদ্ধি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম বাংলায় এককালে কলের গানের কোম্পানির মালিক ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। ভারতীয় উপমাহাদেশে তিনিই প্রথম অবিভক্ত বাংলায় কলের গান, মোটরগাড়ি, বাইসাইকেল, টর্চলাইট ও সুগন্ধি তেলের কারখানা প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু

করেছিলেন। হেমেন্দ্র মোহন বসুই প্রথম তাঁর সুগন্ধি কুন্তলীন ও দেলখোস তেলের বিজ্ঞাপনপ্রচার ও ভারতীয় সুসাহিত্যের উৎসাহ প্রেরণার জন্য ১৮৯৬ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রবর্তন করেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি কলকাতা হ্যারিসন রোডে মোটরগাড়ি ও বাইসাইকেলের ব্যবসা খুলেন। তাঁর প্রথম কেনা মোটরগাড়ির নাম ছিল 'টুসিটার ড্যাকার' (১৯০০ খ্রি.) গাড়ি। এটি তিনি নিজেই ড্রাইভিং করে চালাতেন। সেসময় গাড়িসহ চালক আনতে হতো ইংল্যান্ড থেকে। অথচ তিনি নিজেই সে যুগে ড্রাইভিং শিখে ভারতের মাটিতে 'গ্রেট ইষ্টার্ন' মোটরগাড়ি কোম্পানী স্থাপন করেছিলেন।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্বের বিষয় হলো কলের গানের 'রেকর্ড' তৈরীর কারখানা স্থাপনের ইতিহাস। ১৯০৫ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তাঁর তৈরী কলের গান রেকর্ডে সর্বপ্রথম গান রেকর্ড করা হয় 'বন্দে মাতরম' নামের বিখ্যাত দেশাত্ববোধক গান। এসব দেশাত্ববোধক গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি.এল রায় প্রমূখ কবি সাহিত্যিকগণ।

হেমেন্দ্র মোহন বসুর কলকাতা শহরে একটি প্রেস ছিল। কলকাতা শহরে তিনিই প্রথম ভারতীয় রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণে পথিকৃৎ। খেলাধুলায় তিনি ছিলেন উৎসাহী। কিশোরগঞ্জে অবস্থাকালে তিনি কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামের বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর বোন মৃণালিনী দেবীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে- তিনি তাঁর ছেলে বেলা হেমেন্দ্র মোহন বসু তাঁর ফুফার এইচ. বোস কোম্পানীর কলের গান শুনে আর তাঁর তোলা ছবি 'অটোক্রোম স্লাইড' থেকেই পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রেরণা লাভ করেন। হেমেন্দ্র মোহন বসুর পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে পুত্র নীতিন বোস ছিলেন ভারতীয় খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক, কার্তিক বোস ছিলেন ভারতের অন্যতম ক্রিকেটার, কন্যাদের মধ্যে মালতী ঘোষাল ছিলেন ভারতের অন্যতম সঙ্গীত শিল্পী।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৯-১৯৭০)

বাংলার মহারাজ নামে খ্যাত বিপ্লবী নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার কাপাসাটিয়া গ্রামে ঠাকুর পরিবারে ১৮৮৯ সালের ২১ মে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষে ১৯০৩ সালে তাঁকে মালদাহ জেলার সানসাটের পুখুরিয়া মাইনর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। ওই স্কুলে পড়াশোনাকালে তিনি অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহ জিলা হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৬ সালে তাঁকে ভর্তি করানো হয় নরসিংদীর সাটিরপাড়া হাই স্কুলে। মূলতঃ এই স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি বিপ্লবী হবার পথে পা বাড়ান। তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন। বিপ্লবী দলে যুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে দলের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যান। তখন তিনি বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশের কাছ থেকে

স্বদেশি মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯০৮ সালে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার ২ মাস আগে। এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের দায়ের করা একের পর এক মামলায় তাঁকে কারাভোগ করতে হয় দফায় দফায়। কখনোহত্যা মামলা, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, রাজাবাজার বোমা হামলা এভাবে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর কারাগারেই কাটে।[৩৯]

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী চিনিশপুর (নরসিংদী) কালীবাড়িতে গিয়ে বটগাছের নিচে বসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা করতেন। নির্জন কালীবাড়িতে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও কুস্তিখেলার আয়োজন করতেন। বিপ্লবীরা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেশমাতৃকার সদস্য হওয়ার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার দীক্ষা নিতেন। চিনিশপুর কালীবাড়ি ও বটগাছটি এখনো টিকে আছে।

১৯৪৭ এর দেশ ভাগের পর তিনি মাতৃভূমি বাংলাদেশকেই বেছে নেন বসবাসের জন্য এবং হিন্দুরা যেন দেশত্যাগ না করে সে বিষয়ে জেলায় জেলায় গিয়ে প্রচারনা চালান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁর এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভালো চোখে দেখেনি। সন্দেহ থেকে তাঁর চিঠিপত্র পর্যন্ত জব্দ করে। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্ত ফ্রন্টের হয়ে নির্বাচন করে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হোন। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'জেলে ত্রিশ বছর' বই বের হয় কলকাতা থেকে। বইটি পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করে সে সময়ই 'বিপদজনক বই' হিসাবে তালিকাভুক্ত করে রাখে। পরে ১৯৮১ সালে বইটি আবার প্রকাশিত হয়। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় দেশপ্রেমিক এই মানুষটিকে পাকিস্তান সরকার দুই বছরের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখে। জেল থেকে বের হয়ে খুব ভেঙ্গে পরেন। চলে যান গ্রামের বাড়ি কুলিয়ারচরে। সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাঁপানীর সমস্যা প্রকট হয় এবং হৃদরোগ ধরা পড়ে। এক পর্যায়ে ১৯৭০ সালে তাকে চিকিৎসার জন্য ভারত নিয়ে যাবার অনুমতি দেয় পাকিস্তান সরকার। সেখানে ভারত সরকারের আতিথেয়তা তাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি মাতৃভূমিতে। সে বছরই ৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন এই চিরবিপ্লবী। মৃত্যুর তিন দিন আগে (০৬ আগস্ট, ১৯৭০) ভারতের পার্লামেন্টে তিনি বাংলায় ভাষণ দেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ধর্ম নিরপেক্ষ পাকিস্তানের। ভারত সরকার তার সম্মানে কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণ করে।

আব্দুল মোনায়েম খান (১৮৯৯-১৯৭১)

বাজিতপুর থানাধীন হুমাইপুর গ্রামে সাবেক পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ খ্রি.। তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯১৬ খ্রি. এন্ট্রাস পাশ, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৮ তে আইএ এবং ১৯২০ এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯২০ খ্রি. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র থেকে এবং ১৯২৪ সালে

পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি লাভ করেন। আব্দুল মোনয়েম খান ১৯২৭-এ ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন। ১৯৩৫ এ ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ১৯৪৭-এ পুনরায় জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬০-৬২ তে ময়মনসিংহ বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৬২ খ্রি. পাকিস্তান জাতীয় সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬২ এর ২৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আয়ূব খান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ১৯৬৯ এর ২৩ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গভর্নর থাকা কালে ৬ দফা সহ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। আজীবন তিনি দ্বিজাতিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। ৭১-এর ১৩ অক্টোবরে তার বনানীস্থ বাসভবনে মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের গুলিতে মারাত্মক আহত হন এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

রেবতী মোহন বর্মণ (১৯০৩-১৯৫২)

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী রেবতী মোহন বর্মণ। তিনি *"সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ"* বইয়ের লেখক হিসেবে বেশি পরিচিত। যে বইটি ১৯৫২ সাল থেকে এ উপমহাদেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও কর্মীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশকীয় বই। ১৯০৩ সালে রেবতী বর্মণ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার শিমূলকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরনাথ বর্মণ ছিলেন একজন নামকরা আইনজীবী। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের জন্য তিনি রায় উপাধি পান।
ঢাকার পগোজ স্কুল এবং কুমিল্লার গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন তিনি। ১৯২২ সালে কিশোরগঞ্জের আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ বছর প্রমোদরঞ্জন চক্রবর্তী এবং গৌরচন্দ্র মণ্ডলও তাঁর সংগে একই নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে কৃতিত্বের সাথে এমএ পাশ করেন। তার আগে বিএ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পেয়েছিলেন জগত্তারিণী পদক এবং পদক বিক্রির অর্থ দিয়ে সহপাঠীদের নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন কিশোরদের মাসিক পত্রিকা *'বেণু'*।

সম্পন্ন ও ব্রিটিশ শাসকদরদী পরিবারের সন্তান হলেও রেবতী বর্মণ সাম্যবাদী ও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্রাবস্থায়। ১৯৩০-৩৮ সালে বিনা বিচারে জেলে অন্তরীন থাকেন। দেউলী জেলে বন্দী থাকাকালীন সময় তাঁর শরীরে কুষ্ঠরোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি সমাজ

বিবর্তণমূলক অসংখ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন যা পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর চব্বিশপরগণা জেলার বেলঘরিয়ায় থাকাকালীন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। এসময়ই তার শরীরে কুষ্ঠ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পুলিশ তাঁর উপর হুলিয়া জারি করলে তিনি বাংলাদেশের ভৈরব উপজেলায় চলে যান। দেশভাগের পরে ১৯৫১ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তাকে বাধ্য হয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে আগরতলা চলে যেতে হয়। ১৯৫২ সালের ৬ মে তারিখে মৃত্যুবরণ করেন রেবতী বর্মণ। তিনি মোট ২৮টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৪০] তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে-

১. *সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি* (১৯৩৮)
২. *মার্কস প্রবেশিকা* (১৯৩৮)
৩. *কৃষক ও জমিদার* (১৯৩৮)
৪. *সাম্রাজ্যবাদের সংকট* (১৯৩৮)
৫. *হেগেল ও মার্কস* (১৯৩৮)
৬. *ক্যাপিটাল* (মার্কসের ক্যাপিটালের বাংলায় লেখা সংক্ষিপ্তসার-১৯৩৮)
৭. *লেনিন ও বলশেভিক পার্টি* (১৯৩৯)
৮. *Society and Its Development* (১৯৩৯)
৯. *Marxist View of Capital* (১৯৩৯)
১০. *সমাজের বিকাশ* (১৯৩৯)
১১. *সোভিয়েট ইউনিয়ন* (১৯৪৪)
১২. *শান্তিকামী সোভিয়েট* (১৯৪৫)
১৩. *অর্থনীতির গোড়ার কথা* (১৯৪৫)
১৪. *পরিবার-ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* (অনুবাদ)
১৫. *সমাজতন্ত্রবাদ-বৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক* (অনুবাদ)
১৬. *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ* (১৯৫২) ইত্যাদি।

শ্রী মনোরঞ্জন ধর (১৯০৪-২০০০)

শ্রী মনোরঞ্জন ধর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সালে। ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কয়েক বছর কারাভোগ করতে হয়েছিল। কমিউনিস্ট রাজনীতির পাশাপাশি আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৭-এর পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। একসময় বাংলাদেশে আওয়ামী

রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তিনি অর্থমন্ত্রী এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তিনি অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিক হিসেবে 'গণ অভিযান' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাছাড়া বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি ।

এ কে শরফুদ্দীন আহমেদ (১৯০৮-২০০৩)

এ কে শরফুদ্দীন আহমেদ ডাক্তার বাদশা মিয়া হিসেবে পরিচিত। ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে চারিয়াকোনা গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি পাকুন্দিয়ার মঙ্গলবাড়িয়া গ্রামে। তিনি ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করে ময়মনসিংহ শহরে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। পরে ১৯৩১ সালে এলএমএফ পাস করেন। প্রথম জীবনে ম্যালেরিয়া বিভাগে কিছুদিন চাকরি করার পর কলকাতায় গিয়ে ক্রিসেন্ট ফার্মেসি খুলে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। পরে কিশোরগঞ্জ শহরে এসে এবং পুনরায় ক্রিসেন্ট ফার্মেসি খুলে চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় তাকে কারাভোগ করতে হয়। ২০০৩ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন।

ভুপেশ গুপ্ত (১৯১৪-১৯৮৯)

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা সাংবাদিক ও সুলেখক ভুপেশ গুপ্ত কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মহেশ চন্দ্র গুপ্ত। ভুপেশ গুপ্ত কলিকাতার স্কটিস চার্চ কলেজে পড়ার সময়েই দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ এর মধ্যে মোট চারবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ এর গ্রেপ্তার পর ৩৭ পর্যন্ত তাকে জেলে কাটাতে হয়। ভারতের বহরমপুর বন্দি শিবিরে থাকার সময়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। ভুপেশ গুপ্ত শুধু রাজনিতিবিদ ও আইনজিবি ছিলেন না, তিনি সুলেখক ও কৃতি সাংবাদিক হিসাবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরতৎকালীন মুখপাত্র "*দৈনিক স্বাধীনতার*" তিনি ছিলেন একজন সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি। বিশ বছরের অধিক কাল তিনি সিপিআই এর মুখপত্র "*New age*" এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজী ও বাংলায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-[৪১]

- *ফ্রিডম অ্যান্ড দা সেকেন্ড ফ্রন্ট*
- *টেরর ওভার বেঙ্গল*
- *সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান: এ ক্রিটিক*
- *বিগ লু*, প্রভৃতি।

উল্লখ্য যে, ভুপেশ গুপ্তের বাবা মহেশচন্দ্র জমিদার ছিলেন। ইটনা মহেশ চন্দ্র হাই স্কুল তার বাবার অবদান। কিশোরগঞ্জের এই স্বনামধন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চিরকুমার ভুপেশ গুপ্ত ৭০ বছর বয়সে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৬ অগাস্ট মস্কোতে মৃত্যুবরণ করেন। ইটনা ও খরমপট্টির (বর্তমানে পরিত্যাক্ত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়) দু'টি পুরান বাড়ি আজও ভুপেশ গুপ্তের কথা কিশোরগঞ্জবাসীর মনে দাগ কাটে। বাংলাদেশের ও ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ইংলান্ডে গিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও আইন বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি নেন। পরে মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হন। দেশে ফিরে পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনে পুরোপুরি নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৪৮-৪৯ এ বেশ কয়েকবার আত্মগোপনে ছিলেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। কারাগার থেকে সে বছরই তিনি রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই থেকে এক টানা ঊনত্রিশ বছর তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের রাজসভার সম্মানিত সদস্য ছিলেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬)

আধুনিক শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃত দেশের সুনামধন্য ও অন্যতম শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯১৪ সালে বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম তমিজউদ্দিন আহমেদ এবং মা জয়নাবুন্নেছা। বাবা ছিলেন পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর। তিনি ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠপুত্র। ছেলেবেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। আর তাইতো মাত্র ষোল বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে বন্ধুদের সাথে সেই দূরের শহর কলকাতায় গিয়েছিলেন কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস দেখার জন্য। সেখান থেকে ঘুরে আসার পর তাই ১৯৩৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই স্কুলের সাধারণ পড়ালেখার পাট চুকিয়ে কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস-এ ভর্তি হন। তাঁর মা-ছেলের এই আগ্রহ দেখে নিজের গলার হার বিক্রি করে ছেলেকে কলকাতার এই আর্ট স্কুলে পড়তে যেতে সাহায্য করেছেন।[৪২] আর ছেলেও মায়ের এই ঋণ শোধ করেছেন দেশের সুনামধন্য শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর শৈল্পিক মানসিকতা নির্মাণে প্রকৃতির প্রভাব ছিল অসামান্য ও সুদূরপ্রসারী।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলাকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের ড্রইং এ্যান্ড পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩৮ সালেই নিখিল ভারত চিত্র প্রদর্শনীতে গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি। এ পুরস্কার ছিল ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে আঁকা তাঁর একগুচ্ছ জলরং ছবির জন্যে। এরপর আরো কিছুকাল পর্যন্ত জয়নুল আবেদিন প্রাকৃতিক পরিবেশেরই এক রোমান্টিক রূপকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তিনি তখন ছিলেন একজন বিশ্বস্ত নিসর্গশিল্পী। কিন্তু ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ জয়নুল আবেদিনকে একেবারে বদলে দেয়। জয়নুল তখন আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক, তাঁর আয় সামান্য। দুর্ভিক্ষের বাজারে উন্নতমানের শিল্পসামগ্রী তখন যেমন ছিল দুর্লভ তেমনি দুর্মূল্য। সে কারণে তিনি বেছে নেন শুধু কালো কালি আর তুলি। শুকনো তুলিতে কালো চীনা কালির টানে স্কেচ করতে থাকেন অতি সাধারণ সস্তা কাগজের ওপর। ব্যবহার করেছেন কার্টিজ পেপার। এসব কাগজ ছিল ঈষৎ পীত বর্ণের। এমনকি তিনি প্যাকেজিং কাগজও ব্যবহার করেছেন।

সাধারণ স্বল্পমূল্যের এসব অঙ্কন সামগ্রী ব্যবহার করে তিনি যে শিল্প সৃষ্টি করলেন তাই পরিণত হলো অমূল্য সম্পদে। এমন এক অসাধারণ শক্তিশালী অঙ্কন শৈলীর মাধ্যমে তিনি দুর্ভিক্ষের করুণ বাস্তব দৃশ্যাবলি চিত্রায়িত করলেন, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত উপমহাদেশের চিত্র ঐতিহ্যে ছিল না। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলো দেখার পর 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' শ্রীমতি সরোজিনি নাইডু মন্তব্য করেছিলেন- "সব চাইতে মর্মস্পর্শী ও আবেগময় বর্ণনার চাইতেও তাঁর এসব ছবির আবেদন অধিকতর"। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে সে বছরই কলকাতায় যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তাতে জয়নুল তাঁর দুর্ভিক্ষ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে শেষ বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পান। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলো, তারপর জয়নুল পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে তাঁর চাকরিটি ছেড়ে ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত নর্মাল স্কুলে আর্ট শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু তখন থেকেই তিনি এদেশে শিল্প আন্দোলন শুরুর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪৮ সালে ঢাকাতে প্রদেশের প্রথম আর্ট স্কুল, গভর্নমেন্ট ইন্সটিটিউট অব আর্টস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন তিনি। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস' নামে এদেশের প্রথম আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র দু'কামরার সেই ইনস্টিটিউটটিকে ১৯৫৬ সালের মধ্যেই তিনি এক অতি চমৎকার আধুনিক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেন। পরবর্তীকালে এটি পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

১৯৫১-৫২ তে জয়নুল আবেদিন সরকারি বৃত্তি নিয়ে এক বছরের জন্যে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন চারুকলা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে তাঁর নিজের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীও করেন। তাঁর কাজ ইংল্যান্ডের বিদগ্ধজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর এই ইংল্যান্ড ভ্রমণটি শুধুমাত্র যে তাঁকে পাশ্চাত্য জগতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তাই নয়, এতে করে তাঁর দৃষ্টি আরো প্রসারিত হয় এবং সম্ভবত এর

মাধ্যমেই বাংলাদেশের চারুকলা চর্চা শুরু থেকেই এক প্রাণবন্ত আধুনিকতার চরিত্র গ্রহণ করতে পেরেছিল। আবেদিনের এই ইউরোপ ভ্রমণ তাঁকে বাংলার সমৃদ্ধ লোকশিল্পের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কেও বিশেষভাবে সচেতন করে তোলে। ১৯৫২ সালে বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি এদেশের স্থানীয় শিল্প-ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্প-আন্দোলন ও কৌশলাদির সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন।

১৯৫১ সালে এবং এর অব্যবহিত পরে আঁকা তাঁর ছবিতে একটি অসাধারণ আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আঙ্গিকের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায়, জয়নুল গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ প্রাত্যহিক অথচ অত্যন্ত প্রতীকী গুরুত্বসম্পন্ন দৃশ্যাবলি এঁকেছেন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার সেই তুলির বলিষ্ঠতা ও সাবলীলতা আবার প্রাণ পেয়েছে এ সময়ের কাজে। অধিকাংশ কাজ জলরং বা সোয়াশে করা। ব্যবহৃত জলরংঙের বৈশিষ্ট্য হালকা এবং অনুজ্জ্বল, তুলির টান এবং কম্পোজিশন বা স্পেস ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচ্যধর্মী অন্যদিকে বিষয় উপস্থাপনা ও ড্রইং পাশ্চাত্য-বাস্তবধর্মী এভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে তাঁর শিল্পকর্মে। তাঁর 'ঝড়' শীর্ষক ছবিটি এক অসাধারণ কাজ। একইভাবে আরেকটি সুন্দর জলরং ছবি 'মই দেয়া'। তবে এই সিরিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্ভবত মাঝারি সাইজের একটি জলরং, যার শিরোনাম 'বিদ্রোহী'। এর পরপরই ৫২-৫৩ তে জয়নুল গড়ে তোলেন এক চমৎকার নতুন ঢং, যাকে 'আধুনিক বাঙালি ঢং' বলা চলে। গ্রামীণ কর্মী পুরুষের জীবনও ধরা পড়েছে এই সময়কার কাজে। একটি গোটা সিরিজ গড়ে উঠেছে এসব ছবি নিয়ে। এগুলোর মধ্যে কিছু স্মরণীয় কাজ হলো 'নৌকোর গুণটানা', 'পল্লী-রমণী', 'আয়না নিয়ে বধূ', 'একাকী বনে', 'পাইন্যার মা', 'মা ও শিশু', 'তিন পল্লী রমণী', 'মুখ চতুষ্টয়' ইত্যাদি।

১৯৭২ সালে তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অন্যতম উপদেষ্টা মনোনীত হন। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াস্থ 'কংগ্রেস ফর ওয়ার্ল্ড ইউনিটি'র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। জয়নুল আবেদিন ছিলেন মুক্তিকামী মানুষ। স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেন তাঁদের সবার সাথেই একাত্মতা জানাতে উৎসাহী ছিলেন তিনি।

১৯৭০ সালে আরব লীগের আমন্ত্রণে ছুটে যান মধ্যপ্রাচ্যের সমরক্ষেত্রে। আল-ফাতাহ গেরিলাদের সাথে চলে যান যুদ্ধফ্রন্টে। সেখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি আঁকেন, তাঁর সেসব ছবির প্রদর্শনী হয় একাধিক আরব দেশে। মুক্তিযোদ্ধারা তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ জয়নুলের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিজয় অর্জনের পরপরই তিনি পুর্ণোদ্যমে লেগে যান শিল্পচর্চা সংগঠনের কাজে। এবারে লোকশিল্প তাঁর কাছে প্রাধান্য পেতে থাকে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জয়নুল আবেদিনকে দায়িত্ব দেন বাংলাদেশের সংবিধানটির অঙ্গসজ্জার জন্যে। তিনি প্রবল উৎসাহের সাথে কাজটি সমাধা করেন।

জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপিত হয়। তাঁর ইচ্ছে ছিল এই জাদুঘরে সংরক্ষিত হবে দেশের মূল্যবান লোকশিল্প, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখান থেকেই নতুন প্রেরণা পাবে। জয়নুল তাঁর নিজের ছবি সংগ্রহের জন্য একটি সংগ্রহশালা নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং এই সংগ্রহশালাটির জন্য স্থান নির্বাচন করেন ময়মনসিংহে তাঁর অতি প্রিয় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের একটি পুরাতন ভবনে। ১৯৭৫ সালে ময়মনসিংহে জয়নুল আবেদিন এই সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা এবং তাঁর মহৎ মানবিক গুণাবলির জন্যে তিনি দেশে ও বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, সরকার এবং জনগণের কাছ থেকে পেয়েছেন সম্মান। বাংলাদেশে চারুকলার উন্নয়নে জয়নুল আবেদিন তাঁর অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি পেয়েছেন 'শিল্পাচার্য' সম্বোধনে। দীর্ঘ ছ'মাস ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগে ১৯৭৬ সালের ২৮ মে তিনি মাত্র ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি আঁকার কাজ অব্যহত রাখেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে হাসপাতালে শুয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ঢঙে শেষ ছবিটি আঁকেন- 'দুটো মুখ'।

তাহেরুদ্দীন মল্লিক (১৯১৮-২০০৪)

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানাধীন শিমুলবাক গ্রামে ১৩ জৈষ্ঠ্য ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তাহেরুদ্দীন মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ মাওলা বখশ মল্লিক। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ এর সেনাপতি গৌরাই মল্লিকের সংশ্লিষ্টতায় অধস্তন পুরুষ ছিলেন মল্লিকের পুর্ব পুরুষ। গ্রামের মক্তবে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৩৩ সালে তাহেরুদ্দীন মল্লিক মাইনর পাস করেন। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে সেখানে শিক্ষকতা করে তার কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী কলকাতায় চলে যান। কলকাতা থেকে ফিরে ১৯৪২ সালে ময়মনসিংহ শহরে পুস্তক ব্যবসা শুরু করেন। পরে নিজ এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ড এর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ময়মনসিংহ শহরে প্রেস স্থাপন করে "*ভোরের সানাই*" পত্রিকা বের করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে "*মাসিক মমেনশাহী*" প্রকাশ করেন। পঁচিশ বছর ময়মনসিংহেমুদ্রণ ব্যবসায়ও তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি। ইত্তেফাক গ্রুপের প্রকাশনা "*সাপ্তাহিক রোববার*" পত্রিকায় তিনি দু'বছর কাজ করেন। এ সময়ে রেডিও বাংলাদেশের কথিকা পাঠেও অংশ নেন। সারাজীবন একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মী হিসাবে তার জীবন চলার বাঁকে সফল না হলেও সাহিত্যকর্মে তার সফলতা উল্লেখযোগ্য। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহ শহরে বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ "শুক্রবাসরীয়" সাহিত্য সংসদকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য বলয় সৃষ্টি হয় তা থেকেই অনেকে এ লাইনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনি এই সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। একসময় বৌলাই জমিদার বাড়ীতে যে শায়েরে মুশয়ারা হতো সেখানে কবি খাল্লেদ বাংগালীর সাথেও তিনি শায়েরে মুশয়ারায় অংশগ্রহণ করেন। তার প্রকাশিত আরও সাহিত্যকর্মের মধ্যে '*সমাবেশ*' (কাব্য),'*জানার মত*' (কাব্য) '*হয়বত নগরের কথা*' ও '*চেনা মানুষের জারী*' উল্লেখযোগ্য।

কিশোরগঞ্জের মাটির পরতে পরতে রয়েছে তাহেরুদ্দীন মল্লিক সাহেবের অবাধ বিচরণ। সময় পেলেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতেন তিনি। সাহিত্য এর খনি আহরন করতে এভাবেই কিশোরগঞ্জকে তিনি আত্মস্থ করেছেন তার মননে, মেধায় এবং লেখায়। সাহিত্যক্ষেত্রে এ নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তাকে সাহিত্য পদকে ভূষিত করেন। তিনি ৪ নভেম্বর ২০০৪ ময়মমনসিংহে নিজ বাসভবনে পরলোকগমণ করেন।

গঙ্গেশ সরকার (জন্ম-১৯১৮)

গঙ্গেশ সরকার ১৯১৮ সালে তাড়াইল থানার দামিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের লড়াকু সংগঠক ও 'যুগান্তর' দলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্পর্শে কিশোর বয়সেই গঙ্গেশ সরকার গোপন রাজনীতির বার্তাবাহক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পাকিস্তানবিরোধী 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়/লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়' আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

১৯৫২ ভাষা আন্দোলনেও ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। ১৯৫৬ সালে আবার গ্রেফতার হন। ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পর্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে তিনি এ দলে যোগ দেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আবার তাকে গ্রেফতার করা হন। ১৯৬৭ সালে ওয়ালী খান ও মোজাফফর আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত ন্যাপের সাথে একাত্ম হন। গঙ্গেশ সরকার ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৫ সালে নিজ এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সুদীর্ঘ সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, জ্যোতি বসু, মণি সিংহ প্রমুখ নেতার সাহচর্যে এসেছেন।

জমিয়ত আলী (১৯১৯-১৯৮৩)

জমিয়ত আলীর জন্ম ১৯১৯ সালের ৮ জানুয়ারি। তার পিতা আকবর বেপারী। জীবনের প্রায় নয় বছর তার কেটেছে জেলখানায়। ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ৪০ দিনব্যাপী অনশনরত রাজবন্দিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রায় দু'বছর পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে এলাকার জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জমিয়ত আলী ১৯৫৪-এর নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির মনোনয়নে প্রাদেশিক পরিষদে করিমগঞ্জ-তাড়াইল নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারি হলে জমিয়ত আলী গ্রেফতার হন। আবুল হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হলে অন্যান্য নিরাপত্তা বন্দির সাথে তিনিও মুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) যোগদান করেন। ১৯৭০-৭৩ ও ১৯৭৯-এর নির্বাচনে করিমগঞ্জ-তাড়াইল নির্বাচনী এলাকায় তিনি ন্যাপের প্রার্থী ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগঠক জমিয়ত আলী যুদ্ধের সময় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা জেলার অন্তর্গত ডালু অঞ্চলের ন্যাপ-কমিউনিস্ট-ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত ট্রানজিট ক্যাম্পে একজন রাজনৈতিক প্রশিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস দায়িত্ব পালন করেন। তিনি করিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমা পাবলিক লাইরেরির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আমির উদ্দিন আহম্মদ (জন্ম-১৯২৪)

আমির উদ্দিন আহম্মদ ১৯২৪ সালে নিকলী উপজেলার নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজী মমিন উদ্দিন আহম্মদ। তিনি কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ থেকে আইকম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম পাস করেন। কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের সদস্য এবং নিকলী পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরে বিএনপি'র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৭৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি'র প্রার্থী হিসেবে নিকলী-বাজিতপুর আসনে এমপি নির্বাচিত হন। তিনি বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং জেলা বিএনপি'র আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। নিকলী মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ এলাকার উন্নয়নে তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫)

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রধানতম পুরুষ, যার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাদেশ কে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের স্বাধীন ভূখণ্ড উপহার দেয়। যা বাঙালি জাতিসত্বাকে বিশ্ববাসীর সামনে গর্বিত পুনরুত্থানের সুযোগ করে দেয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সাল থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯২৫ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার জসোদল বীরদামপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার লেখাপড়ার শুরু যশোদল মিডল ইংলিশ স্কুলে। এরপর কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দিন হাই স্কুল আর ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে কাটান তার স্কুল জীবন। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে দুই বিষয়ে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৩ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে বিএ (অনার্স), ১৯৪৭ সালে

এম.এ এবং ১৯৫৩ সালে এল.এল.বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৪৬-৪৭ সালে সলিমুলাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ডাকসু'র ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি সর্বদলীয় একশন কমিটি'র সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরও সরকারি চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ইতিহাসের প্রভাষক হিসেবে আনন্দমোহন কলেজে যোগদান করেন। পরে ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন।[৪৩] তিনি ১৯৫৭ সালে খ্যাতিমান রাজনীতিক, সু-সাহিত্যিক ও পাকিস্তানের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমেদকে কাউন্সিলের মাধ্যমে হারিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এ পদে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ তিনি আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিতে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু হলে আইয়ুব সরকার আওয়ামীলীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির (DAC) অন্যতম কর্ণধার। রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথমে ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং পরে ১০-১৩ মার্চ দু'দফা এ বৈঠক হয়। তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা হিসেবে এ সময় বৈঠকে যোগদান করেন।

১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ আসন থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সংসদে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্টপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটা সরকারের কাঠামো তৈরি করেন এবং ১০ এপ্রিল রেডিওতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকারের তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।[৪৪]

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী মন্ত্রীসভায়ও তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। জাতীয় সংসদে তিনি উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্বও গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর তাঁকে প্রথমে গৃহবন্দী এবং ২৩শে আগস্ট, ১৯৭৫ তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করা হয়। কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

অজয় রায় (জন্ম-১৯২৮)

অজয় রায় কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামে ২১ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম প্রমথনাথ রায় । প্রাথমিক শিক্ষা বনগ্রামেই শেষ করেন। পরে ভারতের বেনারসে ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪৫ সালে আইএ, ১৯৪৮ সালে হরগঙ্গা কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। অজয় রায় ছাত্রাবস্থাতেই বামপন্থি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। মস্কোপন্থি রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত অজয় রায় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। রাজনীতি ছাড়াও তিনি সামাজিক আন্দোলনের সংগঠক ও এ লেখক হিসেবেও পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে '*বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত ও বর্তমান*', '*বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ*', '*রাজনীতি কি এবং কেন*' অন্যতম।

ডা. আবু আহম্মদ ফজলুল করিম (১৯২৮-১৯৮৭)

ডা. আবু আহম্মদ ফজলুল করিম ১৯২৮ সালে কিশোরগঞ্জ সদর থানাধীন চৌদ্দশত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ। তাঁর পিতার নাম ইব্রাহীম ভূঞা এবং মাতার নাম রওশন আরা বিনু। ডা. করিম ছেলেবেলাতেই তাঁর বাবা-মাকে হারান। কোদালিয়া এসআইএইচ স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪৭ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি এবং ১৯৫৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেছেন।

বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির কিশোরগঞ্জের ডেলিগেট এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে দুইবার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৬ সালে ন্যাপে যোগদান করেন। ন্যাপ (ভাসানী)-এর কিশোরগঞ্জ শাখার প্রেসিডেন্ট (১৯৭৬-৭৭), ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ১৯৭৬-৭৮ সালে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির কিশোরগঞ্জ শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে ডা. ফজলুল করিম বিএনপিতে যোগদান করেন এবং কিশোরগঞ্জ সদর থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথমে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। ডা. আবু আহম্মদ ফজলুল করিম ১৯৮৭ সালের ২৯ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

মোঃ জিল্লুর রহমান (১৯২৯-২০১৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান ১৯২৯ সালের ৯ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মেহের আলী মিঞা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী ও তৎকালীন ময়মনসিংহ লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জেলা

বোর্ডের সদস্য। জনাব জিল্লুর রহমান ময়মনসিংহ জেলা শহরে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে ভৈরব কেবি হাই স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ এম.এ ও এল.এল.বি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ১৯৫২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি এক ছাত্র সমাবেশে জনাব জিল্লুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। সেখানেই ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারিতে ফজলুল হক ও ঢাকা হলের পুকুর পাড়ে যে ১১ জন নেতার নেতৃত্বে ২১শে ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেখানে জনাব জিল্লুর রহমান অন্যতম নেতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।[৪৫] ১৯৫৩ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অপরাধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন এবং একই সাথে তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয়। কিন্তু প্রবল আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষপুনরায় তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রী ফিরিয়ে দেয়। তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ষাটের দশকে তিনি ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় সিলেটে গণভোটের কাজ করার সময় তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৬২ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান সহ প্রতিটি গণ-আন্দোলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে থেকে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। তিনি মুজিবনগর সরকার কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা এবং জয় বাংলা পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় তৎকালীন দখলদার পাকিস্তান সরকার তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল করে ২০ বছর কারাদন্ড প্রদান ও সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ গণ-পরিষদ সদস্য হিসেবে সংবিধান প্রণয়নে অংশ নেন। ১৯৭৩ ও ১৯৮৬ সালে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে ২০০১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি তিনি মহান জাতীয় সংসদের উপনেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি আইন জারির পর ওই বছরের ১৬ জুলাই রাতে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গ্রেফতার হলে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দল পরিচালনা করেন। দীর্ঘ ১১ মাস শেখ হাসিনার জেল জীবন এবং চিকিৎসার জন্য আরও প্রায় ৬ মাস দেশের বাইরে অবস্থানকালে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল অবদান রাখেন এবং ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অবিস্মরণীয় বিজয় লাভ করে। এই নির্বাচনে তিনি ৬ষ্ঠ বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নবম জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব জিল্লুর রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে তিনি পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর তাঁর জীবনের একটানা প্রায় চার বছর জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে সংসদ সদস্য থাকাকালে জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান আবারও কারাবরণ করেন। ১৯৯২ এবং ১৯৯৭ সালে দলীয় কাউন্সিলে জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান পর পর দুইবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

পারিবারিক জীবনে জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান এক পুত্র এবং দুই কন্যার জনক। ২০ শে মার্চ ২০১৩ বুধবার, ৮৪ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪ টা ৪৭ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

ডা. এ.এ মাজহারুল হক (জন্ম-১৯৩২)

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে কিশোরগঞ্জের ডা. এ.এ মাজহারুল হক একজন নেপথ্য নায়ক। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ইপিআর-এর মাধ্যমে তার বাসার টেলিফোনে এসে পৌঁছেছিল। তখন তিনি মুক্তিকামী কিশোরগঞ্জবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, নরসিংদীর বেলাব, মনোহরদীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন এবং তাদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে কিশোরগঞ্জের বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আসাদুল্লাহ একদল দুর্ধর্ষ মুক্তিসেনাকে নিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৬ই ডিসেম্বর সমগ্র দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেও কিশোরগঞ্জের স্বাধীনতা-বিরোধীরা শক্ত অবস্থান নিলে তিনি ব্যাপক রক্তপাত ও সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গৌরাঙ্গ বাজারস্থ তার নিজ বাসভবনে

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। আ. আউয়াল খান ও নূরুজ্জামান চান মিয়া (সাবেক পৌর চেয়ারম্যান), আল বদর কমান্ডার কেএম আমীনুল হক, নেজামে ইসলামী নেতা মাওলানা আশরাফ আলী বৌলাইসহ প্রায় ২০০ জনকে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে বিনা রক্তপাতে কিশোরগঞ্জকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেদিন কিশোরগঞ্জ সরকারি স্কুল ছাত্রাবাসে প্রতিষ্ঠিত মিত্র বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে বিপুল মুক্তিযোদ্ধা ও আত্মসমর্পণকারী আটক স্বাধীনতা বিরোধীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন ডা. মাজহারুল হক। কারণ সে সময়ে কিশোরগঞ্জে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতা। কারণ তখনও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান, আ. সাত্তার উকিল, আ. হামিদ তখনও রণাঙ্গন থেকে দেশে এসে পৌঁছাননি। তিনি মুক্তাঞ্চল থেকে প্রথম কিশোরগঞ্জে প্রবেশ করার ফলে সিনিয়র নেতা হিসেবে জাতির ইতিহাসে এবং কিশোরগঞ্জের স্বাধীনতার মহান লগ্নে এই গৌরবময় ঐতিহাসিক দায়িত্বটি পালন করেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার এবং বিজয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে তিনি কিশোরগঞ্জের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছেন। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামী, ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ডা. এ.এ মাজহারুল হকের সারাটা জীবন নিবেদিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে। ১৯৩২ সালে তিনি তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার কুলিয়ারচর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ বিটি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা নওয়াব আলী ছিলেন সমাজসেবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আর চাচা হাসান আলী সে আমলে বিএবিটি ডিগ্রিধারী উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত। ডা. এ.এ মাজহারুল হকের স্কুলজীবন অতিবাহিত হয় পার্শ্ববর্তী বাজিতপুরে এবং ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে। ১৯৪৮ সালে তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, ওবায়দুল্লাহ খান (সেন্টু)। এ সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে তার অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এভাবেই রাজনীতি ও এলাকার মানুষের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেটা সারাজীবন অটুট থাকে।

১৯৫০ সালে তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। পঞ্চাশ দশকের শুরুতেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও গণমুখী রাজনৈতিক সচেতন মানসিক অগ্রসরতাকে সঙ্গী করে ঢাকায় আসেন এবং দেশের একমাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ঢাকা মেডিকেলের আদি পর্বে একজন ছাত্র হিসেবে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে এবং প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। প্রথম শহীদ মিনারের গৌরবময় অল্প ক'জন নির্মাতাদের মধ্যে ডা. এ.এ মাজহারুল হক অন্যতম। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি সংক্ষিপ্ত কারাবাস এবং পাকিস্তানি পুলিশের নির্যাতনও ভোগ করেন। ডা. মাজহারুল হক সরকারি চাকরি

গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে তৎকালীন গ্রাম-বাংলায় আধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে কিশোরগঞ্জ শহরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ শহরে স্থায়ীভাবে পেশাজীবন অতিবাহিতকারী প্রথম এমবিবিএস চিকিৎসক। দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর অধিক সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা পেশায় প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয়তা ও সুনামের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থানীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সামনের কাতারে শামিল আছেন। তিনি কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ। বঙ্গবন্ধু কিশোরগঞ্জে এলে তার বাসাতেই অবস্থান করতেন। জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন তার অন্তরঙ্গ মানুষ। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ শহরে অবসর জীবনযাপন করছেন।

এ কে এম শামসুল হক গোলাপ মিয়া (জন্ম-১৯৩৪)

এ কে এম শামসুল হক গোলাপ মিয়া পাকুন্দিয়া উপজেলার তারাকান্দি গ্রামে ১৯৩৪ সালের ২৯ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে এমএ পাস করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন। তিনি তিনবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দায়ে তার নামে হুলিয়া জারি হয়। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং একজন নির্মোহ রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি সকলের নিকট সমাদৃত। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে ৩ নম্বর সেক্টরে রাজনৈতিক সমন্বয়কারী এবং মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিংয়ের দায়িত্ব পালন করেন। কিশোরগঞ্জ জেলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং জেলা সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

এম নূরুজ্জামান (চান মিয়া) (১৯৩৪-১৯৯২)

এম নুরুজ্জামান (চান মিয়া) ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংসদ সদস্য ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫২ সালে আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। কলেজ জীবনে পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে গুরুদয়াল কলেজের ছাত্র সংসদের জিএস নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে আইনজীবী হিসেবে জীবন শুরু করেন। তিনি জাতীয় পার্টি থেকে কটিয়াদী আসনের ২ বার সংসদ সদস্য ছিলেন। এম নূরুজ্জামান ১৯৯২ সালে পরলোকগমন করেন।

আবু তাহের খান পাঠান (জন্ম-১৯৩৫)

আবু তাহের খান পাঠান হোসেনপুর উপজেলার হুগলাকান্দি গ্রামে ১৯৩৫ সালে ১৯ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ রমিজউদ্দীন খান পাঠান। গ্রামেই তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু এবং পরবর্তীকালে জলপাইগুড়িতে ১৯৪৭ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ময়মনসিংহে চলে আসেন এবং ১৯৫১ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে গুরুদয়াল কলেজে থেকে আইএ ও বিএ পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ডিগ্রি নিয়ে কিশোরগঞ্জ বারে যোগ দেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কিশোরগঞ্জে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল চিরস্মরণীয়। সাংগঠনিক দক্ষতা ও অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তিনি সকলের প্রসংশা কুড়িয়ে ছিলেন। একুশের আন্দোলনে তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের পুরোধা। ১৯৫৪-এর সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন জনসভায় তার প্রদত্ত ভাষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নির্বাচনের কিছুদিন পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীকালে আবুল হোসেন সরকারের আমলে অন্যান্য রাজবন্দিদের সাথে মুক্তি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কশোরগঞ্জ বারের সদস্য ছিলেন।

মোঃ আবদুল আলী মেনু মিয়া

মোঃ আবদুল আলী মেনু মিয়া সদর উপজেলার চৌদ্দশত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ থেকে মোক্তারি পাস করে আজীবন কিশোরগঞ্জ বারে সুনামের সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পাকিস্তান আমলে তিনি জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) এবং কাশ্মীর বিষয়ক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন।

মোঃ আবদুস সাত্তার উকিল

মোঃ আবদুস সাত্তার উকিল কিশোরঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ীর মুসলিমপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় চলে যান এবং সেখান থেকে আইএ পাস করে কৃষি বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ঢাকায় আসেন এবং বিএ পাস করে ঢাকা ল কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি নিয়ে কিশোরগঞ্জ বারে যোগদান। ছাত্রজীবনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হলেও পরে আওয়ামী লীগে যোগ দেন।

কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার বিস্তারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমান কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি বড় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি করিমগঞ্জ-তাড়াইল আসনে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধেও তার ভূমিকা ছিল সক্রিয়।

এম এ কুদ্দুস উকিল (জন্ম-১৩২৬ বঙ্গাব্দ)

এম এ কুদ্দুস উকিল করিমগঞ্জ থানার কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম হাজী আহাম্মদ আলী। ১৯৩৯ সালে শেখপুর জিকেপিএম ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইকম এবং ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম পাস করেন। তিনি ১৯৬৯-১৯৭২ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে (তাড়াইল-করিমগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা) প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং ১৯৭৩-এর নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী রাজনীতির বলিষ্ঠ নেতা হিসেবে তিনি প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আতাউস সামাদ (১৯৩৭-২০১২)

আতাউস সামাদের জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৬ নভেম্বর কিশোরগঞ্জের সতেরদবিরায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর ১৯৫৯ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি দীর্ঘদিন প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশে (পিআইবি) কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে দেশ-বিদেশের বেশ কয়েকটি নামীদামি সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতা করেন খ্যাতিমান এই সাংবাদিক। আতাউস সামাদ সর্বশেষ *'দৈনিক আমার দেশ'*-এর উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে তিনি *'সাপ্তাহিক এখন'* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এর আগে ১৯৮২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকায় বিবিসি'র সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন। পরে কিছুকাল বেসরকারি টেলিভিশন এনটিভির প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বও পালন করেন তিনি। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভারের প্রধান প্রতিবেদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জেনারেল এইচএম এরশাদের সামরিক শাসনের সময় তাঁর সাহসী সাংবাদিকতা বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সাংবাদিকতার গৌরবময় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৯২ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। প্রখ্যাত এই সাংবাদিক ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে পরলোকগমণ করেন।

কাজী আবদুল বারী (১৯৩৭-১৯৮৩)

কাজী আবদুল বারী ১৯৩৭ সালে অষ্টগ্রামে জনগ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী আবদুল আউয়াল। কৈশোরেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। স্কুলছাত্র থাকাকালে ময়মনসিংহ শহরে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের কারণে তিনি ৬ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপের সাথে যুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস ময়দানে বক্তব্য প্রদানের জন্য তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়। ১৯৫৯ তিনি গ্রেফতার হলে সামরিক আদালত ১০টি বেত্রাঘাত এবং তিন বছরের জেল দেয়। বেত্রাঘাতের ফলে তার কান ফেটে যায় এবং এর পরিণতিতে তিনি বধির হয়ে যান। ১৯৬৩ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৯ সালে পুনরায় গ্রেফতার হয়ে গণআন্দোলনের সময় মুক্তি পান।

হাজী আবদুল বারী ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা ন্যাপের সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৩ এর ২১ ডিসেম্বরে কাজী আবদুল বারী মৃত্যুবরণ করেন।

আইয়ুব রেজা চৌধুরী (১৯৪১-১৯১৩)

আইয়ুব রেজা চৌধুরী ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে পড়ালেখা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ

অনার্সসহ এমএ পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ পড়াকালীন ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হন। এসময় তিনি অবিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। স্বাধীনতার পর মুক্তিলাভ করেন।

পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থাকাকালীন তিনি '*বাংলাদেশের মার্কসবাদী আন্দোলন এবং একটি দৃষ্টিভঙ্গি*' নামে প্রথম বই লিখেন। তার লেখা বইগুলোর মধ্যে '*এক সময়ের কমিউনিস্ট রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও পর্যালচনা*' ও '*আমাদের সময়কার কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট রাজনীতি: বিচারমূলক পর্যালোচনা ও নতুন ভাবনা*' অন্যতম। জনগণের সরকার কায়েমের জন্য সংগ্রামই ছিল তাঁর রাজনীতি। আজীবন তিনি এর পক্ষেই কথা বলেছেন এবং লিখে গেছেন। তিনি ১৯১৩ সালের ৮ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

লে. কর্নেল এ.টি.এম হায়দার (১৯৪২-১৯৭৫)

লে. কর্নেল এ.টি.এম হায়দার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার। পুরো নাম আবু তাহের মোহাম্মদ হায়দার। ১৯৪২ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার ভবানীপুরে তাঁর জন্ম। পিতা মোহাম্মদ ইসরাইল ছিলেন পুলিশ অফিসার। পরবর্তী সময়ে তিনি কিশোরগঞ্জ আদালতে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন।

১৯৫৮ সালে তিনি কিশোরগঞ্জের রামানন্দ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৬১ সালে কিশোরগঞ্জের সরকারি গুরুদয়াল কলেজ থেকে আই.এস সি পাস করেন। ১৯৬৫ সালে লাহোর ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি বি.এস সি ডিগ্রি লাভ করেন। এ.টি.এম হায়দার ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে এম.এস সি প্রথম পর্ব শেষ করার পর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন।[৪৬] তিনি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আর্টিলারি ফোর্সে অফিসার হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি পাকিস্তানের চেরাটে স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (এস.এস.জি)-বিষয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পরে তিনি মুলতান ক্যান্টনমেন্টে যোগ দেন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকেন। ১৯৭০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এ.টি.এম হায়দার ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন এবং কুমিল্লা সেনানিবাসে তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ঢাকায় বদলি হন এবং এর কিছুদিন পরই পুনরায় কুমিল্লা সেনানিবাসে বদলি হন।

এ.টি.এম হায়দার ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাস ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকে তিনি তেলিয়াপাড়া যান এবং কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কসহ মুশুল্লী রেলওয়ে সেতু বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেন। এরপর তিনি মেঘালয়ে সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের অধীনে সেকেন্ড কমান্ডার নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন হায়দার সেখানে একটি স্টুডেন্ট কোম্পানি গঠন করেন এবং

গেরিলাদের কমান্ডো ও বিস্ফোরক বিষয়ক প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ৭ অক্টোবর মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে কে-ফোর্স গঠিত হলে ক্যাপ্টেন হায়দার কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭২ সালে কুমিল্লাসেনানিবাসে ১৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হলে এ.টি.এম হায়দার এর অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং মেজর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি লে. কর্নেল পদে উন্নীত হন এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ২১ অক্টোবর তিনি রুমা সেনানিবাসে বদলি হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের পর ঢাকা সেনানিবাসে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ৩ নভেম্বর হায়দার পারিবারিক সমস্যার কারণে ঢাকা আসেন এবং খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভ্যুত্থানে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর খালেদ মোশারফের সঙ্গে লে. কর্নেল এ.টি.এম হায়দার নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ ১১ নভেম্বর উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ.টি.এম হায়দার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন।

এডভোকেট মোঃ আবদুল হামিদ (জন্ম-১৯৪৪)

মোঃ আবদুল হামিদ ১৯৪৪ সালের পয়লা জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার কামালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী মোঃ তায়েব উদ্দিন এবং মাতার নাম মরহুমা তমিজা খাতুন। মোঃ আবদুল হামিদ কিশোরগঞ্জ নিকলী জিসি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ থেকে আইএ ও বিএ ডিগ্রি এবং ঢাকার সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হন।

মোঃ আবদুল হামিদ-এর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয় ১৯৫৯ সালে তৎকালীন ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৬১ সালে কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়ার কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৪ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ১৯৬৫ সালে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে ১৯৬৮ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। মোঃ আবদুল হামিদ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৭১-এর

মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কিশোরগঞ্জে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ মার্চ কিশোরগঞ্জ শহরের রথখোলা মাঠে ছাত্র জনসভায় হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ঐদিন সকালেই স্বাধীনতার ঘোষণা টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এপ্রিলের প্রথম দিকে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর কিশোরগঞ্জ, ভৈরব ও বাজিতপুর শাখা থেকে আনুমানিক ১১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা সংগ্রহ করে ঐ সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ন্যাশনাল ব্যাংক শাখায় জমা রাখেন। এরপর তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আগরতলায় চলে যান। তখন বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা-এর অধিকাংশ সংসদ সদস্য সেখানে অবস্থান করছিলেন। জনাব হামিদ মুক্তিযুদ্ধের কৌশলগত বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করেন। একই সাথে তিনি আগরতলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথেও মতবিনিময় করেন। পরে তিনি এপ্রিলের শেষ দিকে বাংলাদেশে এসে আরো কিছু সহযোগীসহ আবার মেঘালয়ের টেকেরহাট, গুমাঘাট, পানছড়া, মৈইলাম হয়ে বালাট পৌঁছান। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ থেকে আগতদের জন্য তিনি ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্প চালু করেন এবং এর চেয়ারম্যান ছিলেন। মূলত কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আগতদের প্রাথমিক বাছাই কাজ এখানে করা হতো। এছাড়া মেঘালয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে গঠিত জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল-এর তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন।[৪৭] তিনি ভারতের মেঘালয়ে রিক্রুটিং ক্যাম্পের চেয়ারম্যান হিসেবে তৎকালীন সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলার বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (মুজিব বাহিনী) সাবসেক্টর কমান্ডার পদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে তিনি মেঘালয়ে অবস্থানকারী শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ক্যাম্পে সভা করেন। শরণার্থীদের দেশে ফেরা নিশ্চিত করার পর তিনি ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে দেশে ফিরে আসেন।

স্বাধীনতার পর তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বপালন করেন। এরপর ১৯৭৪ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পর ১৯৭৬-৭৮ সালে তৎকালীন সরকারের সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে ২০০৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পাঁচবার কিশোরগঞ্জ বার এসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্বপালন করেন। একজন সমাজসেবক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মোঃ আবদুল হামিদ মিঠামইন তমিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মিঠামইন বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মিঠামইন কলেজসহ এলাকায় প্রায় ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি অষ্টগ্রাম কলেজ, মিঠামইন ডিগ্রি কলেজ, ইটনা ডিগ্রি কলেজ, মিঠামইন হাইস্কুল, তমিজা খাতুন গার্লস হাইস্কুল, এলংজুড়ি হাইস্কুল, ইটনা গার্লস হাইস্কুল, বারিবাড়ি হাইস্কুল, আবদুল্লাহপুর হাইস্কুল, আবদুল ওয়াদুদ হাইস্কুল, কিশোরগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল, ধনপুর হাইস্কুল, শহীদ স্মৃতি হাইস্কুল, মোহনতলা হাইস্কুল এবং ঘাগড়া আঃ গণি উচ্চ বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকসহ তাঁর নির্বাচনী এলাকার আরও অনেক জুনিয়র হাইস্কুল ও মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক।

মোঃ আবদুল হামিদ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কমিটি, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ), কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরির আজীবন সদস্য ও নির্বাহী সদস্য। কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কিশোরগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং কিশোরগঞ্জ রাইফেলস্ ক্লাবের আজীবন সদস্য। তিনি কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সম্মানসূচক সদস্যসহ বহু সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি ১৯৭০ সালে ময়মনসিংহ-১৮ সংসদ নির্বাচনী এলাকা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, ১৯৭২ সালে গণপরিষদ সদস্য, ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৫ আসন থেকে, ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০০১ সালের পয়লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। মোঃ আবদুল হামিদ সপ্তম জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন এবং ১৩ জুলাই ১৯৯৬ থেকে ১০ জুলাই ২০০১ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্বপালন করেন। পরবর্তীতে তিনি স্পিকার নির্বাচিত হন এবং ১২ জুলাই ২০০১ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত দায়িত্বপালন করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে তিনি ২০০১ সালের পয়লা নভেম্বর থেকে বিরোধী দলীয় উপনেতা হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তিনি ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নবম জাতীয় সংসদে তিনি স্পিকার নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সফলভাবে এ দায়িত্বপালন করেন। নবম জাতীয় সংসদে তিনি কার্য উপদেষ্টা কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোঃ আবদুল হামিদকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৩ প্রদান করা হয়।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকাকালে ১৪ মার্চ ২০১৩ থেকে তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালন করেন। ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে মোঃ জিল্লুর রহমান মৃত্যুবরণ করলে সেদিন থেকে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালন করেন। ২২ এপ্রিল ২০১৩ তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ২৪ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি দেশের ২১ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আইভি রহমান (১৯৪৪-২০০৪)

বেগম আইভি রহমান ১৯৪৪ সালের ০৭ জুলাই কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮] তাঁর পিতা মরহুম অধ্যক্ষ জালাল উদ্দীন আহমেদ ও মাতা বেগম হাসিনা বানু। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বিএ (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি ১ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন। তাঁর স্বামী মোঃ জিল্লুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইভি রহমান ছাত্রজীবন থেকেই গণতন্ত্রের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব শাহীর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা কমিশন আন্দোলন এবং ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালীন তিনি মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ৭০ এর নির্বাচনে আইভি রহমান বীরোচিত ভূমিকা পালন করে ঢাকা শহরে নির্বাচনের সাংগঠনিক কাজে মহিলা আওয়ামী লীগের কর্মীদের নেতৃত্ব দেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বেগম সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে তিনি রাইফেল ও ফাস্ট-এইড ট্রেনিং নেন এবং অন্যান্য মহিলাদেরও ট্রেনিং দেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের অধীনে ভারতে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলোতে কানাডীয়ান ইউনাইটারী মিশন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় খাবার, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ও উদ্যম সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি জয়বাংলা রেডিওতে নিয়মিত কথিকা পাঠ করতেন। ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা সমিতি সংগঠিত হয়। মহিলা সমিতি পুর্নগঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং আমৃত্যু তিনি এ সমিতির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ নারীবর্ষ উদযাপন কমিটির তিনি ছিলেন একজন উদ্যোক্তা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার ও নিপীড়নের সময় তিনি দৃঢ়তার সাথে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে আইভি রহমানকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। তাঁর ত্যাগ, অবদান ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে ১৯৮০ সালে তাঁকে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনকালে তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ও সাহসী ভূমিকা রাখেন।

বেগম আইভি রহমান স্কুল জীবনে মুকুল ফৌজ, গার্লস গাইডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজসেবা শুরু করেন। বাংলার অনগ্রসর মহিলা সমাজকে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিকভাবে উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগামী সৈনিক। সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর অধিকার আদায়ে তিনি আজীবন ছিলেন একজন নিরলস কর্মী। নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের

লক্ষ্যে ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী উন্নয়নে জাতীয় নারী নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা হিসেবে নারী অধিকার ও নারী উন্নয়নে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী আইন প্রণয়নে আইভি রহমান অনবদ্য অবদান রাখেন। তিনি নারী অধিকার সচেতনে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল এলায়েন্স অব উইমেন' এর সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এর স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি The American Biographic Institute USA কর্তৃক Woman of the Year 2000 নির্বাচিত হন। এর পাশাপাশি দেশেও বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে নারী সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনের মতামতের প্রতি ছিল তার অকুণ্ঠ সমর্থন।

জাতীয় যৌতুক প্রতিরোধ সমিতি, এসিড সার্ভাইভার্স ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ অন্ধ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বেগম আইভি রহমান বাংলাদেশ মহিলা সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানসহ আরও অনেক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১-২০০৪ সময়কালে তিনি মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক সংস্থা The Associated Country Women of the World (ACWW) এর সেন্ট্রাল এন্ড সাউথ এশিয়ার এরিয়া প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আইভি রহমান ২০০৩ সালে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় একটি আন্তঃ এশিয়া কনফারেন্স আয়োজনে নেতৃত্ব দেন।

বেগম আইভি রহমান দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সক্রিয় থাকা অবস্থায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে স্মরণকালের ভয়াবহও বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন। ঘটনাস্থলে তাঁর দু'টি পা ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যায়। চিকিৎসার জন্য প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়। ৫৭ ঘন্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ২৪ আগস্ট রাত ২.০০ টায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। সমাজসেবা/জনসেবা ক্ষেত্রে অনন্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখার জন্য বেগম আইভি রহমান-কে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০০৯ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা রহমান বীরপ্রতীক (জন্ম -১৯৪৬)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালনের জন্য যে দুইজন নারী 'বীরপ্রতীক' খেতাব পেয়েছেন তাঁদের একজন ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা রহমান। ১৯৪৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জে জন্ম সিতারা

Dhaka University Institutional Repository

বেগমের। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে ১৯৭০ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন সিতারা। এসময় তাঁর বড় ভাই এটিএম হায়দারও সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। স্বাধিকার আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতে কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন সিতারা। সেই সময় তাঁর বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা মেজর এ.টি.এম হায়দার পাকিস্তান থেকে কুমিল্লায় বদলি হয়ে আসেন। তিনি কুমিল্লার ৩য় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিতারা ও তার ভাই হায়দার ঈদের ছুটি পালন করার জন্য তাদের কিশোরগঞ্জের বাড়িতে যান। কিন্তু সেই সময়ে দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। হায়দার তার বোনকে ক্যান্টনমেন্টে আর ফিরে না যাবার জন্য বলেন। পরবর্তিতে তিনি তার বোন সিতারা, বাবা-মা ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাঠান। কিশোরগঞ্জ থেকে মেঘালয়ে পৌছাতে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় লেগে যায়।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মেঘালয়ে 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' নামে ৪৮০ শয্যার একটি হাসপাতাল ছিলো। ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা সেক্টর-২ এর অধীনে সেখানের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। তাঁকে নিয়মিত আগরতলা থেকে ঔষধ আনার কাজ করতে হতো। হাসপাতালে একটি অপারেশন থিয়েটার ছিলো। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, বাঙালি ছাড়াও সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকজন চিকিৎসাসেবা নিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ড. সিতারা রেডিওতে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সংবাদ শুনে ঢাকা চলে আসেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে তাঁর ভাই মেজর হায়দার নিহত হলে ডা. সিতারা ও তাঁর পরিবার বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী ভাবে থাকা শুরু করেন।

আলমগীর হোসেন (১৯৪৬-১৯৯২)

আলমগীর হোসেন কিশোরগঞ্জের গাইটাল এলাকার সন্তান। জন্মেছিলেন নাটোরে, ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর। পিতা জনাব রুস্তম আলী সেখানকার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তার শিক্ষাজীবনের শুরু নেত্রকোণায়। পরে রংপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯৬৩ সালে এসএসসি ও কারমাইকেল কলেজ থেকে এইচএসসি এবং রাজনৈতিক কারণে নানাভাবে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটায় শেষে ১৯৭২ সালে ডিগ্রি পাস করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে দেয় এবং মুক্তি পান আগস্ট মাসে। স্বাধীনতার পর আওয়ামী রাজনীতিতে সক্রিয় হন। পরে প্রেসিডেন্ট এরশাদের রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং জাতীয় পার্টির মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কিশোরগঞ্জ রাইফেল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালের ২৯ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

হামিদুজ্জামান খান (জন্ম-১৯৪৬)

হামিদুজ্জামান ১৯৪৬ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার সহশ্রাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সায়েমউদ্দিন খান ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এবং মাতা রাবেয়া খাতুন ছিলেন একজন গৃহিণী। ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্কেচ করতে ভালোবাসতেন। এসময় তিনি তার দাদার একটি ছবি এঁকেছিলেন যা তার দাদার মুখের সাথে হুবহু মিলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক পাস করার পর তিনি ভৈরব কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এই ধরনের পড়াশুনা তার ভালো না লাগায় পরে তার বাবা তাকে নিয়ে যান শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বাসায়। তিনি তাকে আর্ট কলেজে ভর্তি করতে সাহায্য করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা আর্ট কলেজ (বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে চারুকলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ভাস্কর্য বিষয়ে ১৯৬৯ সালে ইউরোপের বেশ কয়েকটি শহরে, ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সালে বারোদায় পড়াশুনা করেন। বারোদায় পড়াকালীন বোম্বের এক প্রদর্শনীতে তার ভাস্কর্য প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনকে আকৃষ্ট করে। ১৯৭৬ সালে তিনি বারোদা মহারাজা সাহজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টার্নশিপ করেন।

হামিদুজ্জামান ১৯৭০ সালে ঢাকা আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। চিত্রশিল্পী আব্দুর রাজ্জাক এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য জাগ্রত চৌরঙ্গীর নির্মাণের সময় আব্দুর রাজ্জাকের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি ৭১ স্মরণে ব্রোঞ্জের 'দরজা' নির্মাণ করেন। এই ভাস্কর্যটি প্রদর্শনীর জন্য তিনি সেবছর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কারে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি ১৯৮১ সালে বঙ্গভবনে 'পাখি পরিবার', ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমিতে 'মুক্তিযোদ্ধা', ১৯৮৮ সালে আশুগঞ্জ জিয়া সারকারখানায় 'জাগ্রত বাংলা', এবং ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল অলিম্পিক পার্কে 'স্টেপস' (সিঁড়ি) নির্মাণ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশপ্তক ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এই ভাস্কর্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চেতনাকে ব্রোঞ্জের মূর্তিতে মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ১৯৯০ সালের ২৬ মার্চ ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য কাজী সালেহ আহম্মেদ।

তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে, যেমন ১৯৮১ সালে সিলেটের জালালাবাদ সেনানিবাসে 'হামলা', ২০০১ সালে ঢাকা সেনানিবাসে 'বিজয় কথন', ২০০৪ সালে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল সেনানিবাসে 'মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য' ও ময়মনসিংহে ময়মনসিংহ সেনানিবাসে 'বিজয়গাঁথা' ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। ২০০৩ সালে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় জাতীয় ভাস্কর্য উদ্যানে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। তিনি ২০০৫ সালে ঢাকার ফার্মগেটের আনন্দ সিনেমা হলের সামনে 'ইলিশ মাছ', ২০০৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র কেন্দ্রে 'শান্তির পায়রা', ২০০৯ সালে বারিধারায় 'পাখি' ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি ২০০৫ সালে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে এবং ২০০৬ সালে আগারগাওয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে 'আর্টিয়াম' ঝুলন্ত ভাস্কর্যও নির্মাণ করেছেন। তিনি ভাস্কর্যে অবদানের জন্য ২০০৬ সালে একুশে পদক এবং ১৯৭৬ সালে জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কারের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন।[৪৯]

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (১৯৫২-২০১৯)

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে পিতা সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় চার নেতার নির্মম হত্যাকান্ডের পর তিনি যুক্তরাজ্য চলে যান। প্রবাস জীবনে তিনি যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব আশরাফুল ইসলাম ১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং কিশোরগঞ্জ সদর আসন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫০] ১৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সর্বশেষ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি কিশোরগঞ্জ সদর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে শপথ নেয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সৈয়দ আশরাফুল ব্রিটিশ ভারতীয় শীলা ঠাকুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শীলা লন্ডনে শিক্ষকতা করতেন এবং ২৩ অক্টোবর ২০১৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আশরাফুল-শীলা দম্পতির একমাত্র মেয়ে রীমা ইসলাম, যিনি লন্ডনের এইচএসবিসি ব্যাংকে চাকরি করেন। সৈয়দ আশরাফুলের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তিনি ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ২০১৯ সালের ৩রা জানুয়ারি থাইল্যান্ডের ব্যাংককের মরুনগ্রাড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ৬ জানুয়ারি ঢাকার বনানী কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

ইলিয়াস কাঞ্চন

ইলিয়াস কাঞ্চন কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার আশুতিয়াপাড়া গ্রামে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাজি আব্দুল আলী, মাতার নাম সরুফা খাতুন। তিনি ১৯৭৫ সালে কবি নজরুল সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরে ১৯৭৬ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে পাস কোর্সে ভর্তি হন পরে ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোসলোজিতে ভর্তি হন। তবে চলচ্চিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

কারণে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৭৭ সালে 'বসুন্ধরা' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আসেন। প্রথম ছবি সুধী সমাজের কাছে সমাদৃত হয় কিন্তু ব্যবসা সফল হয়নি। অনেক পরিশ্রম করে তাকে এই পর্যন্ত আসতে হয়েছে। কাঞ্চন তিনশ'রও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন ।

তার উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় আছে- বসুন্ধরা, পরিণীতা, শেষ উত্তর, ভেজাচোখ, আঁখি মিলন, নীতিবান, অভিযান, বেদের মেয়ে জোসনা, বেনাম বাদশা, মাটির কস্‌ম, সিপাহী, স্বজন, ভাংচুর, মৃত্যুর মুখে, বাদশা ভাই, শেষ রক্ষা, সহযাত্রী, আত্মবিশ্বাস, স্নেহের প্রতিদান, প্রতিরোধ, আদরের সন্তান, মুন্না মাস্তান, চেয়ারম্যান, খুনি আসামি, আসামি গ্রেফতার, ত্যাগ, সৎ মানুষ, মহৎ সহ তিনি মিনি পর্দায় অভিনয় করেন ১৯৭৯ সালে। তিনি প্রথম প্যাকজ নাটক 'নায়ক' ১৯৯৬ সালে, প্রথম টেলিফ্লিম 'অবাঞ্ছিতা'য় ২০০১ সালে অভিনয় করেন। অভিনয়ের জন্য এবং সফরের উদ্দেশ্যে তিনি সৌদি আরব, ভারত, নেপাল, ব্যাঙ্কক, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, কানাডা, জাপান, পাকিস্তান ঘুরে এসেছেন।

কাঞ্চন তার শিল্পী জীবনে অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। জয় করেছেন কোটি মানুষের হৃদয় এবং তার স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেছেন জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার-১৯৮৬, বাংলাদেশ চলচিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার-১৯৮৬ ও ১৯৯৬ সালে, জিয়া স্বর্ণপদক-১৯৯২, ১৯৯৯ ও ২০০১ সালে, যুব পদক-১৯৯২ সালে, চলচিত্র দর্শক ফোরাম পুরস্কার-১৯৯৩ সালে, শেরেবাংলা স্মৃতি পদক-১৯৯৩, ১৯৯৬ ও ১০৯৯ সালে।

এছাড়াও বাংলাদেশ মানবাধিকার ফাউন্ডেশন পদক-১৯৯৬ সালে, মেরিল ভোরে কাগজ মেলা পুরস্কার-১৯৯৭ সালে, ফুলকুলি অ্যাওয়ার্ডস-১৯৯৮ সালে, জাতীয় সাংবাদিক কল্যাণ সমিতি পুরস্কার-১৯৯৮ সালে, ৩য় বাংলাদেশ ফ্লিম মুভমেন্ট পুরস্কার-১৯৯৯ সালে, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ সংস্থা স্বর্ণপদক-২০০০ সালে, অনন্যা সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ পরিষদ পুরস্কার, শেখ সাঈদ বক্স স্মৃতিযুব পদক এবং বাংলাদেশ কালচারাল মুভমেন্ট অ্যাওয়াডর্স নারায়ণগঞ্জ-২০০১ সালে। সড়ক দূর্ঘটনায় তার প্রথম স্ত্রী নিহত হওয়ার পর কাঞ্চন 'নিরাপদ সড়ক চাই' বিষয়ক একটি সামাজিক আন্দোলনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নিপা

কিশোরগঞ্জ জেলার অসংখ্য গুণী শিল্পীর মধ্যে একজন নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নিপা। ছোটবেলা থেকে পারিবারিকভাবে নাচ শিখতেন অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে। এরপর ৯ম শ্রেণিতে পড়ার সময় কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে একটি অনুষ্ঠান করলে অনেক উৎসাহ পান সবার কাছ থেকে। আর এরপর থেকে তাঁর মূল নাচের চর্চা শুরু। পরে বিভিন্ন বিদেশী শিক্ষকদের কাছ থেকে নাচের তালিম নেয়া থেকে শুরু করে বিদেশে গিয়েও নাচ শিখে এসেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এখন চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের সত্যিকার যেসব লোকজ নাচ আছে সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করে পরিবেশন করার জন্য তৈরী করার।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৩ উপসংহার

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাজে বসবাস করে থাকে। যদিও প্রাচীন সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস বিদ্যমান ছিল বংশ, গোত্র ও মর্যাদা অনুযায়ী। যুগের আধুনিকায়নের সাথে সাথে সমাজের এসব স্তর বিন্যাস কিছুটা স্তিমিত হলেও এখনও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। বংশ, গোত্র ও মর্যাদা অনুযায়ী কিছুটা পার্থক্য আজও বিদ্যমান। তবে প্রাচীন এসব শ্রেণি বিন্যাসের পরিবর্তে বর্তমানে এর জায়গা করে নিয়েছে অর্থনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস। পুঁজিবাদের এ যুগে যা বিশ্বের সব জায়গায় বিদ্যমান। কিশোরগঞ্জের সমাজ ব্যবস্থায় এসব স্তর বিন্যাস বিদ্যমান থাকলেও এ অঞ্চলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি এ বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তুলেছে।

কিশোরগঞ্জের মানুষের দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় রয়েছে মাছ-ভাত। এ অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদন হয় এবং হাওর বেষ্টিত হওয়ায় প্রচুর মিঠাপানির মাছও পাওয়া যায় এখানে। শুধু মাছ নয়, মাছ প্রক্রিয়াজাত করে তৈরী শুটকিও এ জেলার মানুষের খাদ্যাভ্যাসের অন্যতম অনুসঙ্গ। এ অঞ্চলের চ্যাপা শুটকির সুনাম রয়েছে। অতিথি পরায়ণ এ জেলার মানুষের অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম উপাদান হলো পিঠা। নকশি পিঠা, পোয়া পিঠা, চিটা পিঠা, দুধ চিতই, পাটিসাপটা, মালপোয়া, ভাপা পিঠাসহ অসংখ্য পিঠা তৈরীতে এ অঞ্চলের নারীরা সিদ্ধহস্ত। শুধু অতিথি আপ্যায়ন নয় বিয়ে, জামাই বরণ ও জামাই আপ্যায়নেও এ অঞ্চলের পিঠা অতুলনীয়। তাছাড়া এ অঞ্চলে অতিথি আপ্যায়ন হবে আর পান-সুপারি সাজানো থাকবেনা, তা তো ভাবাই যায়না। তবে সময়ের সাথে সাথে মানুষের এসব নিত্যদিনের খাদ্যাভ্যাস ও অতিথি আপ্যায়নের ঢংয়েও এসেছে অনেক পরিবর্তন। এখন মানুষ আর ঝামেলা করে এত পিঠে-পুলি তৈরী করতে যায়না। এর জায়গা দখল করে নিয়েছে মিষ্টি ও বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মত এ জেলার মানুষেরও প্রধান পোশাক শাড়ি, লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি ও সালোয়ার-কামিজ। হিন্দুদের মাঝে ধুতির ব্যবহার দেখা গেলেও এর পরিমাণ খুবই কম। এ জেলার মেয়েদের মাঝে বিশেষ করে হাওর বেষ্টিত এলাকার অর্থাৎ ভাটি অঞ্চলের মেয়েদের মাঝে অলংকার পড়ার প্রবণতা একটু বেশি। যা এ জেলার অন্যান্য অঞ্চলে খুব কম দেখা যায়। তবে বিয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সব এলাকার মেয়েরাই অলংকার ব্যবহার করে থাকে।

প্রমিত বাংলা ভাষা ছাড়াও কিশোরগঞ্জের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। যা এ জেলার মানুষের কথা শুনে যে কেউ ধরে ফেলতে পারে। এখানে মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। মহাপ্রাণ ধ্বনিকে অল্পপ্রাণ ধ্বনির মত করেই এ অঞ্চলের মানুষ উচ্চারণ করে থাকে। তাছাড়া এ অঞ্চলে আনুনাসিক ধ্বনির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি এ অঞ্চলের মানুষ বর্তমান কালের অনেক শব্দ অতীত কালের শব্দ দিয়ে উচ্চারণ

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে। যেমন- যাব না > যাইতাম না, খাব না > খাইতাম না ইত্যাদি। এছাড়াও এ জেলার এক অঞ্চলের মানুষের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষারও কিছু পার্থক্য রয়েছে। ভাটি অঞ্চলের দিকে 'প' কে 'হ' এর মত করে উচ্চারণ করে থাকে। যেমন- পান > হান, পাতা > হাতা, পানি > হানি ইত্যাদি। যা উজান অঞ্চলে দেখা যায়না। এমনকি এ জেলার অষ্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের রয়েছে "ছহুম" ভাষা নামক এক নিজস্ব ভাষা। যা অন্য এলাকার মানুষ বুঝতে পারেনা।

কিশোরগঞ্জের গ্রামীণ এলাকার মানুষের রয়েছে কিছু লৌকিক বিশ্বাস ও কুপ্রথা। তারা ঝাঁর-ফুক, তাবিজ, পানি পড়া, তেল পড়া এগুলোতে বিশ্বাস করে। যুগের সাথে সাথে এসবের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অনেক কমে গেলেও এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

ধর্মীয় নানা উৎসবের পাশাপাশি এ জেলার সামাজিক উৎসব সমূহ অত্যন্ত ঝাকজমক ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। অতীতকাল থেকেই নববর্ষ পালন করে আসলেও বর্তমানে এতে যোগ হয়েছে সার্বজনীনতা ও আধুনিকতা। তবে নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামীণ মেলার আয়োজন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। নববর্ষের পাশাপাশি নবান্ন, চৈত্র সংক্রান্তিও এ অঞ্চলে ঘটা করে পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিয়ে উপলক্ষে রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও রীতি। এছাড়াও কিশোরগঞ্জের সামাজিক জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে এ জেলার লোক মেলা সমূহ। চিলপূজা, অষ্টমী স্নান, রথযাত্রাসহ বিভিন্ন উপলক্ষে এখানে লোক মেলা জমে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কটিয়াদীর কুড়িখাই মেলা, রথের মেলা, হোসেনপুরের অষ্টমী মেলা, নিকলীর রথ মেলা, পোড়াবাড়ীর মেলা, ঝুলন মেলা, চরপলাশ মেলা, অষ্টগ্রামের মহররম মেলা, কাইমার বাউলী মেলা ইত্যাদি।

এ জেলায় জন্ম নিয়েছেন বিভিন্ন জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি। যারা সমাজ সংস্কারে রেখেছেন অসামান্য অবদান। যেমন- রেবতী মোহন বর্মণ, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোঃ জিল্লুর রহমান, আইভী রহমান, এডভোকেট মোঃ আব্দুল হামিদ, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, জয়নুল আবেদীন, শ্রী মনোরঞ্জন দাস প্রমুখ। এ জেলার সমাজ ও সামাজিক জীবন তাই সমৃদ্ধ ও অনন্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১। নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ.১২-১৭

২। *'Society is a number of like-minded individuals, who know and enjoy their like- mindedness and are therefore able to work together for common ends'.* উদ্ধৃত, শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), *সমাজ দর্শন* (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, একাদশ মুদ্রণ ১৯৮০), পৃ.৪৮ (১নং পাদটীকা)

৩। পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯০) পৃ.১১৯

৪। উদ্ধৃত, শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯ (পাদটীকা)

৫। পরিমল ভূষণ কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৬। উদ্ধৃত, শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯ (পাদটীকা)

৭। রঙ্গলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ.৩; নাজমুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭

৮। উদ্ধৃত, ঐ

৯। *Bottomore, 'Sociology' (1964), P-180.*

১০। Biezanz and Biezanz Zuvi তাঁর *"Introduction to Sociology"* (1969), P-179.

১১। মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, *সমাজবিজ্ঞান: প্রত্যয় ও পদ্ধতি* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, (১৯৯১), পৃ.৪১

১২। উদ্ধৃত, ঐ, পৃ.৪২

১৩। A. Beteille, *'Class and Power'* (1969), P-46.

১৪। বিস্তারিত, রঙ্গলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, পৃ.১৩-১৪; মোঃ মাহবুব আলম বেগ, *বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিম্নবিত্ত সমাজ*, পৃ.১১-১২

১৫। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২৮

১৬। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২৯-৩০

১৭। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৪০১

১৮। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৪০২

১৯। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.৩২

২০। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.২৭৩

২১। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, নবম-দশম শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ-২০১৬, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

২২। bn.wikipedia.org

২৩। মোঃ রফিকুল হক আখন্দ, *কিশোরগঞ্জের লোকপ্রথা ও লোকভাষা*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ.৩৪

Dhaka University Institutional Repository

২৪। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৫

২৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৯

২৬। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৪১

২৭। www.kishorgonj.com

২৮। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৪৭২

২৯। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৪৭৩

৩০। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৪৭৬

৩১। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৯৯

৩২। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৬৮

৩৩। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৭১

৩৪। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২৮২

৩৫। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৩৭৭

৩৬। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৮০

৩৭। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৮২

৩৮। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী (অক্টোবর, ২০১৪), পৃ.১৫-১৬

৩৯। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.১৭৫

৪০। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৭৭

৪১। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৭৮

৪২। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি, ২০১৫), পৃ.৬৭

৪৩। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী (অক্টোবর, ২০১৪), পৃ.১২

৪৪। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.১৮৩

৪৫। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.১১১

৪৬। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১২২

৪৭। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী (অক্টোবর, ২০১৪), পৃ.৩৫

৪৮। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.১১৪

৪৯। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি, ২০১৫), পৃ.৭২

৫০। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.১৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

কিশোরগঞ্জের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক জীবনধারা

৪.১ অর্থনৈতিক অবস্থা

কোন এলাকার উন্নয়নের মূলমন্ত্র সে এলাকার অর্থনীতি। তেমনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি সে এলাকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। কোন এলাকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম, শ্রম বাজার, কর্মসংস্থান সর্বোপরি শিল্প-বাণিজ্যের সার্বিক বিবরণ উপস্থাপন করা জটিল এবং দুরূহ কাজ। কিশোরগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই জনপদের অর্থনীতি ঐতিহাসিক কাল থেকেই সঙ্কট, বিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে উপনীত হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। এখানকার ভূমি, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশই মুখ্যরূপে এর উপর কৃষিনির্ভরতার ঐতিহাসিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে অসংখ্য ছোট-বড় নদী ও জলাশয় বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিকাঠামো ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্যগত বহুমাত্রিকতা, হাওর ও সমতলের সঙ্গে নদী সিকস্তি ভূমি আর চরাঞ্চল এখানে ঐতিহাসিকভাবেই একটি কৃষি অর্থনীতি আর কৃষিভিত্তিক পেশা-কর্ম-বৃত্তি ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে।

অপরদিকে এ অঞ্চল তৎকালে জাতীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগের বিবেচনায় প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। কেন্দ্র ও রাজধানী থেকে দূরবর্তী এবং হাওরাঞ্চল ও পশ্চাৎপদ যোগাযোগের কারণে বৃহৎ শিল্প অথবা বাণিজ্যের অবাধ ভূমিতে পরিণত হওয়ার বদলে কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহের পশ্চাদভূমিরূপে পরিগণিত হয়েছে। কলকাতা বা বিলাতের শিল্পায়নে এখানকার পাট, তুলা, নীলের অবদান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কিশোরগঞ্জ হিন্টারল্যান্ড বা কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল জোগানদানকারী অঞ্চল হিসেবে ব্রিটিশ বাংলায়, পাকিস্তানে এবং বর্তমানের বাংলাদেশেও নিজস্ব অবস্থান ধরে রেখেছে। তবে বর্তমান কৃষি-জাগরণ আর কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নের জোয়ারে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে কিশোরগঞ্জকে। মৎস্য উৎপাদন, সবজি, নানা জাতের ফসল, পোল্ট্রি, হ্যাচারি, দুগ্ধজাত খাদ্য ও কৃষি সহযোগী প্রাণীসম্পদ বিকাশে পরোক্ষভাবে শিল্প-বাণিজ্যে কিশোরগঞ্জের অবদান গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের দাবি রাখে।[১]

মূলত ভূগোল, পরিবেশের কৃষি সহযোগী অনুষঙ্গ এবং যোগাযোগের পশ্চাৎপদতার সঙ্গে কর্মমুখী ও উন্নয়নমূলক শিক্ষার, বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে এখানকার মানুষ তার অর্থনৈতিক জীবনকে নতুন স্বপ্ন ও নির্মাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। বরং গতানুগতিক কৃষিকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

ফলে যুগ যুগ ধরেই এখানকার মানুষ ঐতিহাসিক নিয়তির দান হিসেবে কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ এবং কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প ইত্যাদির উপর নির্ভর করে গতানুগতিক জীবনযাপনে নির্ভরশীল হয়ে থেকেছে। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানকার অধিবাসীরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও নিরলস শ্রমের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে চমৎকার কৃষিপণ্য, কুটিরশিল্পসহ শিল্পজাত দ্রব্য, যা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ বা অখণ্ড বাংলায়ই নয়, পাশ্চাত্যের দেশগুলোকেও তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে লোকশিল্প গবেষক এবং ফোকলোরবিদরা বাংলাদেশের বিশিষ্ট কৃষি ও মৎস্য অর্থনীতির অঞ্চল হিসেবে হাওর-বাওর, নদী, খাল-বিল পরিবেষ্টিত কিশোরগঞ্জের দিগন্ত বিস্তৃত জনপদকে চিহ্নিত করেছেন এবং এখান থেকে কৃষিশিল্পের, মৎস্য উৎপাদনের ও মৎস্য আহরণের অনন্য সুন্দর উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রী বিশ্বের দরবারে বিশেষ আকর্ষণীয় হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। এমনকি কিশোরগঞ্জ মহকুমা হিসেবে প্রায় শতবর্ষকাল অতিক্রমের সময়ও কৃষি-জেলার মর্যাদা পেত এবং কৃষি সম্প্রসারণ, বিএডিসি ইত্যাদির জেলা পর্যায়ের কার্যালয় এখানেই ছিল। এখানেই ছিল অধুনালুপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলীয় জেলাসমূহ যথা: কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সম্পূর্ণ এবং সিলেট ও নরসিংদীর কিয়দংশের হাওর জনপদ, জনমানুষ ও কৃষির উন্নয়নে কাজ করেছে।[২]

কিশোরগঞ্জের সাধারণ জনজীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সাকসির সার্ভে রিপোর্ট (১৯২০) থেকে জানা যায়, তখনকার দিনে একজন রায়তের দুই একর জমি থেকে যে পরিমাণ পাট ও ধান উৎপাদিত হতো তা থেকে তাদের ৫-এর অধিক সংখ্যক সদস্যের পরিবারের পক্ষে জীবন পরিচালনায় কোনো অসুবিধা হতো না। তবে গবাদিপশুর ক্ষয়ক্ষতি অথবা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লে অথবা কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক দেখা দিলে তাকে ঋণগ্রস্ত হতে হতো। তাছাড়া বন্যা, খরা, ভূকম্পন, জমিদারি শোষণ ও ইংরেজদের কালাকানুন কৃষকদের স্বাভাবিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলত।

অর্থনীতিতে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, ওই সময়কার সামাজিক অবস্থায় জমিদারদের আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তির পাশাপাশি এক শ্রেণির নব্য ব্যবসায়ীর প্রাধান্যও বেশ ছিল। জমিদারদের প্রভাবে ব্যবসায়ীরা প্রভাবিত হতেন এবং সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকাই ছিল না। যা কিশোরগঞ্জের বেলায়ও শতভাগ সত্য ছিল। শ্রী কেদারনাথ মজুমদার ১৯০৪ সালে "*ময়মনসিংহ বিবরণ*" গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন-সার্বিক অর্থে কিশোরগঞ্জের মতো উৎপাদনমুখর কিন্তু শোষিত ও পশ্চাৎপদ একটি জনপদের অর্থনীতি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। প্রধানত সাধারণ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন ও শ্রম আত্মসাতের মাধ্যমে জমিদার-বেনিয়া একতরফা বিকাশের কারণে এখানে অর্থনীতির মজবুত ভিত্তি ও শিল্পায়ন হয়নি। এখানকার কুটির শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুটির শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, অলংকার শিল্প, মৃৎশিল্প, কারুশিল্প, ধাতুজাত ও মাদুরশিল্প।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল শাসনামলে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর ও জঙ্গলবাড়ী মসলিন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। বুনন ও গুণগত দিক থেকে কিশোরগঞ্জের 'তানজেব' (মসলিন বস্ত্র) ঢাকার 'শবনাম' মসলিনের সমতুল্য ছিল।[৪] বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুরের তৈরি মসলিন ঢাকা হয়ে আরব, পারস্য ও চীনে রফতানি হতো। এ মসলিন দিল্লির বাদশা-বেগমদেরও জনপ্রিয় ছিল। নূরজাহান এমনি একটি মসলিনের নাম দিয়েছিলেন 'আবে রাওয়া' বা 'জলের ঝরনাধারা'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইংল্যান্ডের কল-কারখানার বস্ত্রকে বিকশিত করতে গিয়ে মসলিন শিল্পীদের অংগুলি কর্তন করার ফলে এ বস্ত্রশিল্পের অবলুপ্তি ঘটে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও লেখক ড. মাহফুজ পারভেজ '*খ্যাতিমানদের মরদেহ এবং এক ডজন মজার বিষয়*' গ্রন্থে মুঘল সাংস্কৃতিক পরম্পরা অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিবরণ দিয়েছেন।

একদা মুক্তা ও মুক্তার অলঙ্কারের জন্য কিশোরগঞ্জ বিখ্যাত ছিল। হাওরাঞ্চলে প্রাকৃতিক মুক্তার একটি বিশাল ভাণ্ডার ছিল। বাজিতপুরের দিলালপুর ও অষ্টগ্রামের বাঙালপাড়া মুক্তার জন্য সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। হাওরের মানুষ দল বেঁধে নদী থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে এ থেকে আহরিত মুক্তা নিয়ে দিলালপুর ও বাঙালপাড়ায় ভীড় জমাত। জীবিকার জন্য পরিচালিত মানুষের এসব কর্মকাণ্ড তখনকার অর্থনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্ববহ ছিল। বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, নিকলী ও মিঠামইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ঘোড়াউত্রা, ধনু ও অন্যান্য শাখা নদী, বিল, হাওর এলাকা ছিল মুক্তা আহরণের উৎকৃষ্ট স্থান। আজকাল আর এ দৃশ্য চোখে পড়ে না। কেননা আধুনিকায়নের ধারায় এ শিল্পকে সম্পৃক্ত করতে না পারায় শিল্পটি আজ প্রায় হারিয়ে গেছে।

পনির শিল্প এ জেলার একটি পুরাতন শিল্প। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এ শিল্প চালু আছে। তথাকথিত ঢাকাই পনির এ জেলার ধনু নদী তীরবর্তী ইটনা ও অন্যান্য স্থানে প্রস্তুত হতো।[৫] অষ্টগ্রামের পনিরের কথা আজও মানুষ ভোলেনি। গরু ও মহিষের দুধ থেকে তৈরি অষ্টগ্রামের পনিরের সুনাম দেশব্যাপী। এর প্রস্তুত প্রণালি ভিন্ন রকম এবং তা ছিল সুস্বাদু। এই পনিরের উপকরণ হলো দুধ ও মাওয়া। এক সময়ের পনির উৎপাদনকারী অষ্টগ্রামের বাসিন্দারা আজ শুধু ইতিহাসের সাক্ষী। এখনও কুলিয়ারচরের মাখন ও পনির রাজধানী ঢাকায় বিরাট চাহিদা পাচ্ছে।

কিশোরগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ এলেই ভৈরবের নামটি প্রথমে চলে আসে। একসময়ের 'উলুকান্দি বাজার', আজকের বন্দরনগরী ভৈরব এক সংগ্রামী ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল। এগারসিন্দুরও এককালে বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এটি শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি ছিল বলে জানা যায়। এগারসিন্দুর, জঙ্গলবাড়ী আর ভাটি বাংলায় (হাওরাঞ্চল) বড় বড় নৌকা আর বজরা নির্মাণের কেন্দ্র ছিল। মসনদে আলা ঈসা খাঁ'র আমলে নৌবাহিনীতে কিশোরগঞ্জের নানা রকমের অবদান ছিল। এগারসিন্দুর দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ ঘেঁষে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ এবং শীতলক্ষ্যা নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল। ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা কামরূপ রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই এটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সপ্তম শতাব্দীতে এই স্থানটির নাম কী ছিল জানা না গেলেও অষ্টম শতাব্দী ও নবম শতাব্দীতে এর নাম ছিল 'গঞ্জে হাবেঙ্ক'।

জানা যায় ওই সময় কামরূপ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তীকালে এটি সামন্ত রাজাদের রাজধানী ও বাণিজ্যবন্দরের রূপ পরিগ্রহ করে। অন্য একটি মতে, বর্তমান এগারসিন্দুর ব্রহ্মপুত্র, শঙ্ক,বংশাই ইত্যাদি এগারটি নদীর মোহনায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যবন্দর ও নৌবন্দর হিসেবে খ্যাত ছিল। উপরোক্ত তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একসময় এগারসিন্দুর এ উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এখানে বিশাল বাণিজ্যবন্দর গড়ে উঠেছিল। আজ এর অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। এগারসিন্দুর প্রসঙ্গে ষোড়শ শতকের কবি নিত্যানন্দ দাস তার '*প্রেম বিলাস*' গ্রন্থে লিখেছেন-

এগারসিন্দুর আর মিরজাফরপুর
দগদগা কুটিস্বর আর হোসেনপুর
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে এসব স্থান হয়
নানাদেশী লোক তাতে বাণিজ্য করয়।
এগারসিন্দুর আর দগদগা স্থানে
বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্বলোকে জানে
নানাদেশী বণিক আসে এথায়
বেচাকেনা করে সঙ্গে আনন্দ হিয়ায়।[৬]

কিশোরগঞ্জের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পাট উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত, কিশোরগঞ্জের ভূগোলে পূর্বাঞ্চল হাওর আর পশ্চিমাঞ্চল নদীবাহিত চরাঞ্চল। পশ্চিমের অংশে ব্যাপকভাবে উন্নতজাতের পাটের উৎপাদনের খ্যাতি রয়েছে। আর এর ব্যবসা ও বিপণনের জন্য কটিয়াদী, হোসেনপুর, নিকলীর খ্যাতি অসামান্য। নিকলীর দামপাড়ায় ভারতীয় বিড়লা কোম্পানির নিজস্ব প্রেস ছিল।

এ জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই বড় বড় পাটগুদামের ধ্বংসাবশেষ ও স্মৃতি রয়েছে। ইতালির রেলি ব্রাদার্স কোম্পানি, ইংল্যান্ডের আরসিএম কোম্পানি তাদের ব্যবসা কেন্দ্রখুলেছিল নিকলীসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে। স্থানীয় প্রবীণেরা আজও সেই স্মৃতি রোমন্থন করেন। তাঁদের ভাষ্য মতে, এখানে নদীপথে বিভিন্ন এলাকা থেকে পাট নিকলীতে চালান দেওয়া হতো। পরে এগুলো বিভিন্ন কোম্পানি বিলাতের ডান্ডি শহরসহ অন্যান্য স্থানে রফতানি করত। কলকাতার পাটকলগুলোর কাঁচামালের জোগানদারও ছিল কিশোরগঞ্জের পাট। অন্যতম পাট ক্রয়কেন্দ্র হিসেবে নিকলীতে ক্রয়কৃত পাটের মূল্য পরিশোধের জন্য কোম্পানিগুলো প্লেনে করে টাকা পাঠাত এমন দাবিও এলাকাবাসীর।

এছাড়া পাটের আমদানি ও রফতানির জন্য সেসময় ঘোড়াউত্রা, নরসুন্দা ও সোয়াইজানি নদীতে স্টিমার চলাচল করত। ওই সময় নিকলীতে ঐতিহ্যবাহী চিটাগাং কোম্পানি, ইউরোপের পাট ব্যবসায়ী ইংরেজদের দ্বারা নির্মিত বহু নিদর্শন আজো কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কিশোরগঞ্জের নদীগুলোতে পাটবাহী রঙ-বেরঙের

Dhaka University Institutional Repository

শত শত নৌকার সমাবেশ পঞ্চাশ বছর আগেও দেখা যেত। নিকলীতে ফরাসিদের তিনটি কুঠি ছিল বলে জানা গেছে। এসব কুঠিতে শুকনা মাছের বৃহৎ আড়ৎ ছিল। এখান থেকে শুকনা মাছ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মিয়ানমারে চালান দেয়া হয়।

এছাড়া জেলায় বহু নীলকুঠির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। কিশোরগঞ্জ শহরের কুটিগির্দিতে এমন একটি কুঠি ছিল। এ থেকেই 'কুটিগির্দি' নামের উৎপত্তি বলেও ধারণা করা হয়। হোসেনপুর-পাকুন্দিয়া-কটিয়াদী ও কুলিয়ারচরের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বেশ কিছু ইংরেজ কুঠির ধ্বংসাবশেষের আলামত দেখা গেছে, যেগুলো একসময় সমৃদ্ধ ব্যবসাস্থল এবং অবশ্যই শোষণের কেন্দ্ররূপে দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলাবাহুল্য, এসব কুঠি ঘিরে ইংরেজ, জমিদার, পাইক, বরকন্দাজদের ভোগবিলাস, লাম্পট্য ও নির্যাতনের বহু কথা-কাহিনী ও উপাখ্যান আজও ঘৃণা আর আতঙ্কের সঙ্গে লোকমুখে প্রচারিত।

কৃষির পাশাপাশি ধাতু ও লৌহশিল্পের একটি অতীত ধারার কথাও জানা যায়। বিশেষত কিশোরগঞ্জের করগাঁও ও বাজিতপুর লৌহ, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি সামগ্রী নির্মাণে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। বাজিতপুরের দা, বঁটি ও যাতির কদর ছিল সর্বত্র। বর্তমানে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে লৌহনির্মিত কাঁচির বেশ সুনাম দেখা যায়। এসব কাঁচি জেলার সর্বত্র এমনকি জেলার বাইরে বিভিন্ন জেলায় চালান হচ্ছে। লৌহনির্মিত কাঁচি তৈরির ফলে হোসেনপুরের আড়াইবাড়িয়ার কাইছমা গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে 'কাঁচিগ্রাম'।

অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে আরও জানা যায় যে, একসময় কিশোরগঞ্জে তাঁত শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে কিছু উচ্চমানের বুটি শাড়ী তৈরি হতো এবং কলকাতায় এই শাড়ীর প্রচুর চাহিদা ছিল।এখানকার গ্রামের মেয়েরা রেশমী শাড়ী পরত এবং নিজেরাই তা তৈরি করত। নিম্ন শ্রেণির হিন্দু স্ত্রী লোকেরা পাট থেকে কাপড় বুনত।[৭]

বাজিতপুর ও জঙ্গলবাড়ী কয়েক প্রকার উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কিশোরগঞ্জ শহরের বত্রিশের সমৃদ্ধ প্রামাণিক পরিবারও মসলিনের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। বাজিতপুর ও জঙ্গলবাড়ী উৎকৃষ্ট মানের তুলা উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। বাজিতপুরের মসলিন ও কিশোরগঞ্জের তানজেব (দেহের সৌন্দর্য বর্ধক) দিল্লীর বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওলন্দাজরা এ দু'টি কেন্দ্রে কুঠি স্থাপন করে বস্ত্র ব্যবসা চালাত। পরে ইংরেজরা তাদের কুঠি দু'টি হস্তগত করে।

এখানকার তানজেব ও গোসাবতন শাড়ীই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তানজেব সাদা জমিন বিশিষ্ট কাপড় ছিল এবং পরিধেয় জামা ইত্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হতো। এটি দৈর্ঘ্যে ২০ গজ ও প্রস্থে ১ গজ ছিল। এর সুতা সংখ্যা ৮০০ থেকে ১৯০০তে এবং ওজন ২০ থেকে ৪০ তোলা পর্যন্ত উঠানামা করত।[৮] মসলিন অথবা অন্য কোন মিহি কাপড়ের সোনারুপা অথবা বাদলার বুটি তোলা কাপড়কে 'গোসাবতন' বলা হতো।[৯] মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে দিল্লীর বাদশাহের পরিবারের জন্য মসলিন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জঙ্গলবাড়ীতে দারোগা ছিল।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

মসলিন শিল্প এই এলাকার লোকদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর ও কুলিয়ারচরের কাপাসাটিয়ায় মসলিনের কাঁচামাল কার্পাস ও উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এসব মসলিনের নাম ছিল বিভিন্ন। যেমন- সরকার-ই-খাস, সরকার-ই-আলী, মলমল খাস, জঙ্গল খাস, তাঞ্জাব, গোলবতন এবং আবে রাওয়া। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মসলিনের নাম ছিল জঙ্গলবাড়ীর 'জঙ্গল খাস' বা 'জঙ্গল কুষা'। এর দৈর্ঘ্য ২০ গজ ও প্রস্থ ৯ গজ ছিল। সুতার সংখ্যা ১৪০০ থেকে ২৮০০ পর্যন্ত কমবেশ ছিল। এগুলো সাদা জমিন বিশিষ্ট এবং সোনা-রুপার সূক্ষ্ম কারুময় ও উন্নত মানের ছিল। আঠার শতকের প্রথম দিকে ঢাকার নবাব মুর্শিদ কুলি খান দিল্লিতে মুঘল সম্রাটের কাছে এসব মসলিন পাঠাতেন বলে জানা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকেও এসব মসলিন উৎপাদিত হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে তা সংকুচিত হয়ে আসে এবং কালক্রমে ধ্বংস হয়। বিদেশি কোম্পানির মুনাফা, লুণ্ঠন, তাঁতশিল্পীদের উপর নির্যাতন এবং ইংরেজ রাজত্বের বৈরী পরিবেশ এ শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। বিশ্বকে তাক লাগানো এধরনের উৎকৃষ্ট মানের মসলিন দুই শতকের ব্যবধানে হারিয়ে যায়। সেই সাথে মসলিনকে ঘিরে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুরের ঐতিহ্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়। মসলিন ছাড়াও দারু শিল্প, হাতির দাঁতের শিল্প, মৃৎশিল্প, কাগজ শিল্প, অলংকার শিল্প, মাদুর শিল্পের প্রসার ঘটেছিল।

জানা যায়, সতাল ও বৌলাইয়ের কারুকার্যময় শাঁখা ও হাতির দাঁতের তৈরি শৌখিন জিনিস জমিদার ও আমির-ওমরাদের ঘরে শোভা পেত। কুলিয়ারচর ও কাটিয়াদীর বেতাল-তারাকান্দিতে তৈরি কাগজ রাজা-বাদশাহদের ফরমান জারি ও দলিলপত্রাদি এবং পুঁথি লেখায় ব্যবহৃত হতো। অষ্টগ্রামের শীতলপাটির যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে সমাজ বিবর্তন ও আধুনিকায়নসহ দেশি-বিদেশি কোম্পানির আধিপত্যে এসব শিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে।

বর্তমানে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কামালিয়ারচরে বেশকিছু পরিবার তাঁতের কাপড় তৈরি করছে। তাদের তৈরি তাঁতের শাড়ি বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে। এখানে প্রায় ৫০টি তাঁতের কল স্থাপিত হয়েছে। ফলে এ পরিবারগুলো স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। অনেকের অভিমত, এরা সরকারের আনুকূল্য পেলে এখানে একটি তাঁতপল্লী সহজে গড়ে উঠবে। আশুতিয়া ও গকুলনগরে চুমকি, পুঁতির কারুময় শাড়ি তৈরি হচ্ছে। এখানকার কয়েকশ পরিবার এ শিল্পের সাথে জড়িত। কটিয়াদী উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের মণ্ডলভোগ গ্রামে বেনারসি পল্লী গড়ে উঠেছে। নিকলীর সূত্রধর পাড়ায় তালপাখা শিল্প এবং ইটনার সেকান্দনগর ও হাতকবিলা এবং নিকলীর নাগরপুরে বিকশিত হচ্ছে চিংড়ি আহরণের 'চাঁই' শিল্প।

তবে কৃষিপ্রধান এ জেলায় বর্তমানে পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, কটিয়াদীসহ বেশ কয়েকটি উপজেলায় সবজি চাষে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় উর্বর মাটির কারণে সবজি চাষ বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। এখানকার কৃষকরা ধান, পাট, গম ছাড়াও ব্যাপক পরিমাণে সবজি চাষের দিকে ঝুঁকে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছেন। তারা এখন চিচিঙ্গা, কাকরোল, ঢেঁড়শ, কপি, আলু, বেগুন, শিম, মুলা, শসা, পটল ইত্যাদি চাষ করে তাদের জীবনের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছেন। এখানকার উৎপাদিত সবজি ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে চালান হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় এসব সবজি প্রতিদিন ট্রাকযোগে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যাচ্ছে। তাদের জীবন-জীবিকায় দিনবদলের হাওয়া লেগেছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণে স্বাস্থ্যসচেতনতা ও শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা যায়, সবজি চাষ এ অঞ্চলের কৃষকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক জীবনকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। অনেকের অভিমত, সহজলভ্য ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা চালু করা গেলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাবেন।

পোল্ট্রি ক্ষেত্রেও এ জেলায় ইতোমধ্যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে বাজিতপুর-কুলিয়ারচরে ব্যাপক হারে পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে উঠেছে। এখানকার তরুণ ও যুবকেরা এক্ষেত্রে তাদের জীবিকা খুঁজে পেয়েছে। আফতাব বহুমুখী ফার্মের অবদান এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো।

কিশোরগঞ্জে নব্বইয়ের দশক থেকেই কৃষিনির্ভর বেশকিছু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ধান মাড়াইকল, গম ও ভূট্টা মাড়াইকল এবং পাওয়ার টিলার তৈরি হচ্ছে। এসব কৃষিযন্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে কৃষকদের মাঝে। জেলা শহরের একরামপুর ও সতাল এলাকায় গড়ে উঠা এসব কারখানায় কাজ করছে বহু বেকার।

সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে জানা গেছে, তাদের তৈরি যন্ত্রপাতি বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রতিটি জেলা ছাড়াও বগুড়া, ফরিদপুর, বরিশাল ও অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা পূরণ করছে। বর্তমানে এ শিল্প খাতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে।

কিশোরগঞ্জের অর্থনীতির আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে- জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে শত-শত মেলা, ওরশ ও উৎসবের আয়োজন আর খাদ্য ও গ্রামীণ সামগ্রীর ব্যবসা। স্থানীয় শিল্পীরা এসব উৎসবের মাধ্যমে সারা বৎসরের আয়-রোজগার করে। কিশোরগঞ্জ শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠের দুই ঈদের জামাত, অষ্টগ্রামের মহরম, কটিয়াদীর কুড়িখাইর মেলা, রথের মেলা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উপলক্ষে কয়েক দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে খাদ্যদ্রব্য এবং বহুধরনের গ্রামীণ সামগ্রী বেচাকেনা হয়। একইসঙ্গে পালা-পার্বণ-মেলা উপলক্ষে নাচ-গান-যাত্রা-পুতুল নাচ-সার্কাস ইত্যাদি গ্রামীণ সংস্কৃতির আয়োজনের মাধ্যমে শত শত পরিবার অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিশোরগঞ্জের গ্রামীণ লোকশিল্পীদের ভূমিকা সারাদেশে প্রশংসিত ছিল। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি আর আকাশ-সংস্কৃতির আগ্রাসনে এসব গ্রামীণ-লোকজ শিল্প-সংস্কৃতি কেবল হারিয়েই যায়নি, এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও অনেকটা লোপ পেয়েছে। বেকার হয়ে গেছেন শত-শত শিল্পী।

Dhaka University Institutional Repository

তীব্র পালাবদল ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এগুচ্ছে। কিশোরগঞ্জও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে দেশের অনেক স্থান যেমনভাবে নানা ধরনের শিল্পের আওতায় এসেছে বা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মানুষ যেভাবে বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পেরেছে, কিশোরগঞ্জের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি। কিশোরগঞ্জ কৃষি অর্থনীতির অঞ্চল ছিল এবং বর্তমানেও কৃষিনির্ভর নানা উৎপাদনের মাধ্যমেই মূলত অর্থনীতি ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ সাধন করে চলেছে। এক্ষেত্রে কৃষি, শস্য, হাঁস, মুরগি, গবাদিপশু এবং পশুজাত দুগ্ধ, ডিম ও খাদ্যের শিল্পায়নের অপার সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে কিশোরগঞ্জের জন্য। এই কৃষি উন্নয়ন আর কৃষির শিল্পায়ন করা সম্ভব হলে কিশোরগঞ্জ এবং এর জনগণের অর্থনৈতিক ভাগ্যে সমৃদ্ধির নবসূর্য উদিত হবে।

কিশোরগঞ্জ জেলার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় হাট-বাজারকে কেন্দ্র করে। জেলার উল্লেখযোগ্য কিছু বাজার হলো: বাজিতপুরের বাজিতপুর বাজার, সরারচর, হিলচিয়া, পিরিজপুর, ভাগলপুর ও দিঘিরপাড়; কটিয়াদীর কটিয়াদী বাজার, করগাঁও, আচমিতা, মসুয়া, ধুলদিয়া, গচিহাটা ও মানিকখালী; হোসেনপুরের হোসেনপুর বাজার, রামপুর, পিতলগঞ্জ, গোবিন্দপুর ও পুমদী; করিমগঞ্জের করিমগঞ্জ বাজার, নিয়ামতপুর, জাফ্রাবাদ, জঙ্গলবাড়ী ও গুজাদিয়া; অষ্টগ্রামের অষ্টগ্রাম বাজার, বাবুবাজার, কাস্তুল, খয়েরপুর আব্দুল্লাহপুর, আদমপুর ও বাঙালপাড়া; ইটনার ইটনা বাজার, ধনপুর, জয়সিদ্ধি, উয়ারা, এলংজুরী, বাদলা ও থানেশ্বর; কুলিয়ারচরের কুলিয়ারচর বাজার, আগরপুর, লক্ষ্মীপুর, জাফরাবাদ, ডুমরাকান্দা ও প্রতাপনাথ; তাড়াইলের তাড়াইল বাজার, জাওয়ার, পুরুড়া, বানাইল, তালজাঙ্গা, দামিহা, কাজলা ও রাউতি; পাকুন্দিয়ার পাকুন্দিয়া বাজার, কালিয়াচাপড়া, মঠখলা, বুরুদিয়া, সুখিয়া, কোদালিয়া, হোসেন্দি, নারান্দি, আশুতিয়া, পাটুয়াভাঙ্গা, তাড়াকান্দি, হর্ষি ও দগদগা এবং কিশোরগঞ্জের কাচারি বাজার, পুরান থানা, বড়বাজার, নীলগঞ্জ, সাদুল্লারচর, বিন্নাটি, কালটিয়া, বৌলাই, যশোদল, চৌদ্দশত ও শোলাকিয়ার গরুরহাট।

পেশা, বৃত্তি ও অর্থনৈতিক কর্মের নিরিখে কিশোরগঞ্জে বিভিন্ন শ্রেণি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এক সময় খুবই স্পষ্টভাবে ছিল। এই শ্রেণি যেমন হিন্দুদের মধ্যে ছিল, মুসলমানরাও বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রী কেদারনাথ মজুমদারের লেখা থেকে বিস্তারিত জানা যায় যে, তখনকার দিনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ, ভড়, ভুইমালী, বিন্দ, ধোপা, চামার, ডোম, দোসাদ, গণবর, গন্ধবণিক, গোব, যোগী ও যুগী, কৈবর্ত, কাহার, কামার ও লোহার কপালী, করণী, কায়স্থ, কেরী, কুমার, কুরমী, মালাকার, মাল, মুচি, নমশুদ্র, নুনিয়া, নাপিত, পাটিকার, পাটুনি, রাজবংশী, রাজহর, রাজদূত, সুবর্ণবণিক, সুতার, তাঁতি, সাহা, তেল ও তিয়র। আর মুসলমানদের মধ্যে ছিল জোলা, দাই, বাদিয়া, খান, কসবি, কলু, মাইফরস, নাগারচি, মুঘল, পাঠান, শেখ ও সৈয়দ।

৪.২ শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প ও বাণিজ্যের সম্ভাবনাময় এক জনপদের নাম কিশোরগঞ্জ। এ জেলার অতীত ইতিহাসও শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির ঐতিহ্য বহন করে আসছে। মুঘল আমলে বাংলাদেশের এক সময়কার বিশ্বখ্যাত উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরীর জন্য জেলার বাজিতপুর উপজেলা ছিল অন্যতম। কিশোরগঞ্জ জেলায় বৃহৎ শিল্প কারখানা বেশী না থাকলেও মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য এ জেলার খ্যাতি রয়েছে। কিশোরগঞ্জের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নরূপ:[১১]

১। কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিলস- ব্যক্তি মালিকানাধীন, যশোদল, কিশোরগঞ্জ।

২। জেমিনি টেক্সটাইল মিলস- ব্যক্তি মালিকানাধীন, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ।

৩। কুলিয়াররচর কোল্ড স্টোরেজ লিঃ- ব্যক্তি মালিকানাধীন, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

৪। কুলিয়ারচর বাদাম মিল- ব্যক্তি মালিকানাধীন, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

৫। আফতাব হ্যাচারী লিঃ- ইসলাম গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান, ভাগলপুর, বাজিতপুর।

৬। আফতাব পোল্ট্রি ফিড মিল- ইসলাম গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান, ভাগলপুর, বাজিতপুর।

৭। আফতাব পোল্ট্রি ড্রেসিং প্লান্ট- আফতাব গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান, ভাগলপুর, বাজিতপুর।

৮। পঁচা ফিড মিল- বেতিয়াকান্দি, কুলিয়ারচর (আলমগ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)।

৯। কুলিয়ারচর ডেইরী কমপ্লেক্স (কিষাণ চিজ মিল)- পূর্ব গাইলকাটা, কুলিয়ারচর।

এছাড়াও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মারিয়া নামক স্থানে বিসিক শিল্প নগরীতে বেশকিছু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। এটি কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে মারিয়া নামক স্থানে ২০.৬০ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মোট ১৫০টি প্লটের এ শিল্প নগরীর জমি অধিগ্রহণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ সালে। নগরীটি সূচনার পর থেকে নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এখানকার কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তাদের একান্ত আগ্রহে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে গড়ে উঠেছে টেরি টাউয়েল ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড এক্সপোর্ট এর তৈরি পণ্য ইইউ, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় রফতানি করছে। বস্ত্র শিল্পের জন্য মেরাজ টেক্স লিমিটেড, মারকো ফ্যাব্রিকস লিমিটেড ও ইফাজ ব্লিচিং অ্যান্ড ডাইং ছাড়াও গড়ে উঠেছে ভার্গো ফ্যাশন লিমিটেড। এখানকার এমএম খান ফুড (ম্যাক), এশিয়া ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরি, বিকাশ ফুড, পূবালী ফুড ও আজহার ব্রেড জেলা শহর ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এখানকার শাহজাহান মেটাল ওয়ার্কস, ইনতেখার এন্টারপ্রাইজসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সুনামের সঙ্গে তাদের পণ্য উৎপাদন করছে।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে দেশীয় লাগসই প্রযুক্তির ইস্পাতনির্মিত নৌযান তৈরির ডকইয়ার্ড গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক সময়ে। একসময় বাজিতপুরে পাতাম নৌকা প্রসিদ্ধ ছিল। এগুলোতে প্রধানত ধান পরিবহন করা হতো। সময়ের পরিবর্তনে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এর পরিবর্তে এখন ইস্পাতনির্মিত নৌযান

তৈরি হচ্ছে। বাজিতপুরের পৌরসভা সদর, দিঘিরপাড়, কৈলাগ এসব স্থানে ডকইয়ার্ড গড়ে উঠেছে। এরসাথে নির্মাণশিল্পী ও পরিবহন কর্মীরা ব্যাপক হারে জড়িত রয়েছেন। জানা গেছে, প্রত্যেকটি ইস্পাতনির্মিত নৌয়ানের মূল্য ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা।[১২] এ খাতে এখানে শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে।

স্থানীয় প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত ধান মাড়াইকলের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে। জর্দা ফ্যাক্টরী, ব্যাটারী ফ্যাক্টরী, বেকারী, চানাচুর কারখানা, আগরবাতি, মোমবাতি কারখানা, বিড়ি ফ্যাক্টরী, সরিষার তেল কারখানা, আটা-ময়দা ফ্যাক্টরী এ অঞ্চলের শিল্প সম্ভারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ভৈরব নদীবন্দর, চামটা নদীবন্দরও এ অঞ্চলের নদী বিধৌত হাওর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ঝিনুকের খোল দিয়ে মেশিনের সাহায্যে হাঁস-মুরগীর খাবার তৈরী করার পাশাপাশি নানাধরনের বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। তাছাড়া কিশোরগঞ্জ জেলায় শাড়িতে চুমকির কারুকার্য বসানোর এক নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। যা এ জেলার পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর ও বাজিতপুর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা ঘরে বসে করে থাকে।

কিশোরগঞ্জে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলতে হলে ক'জন সফল ব্যক্তির নাম বলতেই হবে। কারণ তারা ব্যবসা করে কেবল নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন করেননি, তাদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা অর্জন ও অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই জেলাবাসী তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এদের মধ্যে শিল্পপতি মরহুম জহুরুল ইসলাম অন্যতম।

পাকিস্তান আমলে ২২ শিল্পপরিবারের তিনি অন্যতম ছিলেন। বাজিতপুর উপজেলার ভাগলপুর গ্রামের এ পরিবারটি 'ইসলাম গ্রুপ' নামে সুপরিচিত। শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম শিল্পায়ন, গৃহায়ণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণশৈলী ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছেন, যা জাতির কাছে গর্বের বিষয়। তিনি '৬০-এর দশকে বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম হাউজিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের বাইরে শ্রমজীবী মানুষ প্রেরণ করেন। আজ সারাদেশে গৃহায়ণ ব্যবসায় যে বিপ্লব ও দেশের বাইরে যে মানবসম্পদ যাচ্ছে তার পথিকৃৎ মরহুম জহুরুল ইসলাম। বর্তমানে ইসলাম গ্রুপ এবং তাদের পরিবারের প্রতিষ্ঠিত 'আফতাব গ্রুপ' ও 'নাভানা গ্রুপ' ছাড়াও কুলিয়ারচরের 'আলম গ্রুপ' ও 'কুলিয়ারচর গ্রুপ'সহ বেশ কয়েকটি গ্রুপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পাঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এদের অবদান স্মরণীয়।

৪.৩ ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন শিল্প

তাঁত শিল্প

তাঁতের কাপড়ের কদর সবসময়ই ছিল। একসময় তাঁতের তৈরি কাপড়ই ছিল সাধারণের বস্ত্র। সাধারণত হিন্দু তাঁতি, যোগী ও মুসলমান জোলারা তাঁতের কাপড় বুনে থাকে। একসময় কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় তাঁতের কাপড় তৈরি হতো। বিশেষ করে বাজিতপুরের তাঁতের শাড়ি ঢাকার মসলিনের সমতুল্য ছিল।

বাজিতপুরের নকশি পাড়ের দামি শাড়ি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিদেশে রফতানি হতো। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ীতেও এ শিল্প গড়ে উঠেছিল। লুঙ্গি, গামছা ও কমদামের কাপড় এখানে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল।[১৩] পরে ইংরেজদের প্রভাব ও শাসনের কারণে স্থানীয়ভাবে তুলা উৎপাদন ও সুতা কাটা ব্যাহত হয়। স্থানীয় তাঁতিদের ইল্যান্ড থেকে আমদানি করা সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করতে বাধ্য করা হয়। ফলে তাঁতের ঐতিহ্য লুপ্ত হতে শুরু করে। বর্তমানে কিশোরগঞ্জের কামালিয়ারচর গ্রামে ও কাপাসার্টিয়ায় বেশ কিছু তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে। এখানকার কারিগরদের তৈরি শাড়ি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বিভিন্ন শহরে ব্যাপকহারে বিক্রি হয়।

ঘর-বাড়ি-শিল্প বা নির্মাণ শিল্প

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শিল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ঘর-বাড়ি-শিল্প বা নির্মাণ শিল্প। সৌখিন মানুষের ঘর-বাড়ি নির্মাণে ছিল আভিজাত্যের ছাপ। আর এজন্য তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন নির্মাণ কারিগর শ্রেণির।একসময় এ অঞ্চলে বাঁশ, বেত ও খড়ের তৈরি ঘরের পরবর্তীতে টিনের তৈরি সৌখিন ঘরের প্রচলন দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য গ্রামাঞ্চলেও আধা-পাকা, পাকা ও বহুতল দালানের প্রচলন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে নির্মাণ কারিগরদের মধ্যে প্রাথমিক দিকে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন 'ছাপরবন'। পরবর্তীতে আসে কাঠমিস্ত্রি শ্রেণি ও বর্তমানে রাজমিস্ত্রি। কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে কথায় কথায় প্রবাদ বলে- "ছাপরবনের টুই উদাম"। আর এই ছাপরবন কারিগর শিল্পীরাই এককালে এ জেলার সৌখিন নির্মাণ কাজগুলো করেছিল। তবে তাদের নিজেদের বাড়ি ঘরের অবস্থা ভাল ছিলনা বলেই তাদের প্রতি এ প্রবাদ বলা হয়ে থাকে। আজকের যুগে দালান বাড়ি তারও আগে টিন কাঠের ও পূর্বে বাঁশ-বেত, শন/ছন/বন/হলদে খড়ের ঘর থেকে শুরু করে সৌখিন বাংলা ঘর তৈরি করতেন। এককালে মাটির ঘরও ছিল। এখনও এ জেলার পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, কটিয়াদী ছাড়াও জেলা সদর কিশোরগঞ্জ শহরস্থ খড়মপট্টি জোড়া পুকুর পাড়ে একটি বাসা বাড়িতে মাটির ঘর দেখতে পাওয়া যায়। উজান-ভাটির-হাওর অঞ্চলে এককালে টিন কাঠের তৈরি দ্বিতল, ত্রিতল বাড়িঘর দেখা যেত।[১৪]

তবে এখনও কিছু কিছু পূর্বের তৈরি দ্বিতল, ত্রিতল বাড়িঘর পুরোনো স্মৃতি হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যেমন বাড়ছে ইট, সুরকি, রড, সিমেন্ট, বালির ব্যবহার তেমনি কিশোরগঞ্জের লৌকিক গৃহনির্মাণ শিল্পের চিরায়ত উপকরণ বাঁশ-বেত, কাঠ, টিন, ছন-বন, নলখাগড়া, ইকর, পাটশোলা, তালপাতা, তালগাছ, সুপারিগাছ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পূর্বে বাড়িঘর বলতে- কাচারি বাড়ি, বাইরঘর , বৈঠকঘর, রান্নাঘর, বাংলাঘর, গোয়াইল ঘর, জুম্মাঘর, মণ্ডপঘর, আর্চালা ঘর, নাটমন্দির, ঢেঁকিঘর, আঁতুর ঘর, আটচালা ঘর, চৌয়ারী ঘর, দু'চালা ঘর, বারোয়ারি ঘর, চারচালা ঘর, চৌচালা ঘর, চৌকারি ঘর ইত্যাদি নামকরণে বাড়ি-ঘর নির্মিত হতো। আর এসব নির্মাণশিল্পীদের বলা হতো 'ছাপরবন'।

বাড়ির বড় আঙ্গিনাকে বলা হয় উঠোন, যা স্থানীয় ভাষায় 'উডান' । সাধারণত কিশোরগঞ্জের বাড়িঘরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে বাঁশের তৈরি ঝাঁপ বা ভেলকির কারুকার্যে ছাপরবনদের বিকল্প নেই । গৃহগুলোর বেড়া জাতীয় দেয়াল তৈরিতে আজও ছাপরবনদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য । একসময় দরজা-জানালা, দরং-দেউরি-জাফরি-ঝাঁপ-ভেলকি ইত্যাদিতে যারা অলংকরণ কাজ করত তাদেরই ছাপরবন বলত । বিশেষ আলপনা চিত্রে সুন্দিবেত দ্বারা সুদক্ষ হাতের সুনিপুন লতা-পাতা-ফুল নকশা করা কাজ আজও তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার পীর সাহেব বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় । বর্তমানে অবশ্য ইট, কাঠের তৈরি বাড়ি-ঘরের আধিক্যই বেশি । কিশোরগঞ্জের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘরের নাম 'জুইতের ঘর', অন্যটির নাম 'জলটুঙ্গি ঘর' আজও বিখ্যাত । কিশোরগঞ্জের বত্রিশ এলাকার প্রামাণিক বাড়ির দিঘিতে প্রতিষ্ঠিত জলটঙ্গি নামক ঘরটির অতীত স্মৃতি চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায় ।[১৫]

নকশি কাঁথা

সাধারণত কাঁথা গ্রাম বাংলার মেয়েদের শিল্প । কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে বাংলার গ্রামীণ মহিলা শিল্পীরা এ কাজ করে থাকে । নকশিকাঁথার কাঁচামাল হলো পুরানো শাড়ি ও শাড়ির পাড় থেকে আহরিত রঙিন সুতা । কিশোরগঞ্জের কাঁথায় আছে রং এর উজ্জ্বলতা এবং বাটিকের সাবলীলতা । কাঁথার মটিফ কিন্তু ধার করা নয় । সমাজেরই পরিপার্শ্বিকতা থেকে তা নেওয়া । হিন্দু-মুসলমান ভেদে কিশোরগঞ্জে মুসলিম রমনীদের কাঁথাশিল্পে অবদান বেশি । নকশিকাঁথা নানা ধরনের হয়ে থাকে । যেমন: লেপ কাঁথা, সুজনী কাঁথা, নকশি থলে, বর্তন ঢাকনী, রুমাল কাঁথা, দস্তরখান, আরশীলতা, বালিশের কভার, পান প্যাচনী, জায়নামায কাঁথা, থলে, বোচকা কাঁথা, পবিত্র কুরআনের গিলাফ ইত্যাদি ।[১৬] হিন্দু রমনীদের তৈরি কাঁথা সাধারণ সাজ-সজ্জা আর মুসলিম নারীদের কাঁথাগুলো শিল্পজাত লোকজশিল্প । কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চল থেকে উঁচু এলাকায় নকশিকাঁথার প্রচলন বেশি এবং কারুকাজের দিক থেকেও অনেক পার্থক্য । বর্তমানে এ শিল্প আধুনিকতার চাপে অবলুপ্তির পথে । হয়ত কোন কোন সৌখিন লোকের ঘরে দু'একখানা কাঁথা আজও টিকে আছে ।

বাঁশ-বেত শিল্প

শহরের কিছু দালান কোঠা বা আধা পাকা বাড়ি ছাড়া কিশোরগঞ্জের সর্বত্রই বাঁশ ও বেতের প্রচলন রয়েছে । বলতে গেলে বাঁশ-বেত ছাড়া গ্রামীণ জীবন অচল । কিশোরগঞ্জ, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, করিমগঞ্জ, কুলিয়ারচর, এমনকি ভৈরব উপজেলার মানিকদী গ্রামে এখনও প্রচুর বাঁশ জন্মায় । ভৈরব উপজেলার একটি জনপদের নাম রয়েছে 'বাঁশগাড়ি' । ঘরবাড়ির কারুকীর্তির উৎস ঝাপ, বেড়া, দরজা, ভেলকী ইত্যাদি । যারা ঘরের উপরোক্ত জিনিস তৈরি করে তাদের বলা হয় 'ছাপরবন' (ঘরামি) ।[১৭] কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে স্বচ্ছল গৃহস্থ পরিবারে এক সময়ে ঝাপ, দরজা বা ভেলকির প্রচলন ছিল । এখনও গ্রামে পুরানো দিনের বনেদী বাড়িতে এর কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায় । দরজা বা ভেলকির যে সূক্ষ্ম কাজ শুধু বাঁশ বেতের দ্বারাই হতে পারে তা চোখে দেখা ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না ।

বাঁশ বেতের আর একটি উপকরণ হলো কৃষি কাজে ব্যবহৃত কৃষকের উপকরণ যেমন- মাথাল, বিন্দার ফাল, ঢাল, ঘুটনী, কুলা, ডালা, চালনী, খাঁচা, কাঠা, সের হাতপাখা ইত্যাদি। আর মাছ ধরার জন্য উইন্যা, চাই, বানা, ডুলা, খলুই ইত্যাদি কিশোরগঞ্জের প্রতি অঞ্চলেই বহুল প্রচলিত। কিশোরগঞ্জে অনেক গ্রামের নাম পাওয়া যায় বাঁশহাটি। দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য বাঁশের ঝাঁড়। বাঁশ বেতের পাটি এবং মুত্তার বেতের পাটিও একসময়ে প্রচুর তৈরি হতো এবং এগুলো এত সূক্ষ্ম কারুকাজ মণ্ডিত যে তা কলকাতা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বলে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সংরক্ষিত ইংরেজ কালেক্টর সাক্সির গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে। বাঁশের, বেতের জায়নামায, পাটি এবং চাটাই প্রতি অঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কিশোরগঞ্জে একটি গ্রামের নাম রয়েছে কাতিয়ারচর অন্যটি সুন্দিরবন। এতে প্রমাণ করে কাতিয়া অথার্ৎ বাঁশের চাটি অন্যটি সুন্দি বেত থেকে সুন্দিরবন নামকরণের উৎপত্তি। বাঁশ-বেত শিল্পীর শিল্প প্রতিভার উজ্জ্বলতম নিদর্শন বার বাংলার ঘর। মৈমনসিংহ গীতিকায় বার বাংলার ঘর, বাংলাঘর, বার দুয়াইর‍্যা ঘর ইত্যাদি বহুনামে এ শিল্পীদেরই জয়গান করা হয়েছে। অথর্াৎ কিশোরগঞ্জে এসব ঘর নির্মাণের কারিগরদের বসতি ছিল। এখনও তাদের উপস্থিতি কিশোরগঞ্জে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে একসময় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি হতো বাঁশ ও বেত দিয়ে। গ্রামের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বাঁশ-বেত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য জিনিসপত্র নিজের মত সুন্দর করে বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি হয়।

কারুকাজ সম্পন্ন অনেক জিনিস তৈরি হয় এর মধ্যে দারি, ছাডি, জায়নামায, পাটিশন, সিলিং, ছাই বা উনিয়া, যাকে মাছ ধরার ফাঁদ বলা হয়। খাদি, কাছা বা জাহুন, উড়া, মুড়া, ঘরের বেড়াসহ অনেক জিনিস তৈরি হয় এই বাঁশ দিয়ে। একসময় এদেশে বাঁশ শিল্পের কারুকাজ করার জন্য সম্পূর্ণ পেশাদার কারিগর ছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্লাস্টিক জাতীয় সামগ্রী আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি হওয়ায় চাহিদার অনুপাতে লোক শিল্পগুলি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। বাঁশ ও বেত শিল্পে নির্মাণ প্রক্রিয়া ও ব্যবহারকৃত হাতিয়ার এর মধ্যে প্রধান হাতিয়ার হলো দা। দা দিয়ে বাঁশ কেটে বিভিন্ন কাজে কারুকাজ দিয়ে তৈরি করে এইসব জিনিসপত্র। বাঁশ হলো এ শিল্পের প্রধান সামগ্রী।

নকশি শাড়ি শিল্প

জড়ি, পুঁতি, চুমকির বাহারি শাড়ি তৈরির বর্ণিল আয়োজন চলছে এখন কিশোরগঞ্জ জেলার অনেক গ্রামেই। এ জেলার নিবৃত পল্লীর নারীরা এ শিল্পকে বর্তমানে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। সংসারের কাজের পাশাপাশি অভাব-অনটন ঘোচাতে বাড়তি আয়ের জন্য অনেকেই একাজ করতে আগ্রহী হচ্ছেন। কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার গকুলনগর, রহিমপুর, আশুতিয়া, রামপুর গ্রামের নারীরা এখানে বাহারি শাড়ির পল্লী গড়ে তুলেছেন। এ জেলার অন্যান্য উপজেলার অনেক গ্রামের বহুসংখ্যক নারীও একাজে যুক্ত হচ্ছেন। তাদের হাতের ছোঁয়ায় টিস্যু, সুতি ও কাতান হয়ে ওঠে বর্ণিল ও অপরূপ। অধিকাংশই নারীই এ কাজে সিদ্ধহস্ত।[১৮]

অনেক নারীই তাদের পেশা হিসেবে এ শিল্পকে বেছে নিয়ে সাবলম্বী হয়েছেন। গ্রামগুলোর প্রায় প্রতিটি বাড়ির উঠানে অথবা খালি জায়গায় শাড়ির মাচান। এ গুলোতে কাজ করছেন নারীশিল্পীরা। প্রতিদিন ছয়-সাত ঘণ্টা কাজ করে সপ্তাহে একটি শাড়ি তৈরি করা যায়। এ হিসাবে মাসে তিনটির বেশি শাড়িতে কাজ করা সম্ভব নয়। ঢাকার মিরপুরের ব্যবসায়ীরা তাদের কাপড়ের যোগান দিয়ে থাকেন। তাদের চাহিদা অনুযায়ী নারীশিল্পীরা কাপড়ে নকশার কাজ করেন। পরে ওই ব্যবসায়ীরাই নকশা করা শাড়ি ঢাকায় নিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এ কাজে তাদের অনেকের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে তাতে পরিশ্রমের তুলনায় মজুরি খুবই কম।এক্ষেত্রে তাদের কোনো উপায় নেই। ব্যবসায়ীরা যে মজুরি ধার্য করেন তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাদের নিজেদের কোনো পুঁজি নেই অথবা স্বাধীনভাবে বিপণন করার কোনো সুযোগ না থাকায় তারা অনেকটাই ঢাকার ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল। অনেকের অভিমত স্থানীয় প্রশাসন, সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো কোনো না কোনোভাবে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসলে এ শিল্পে খুলবে সম্ভাবনার পথ।

কাঁসা শিল্প

কিশোরগঞ্জে একসময়ে প্রচুর পরিমাণে পিতল-তামা-কাঁসা দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহৃত হতো। এতে যেমন রয়েছে প্রয়োজনীয় বস্তু অপর দিকে রয়েছে প্রচুর সৌখিন জিনিস। যেমন- কলস, থালা, বাটি, ঘটি, বদনা, কাঠা, গাড়ু, পানপাত্র, ডাবুর, ছোলা, হুক্কা, হুক্কার স্ট্যান্ড, পুষ্প থালা, চারি, ঢাল, তলোয়ার, ঝাঁঝর, চালনী, কুলা, চামচা, হাতা, অলংকার, টুপি, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, সরতা, পাঞ্জা, ফুলদানী, আতরদানি, সুরমাদানি, গহনার বাকস, পুতুল, দেব-দেবীর মূর্তি, জীব-জন্তুর নকশা, পুতুল, বুতাম, চিরুনি, হাতের বালা, পায়ের খারু প্রভৃতি। এসব ধাতবদ্রব্য তৈরি ও কারুকাজের সাথে কার্মকার সম্প্রদায়ের ভূমিকা বেশি। একসময়ে কিশোরগঞ্জে কর্মকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বসতি ছিল। এখনও সমাজে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সমাজে পিতল-কাঁসা-তামার তৈরি দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহৃত হয় বেশি। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও এককালে এখানে মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল-থালা-বাসন-বাটি-গ্লাস-কুপি বাতি জ্বালানোর গাছা, হাতা প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো। দ্রব্যমূল্যে পিতল-কাঁসা-তামার দ্রব্যাদি এখন অনেকটা ব্যবহার কমে এসেছে। তবে হিন্দু সমাজের বিয়ে-শাদী, পূজা-পার্বণে এবং ব্যক্তিগত সংসারে এর ব্যবহার এখনও টিকে আছে।

লৌহ শিল্প

লোহার তৈরি দ্রব্য সামগ্রীর প্রায় সবগুলি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হয়। লোহার তৈরি দ্রব্য সামগ্রী ছাড়া গ্রাম-বাংলার জীবন নির্বাহ দুরূহ। লৌহজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়কে 'কামার' বলা হয়। তারা দা, বটি, কাঁচি, খন্তি, কুড়াল, কাস্তে, কোদাল, ছেনী, কাটারি, নারিকেল কুড়ানি, সরতা বা যাতি, বর্শা, বল্লম, ছুরি, রামদা, খড়গ, শাখের করাত, তলোয়ার, তারকাটা, পেরেক, পাতি প্রভৃতি নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আদিকাল থেকে কর্মকাররাই এ সমাজের মানুষের সংসারের নিত্য প্রয়োজন মিটিয়েছে।

তবে লৌহশিল্পে কিশোরগঞ্জ সমগ্র বাংলাদেশে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। কিছুদিন আগেও কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার অন্তর্গত কঁরগাও ও বাজিতপুরের লৌহ সামগ্রী সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে খ্যাত ছিল ।বিশেষ করে করগাঁও এর খড়গ ও দা-বটি, বাজিতপুরের দা-বটি-যাতির খ্যাতি সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত ছিল ।অবশ্য বর্তমানে এ শিল্পের বিলুপ্তি ঘটেছে ।তবে এখনও নিত্যপ্রয়োজনীয় লৌহ সামগ্রী কমবেশি করগাঁও ও বাজিতপুর ছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলার সর্বত্র তৈরি হয়। হোসেনপুরের কাঁচি সমগ্র বাংলাদেশে রপ্তানীসহ এর খ্যাতি রয়েছে।[১৯]

ঘরবাড়ি নির্মাণ ও নৌ-শিল্পে কিশোরগঞ্জের কর্মকারদের লৌহ সামগ্রীর চাহিদা রয়েছে। বর্তমানকালে মুসলমান কারিগররা লৌহ সামগ্রী নির্মাণে নিয়োজিত রয়েছে। অনেক হিন্দু কর্মকার শিক্ষা-দীক্ষায় পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত। ফলে মুসলিম কারিগর শ্রেণি এ সুযোগে স্থান করে নিয়েছে। মুসলিম সমাজে জনসংখ্যার আধিক্য এটিও একটি কারণ। যেকোন পেশার তাগিদেই এখন পেশা পরিবর্তন হচ্ছে। তাতে জাতি-ধর্ম, গোত্র-বর্ণের আর কোন দ্বিধা-দ্বন্ধ বা লাজ-ভয় নেই।

পটচিত্র

লোকচিত্র বা লোকজ চিত্রেরই একটি মাধ্যম হচ্ছে পটচিত্র। মোটা কাপড়ে পটচিত্র কাহিনি চিত্রের মাধ্যমে অঙ্কন করতেন। লোকচিত্রের মধ্যে পটচিত্র একটি প্রাচীন চিত্র পদ্ধতি। যারা পটচিত্র অংকন করে থাকেন তাদের বলা হয় 'পটুয়া'। কিশোরগঞ্জও 'পট' আঁকার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এখন তা বিলুপ্ত প্রায়। কিশোরগঞ্জ বিশেষকরে 'ভাটি অঞ্চলে' পটুয়াদের বিশেষ প্রভাব ছিল। পটুয়ারা সাধারণত হিন্দু আচার্য শ্রেণির ব্রাহ্মণ, তবে ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমান পটুয়াও দেখা যায়। মনে করা হয় মুসলিম আমলে এর প্রসার ঘটে। তারা সাধারণত গাজীর পট দেখিয়ে বেড়াতেন। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় আছে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ কেল্লা তাজপুরের কন্যা সখিনার চিত্র পট দেখেই প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন।[২০]

এছাড়া পটচিত্রের মধ্যে কিশোরগঞ্জ এলাকার 'রাজা হরিশচন্দ্র', 'রামায়ণের কাহিনী', 'কৃষ্ণলীলা', 'বেহুলা লক্ষ্মীন্দর কাহিনী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সমাজে গৃহস্থ বাড়িতে গৃহপালিত গরু-বাছুরের কল্যাণ কামনা, বাড়িঘরে উইপোকা ধ্বংস এবং বিভিন্ন রোগ বালাই নিবারণের জন্য কিশোরগঞ্জে লৌকিক পীর গাজীর পালার পট পালাক্রমে গীত হতো। এখন পট আর পটুয়াদের দেখা যায় না। এককালে কিশোরগঞ্জে বৈদ বা বাইন এবং গাইন নামক সম্প্রদায় শ্রেণির লোকেরা পট ব্যবসা ও পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। নাগারচি নামক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও পট চিত্রের কাহিনী গীত সুরে গ্রামে গ্রামে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বর্তমানে এসব উল্লিখিত সম্প্রদায়ের লোকেরা নানান পেশায় জড়িত রয়েছেন। পটচিত্র বা পটশিল্প এ অঞ্চলে খুব একটা প্রচলিত নয়। নিকলী উপজেলার নিকরহাটি নামক গ্রামে প্রাচীন লোক চিত্রশিল্পী ইলিয়াস সিকদার

অন্যসব চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি পটচিত্র কাপড়ে অঙ্কন করতেন।[২১] জানা যায়, এককালে কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমির প্রাচীন চিত্রশিল্প ইলিয়াস সিকদারের হাতে আঁকা ছিল। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইলিয়াস সিকদারের গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। তার হাতে আঁকা নিকলী গোড়াচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কাঠের তৈরি মডেল বা নকশা সেটিও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের সময় বিনষ্ট হয়ে যায়।

নকশি পাখা

হাত পাখা গ্রাম বাংলার ব্যবহারিক জিনিসের মধ্যে একটি। তা থেকে কিশোরগঞ্জও পৃথক নয়। গরমের দিনে প্রখর রৌদ্রে ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য গ্রামের মানুষের কাছে পাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। খরতাপ থেকে শরীর শীতল করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলেও গ্রামের মেয়েরা পাখা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকর্মও যোগ করেছেন একান্তভাবে মনের নান্দনিক তাগিদে। নিকলী দামপাড়া গ্রামে হিন্দু রমনীদের হাতে তৈরি বাঁশ বেতের পাখা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং সুক্ষ্ম কারুকার্যে বিখ্যাত। হাত পাখার উপাদানের মধ্যে কাপড়, তালপাতা, পাটি, বাঁশ, বেত, ছন, কাশ সুপারি গাছের খোল ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাপড়ে সুতা দিয়ে সূচীকর্মের মাধ্যমে তৈরি হয় এক প্রকার 'কাপড়ের পাখা' এবং পরিপার্শ্বিক নানা মটিভের সংযোজন হয়ে থাকে।[২২] বাঁশের বেত দিয়ে যে পাখা তৈরি হয় তা প্রথমে বেতকে রঙিন করে পরে বুননের মাধ্যমে নকশা অংকন করে থাকে। ছন কাশ জাতীয় পাখাও সুতার সাহায্যে যুক্ত করে জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তুলে। পাটিতে নকশা কেটে পাখা তৈরি হয়। এছাড়াও 'লেখাপাখা' বলে একধরনের 'ফুল তোলা পাখা' হয় এবং তা সাধারণত কাপড় অথবা বাঁশের বেতের বুননের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এতে সমাজ জীবনের অনেক নীতিকথা ও সুবচন উৎকীর্ণ থাকে। যেমন-

১) হাত পাখা নড়ে চড়ে,
বন্ধুর কথা মনে পড়ে।

২) সোনার হাতে রূপার পাখা,
ভুলিও না আমার কথা।

৩)সুন্দর হাতে পাখা ধর,
আস্তে আস্তে বাতাস কর।

৪) নদীর জল ঘোলাও ভাল,
জাতের মেয়ে কালোও ভাল।

৫) ফুল তোলা পাখা,
আদর সোহাগ মাখা।

৬) শীতে তুমি লুকিয়ে থাক
গরমে দাও দেখা ।
আদর করে নাম রেখেছি,
তাইত তোমায় পাখা ।[২৩]

কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে সুপারি খোলের পাখা, বাঁশের পাখা, তালের পাখা, কাপড়ের পাখা, চাটাই পাখা, সুতার পাখা, মুক্তা বেতের পাখা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এক ধরনের চিত্র পাখা, লেখা পাখা কোনোটাতে এক ধরনের মুখোমুখি দুই পাখি কোনোটাতে 'মনে রেখো' বা 'ভালোবাসা' ইত্যাদি বাণী লেখা পাখা সাধারণ মানুষের গরমের দিনের নিত্যসঙ্গী। কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে পাখাকে আঞ্চলিক স্থানীয় ভাষায় 'পাঙখা' কোথাও 'পাহা' বলা হয়। গ্রাম-গঞ্জে যেভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে তাতে আবারো ঘরে ঘরে হাত পাখার প্রচলন বা ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাংখা ও পাহা এ দু'টি শব্দই কিশোরগঞ্জের উজান-ভাটির হাওর জনপদে ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়।

নকশি পিঠা

পিঠা অতি প্রাচীনকাল থেকে সুপরিচিত। পিঠার প্রধান উপকরণ চালের গুড়োর সংগে নারিকেল, গুড়, দুধ, তালের রস, কলার রস মিশিয়ে কখনো পানিতে সিদ্ধ করে কখনো পুড়িয়ে, কখনও ভাপে দিয়ে বা তেলে ভেঁজে নানা রকম রসে বা সিরায় ভিজিয়ে তৈরি হয় উপাদেয় খাদ্যবস্তু। এমনকি ঝাল জাতীয় পিঠাও তৈরি হয়। বিভিন্ন পিঠার নামও আলাদা। যেমন- নকশি পিঠা বা পাক্কন পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ পিঠা, পুলি পিঠা, কলার পিঠা, তালের পিঠা, মেরা পিঠা, ভাপা পিঠা, ডোবা পিঠা, চ্যাপা পিঠা, পোড়া পিঠা, থামি পিঠা, ভাতপিঠা, ছিটরুটি পিঠা, পাটি সাপটা পিঠা, তিলের পিঠা, তেলের পিঠা, চাছি পিঠা, আন্দেশা পিঠা, কড়ি পিঠা, মালপোয়া পিঠা, ক্ষীরপুলি পিঠা, মালাই পিঠা, নারিকেল ভাজা পুলি, চই পিঠা, দুধ পায়েস পিঠা, লাউ পায়েস পিঠা, লবঙ্গ পিঠা, লরি পিঠা, পুতুল পিঠা, জামাই পিঠা, হলদি পিঠা, মসলা পিঠা, বড়া পিঠা, সিঙ্গারা পিঠা, দুধ চিতই, সমসা পিঠা, দুধ পুলি, সেমাই পিঠা, ঝাল শেওই, হাজারি গুড়ের পায়েস, খেজুরের রসের পায়েস, দুধ শিন্নি, দুধ বরফী, ক্ষীর, ফির্নি, নিমকী ইত্যাদি।[২৪] তবে লোকশিল্পের নিরিখে ও শিল্পকর্মের দিক থেকে নকশি পিঠাই সবার সেরা। এ পিঠা শুধুবৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু অঞ্চলে তৈরি হয়ে থাকে। নকশি পিঠার নকশার মটিফ সাধারণত লতাপাতা, ফুল, ব্যবহারিক তৈজসপত্র, মাছ, পাখি ইত্যাদি। নকশা তৈরির উপকরণ অতিনগণ্য খেজুর কাটা, সুই, মন কাটা, বাঁশের ছিলকা। এগুলোর সাহায্যে অভিজ্ঞ হাতের নিপুণতায় অতি সূক্ষ্ম দাগ কেটে বিভিন্ন নকশা করে থাকে। এসব পিঠার সুন্দর নামকরণও রয়েছে। যেমন- কাজল লতা, শঙ্খ লতা, হিজল লতা, সজনে পাতা, ভেট-ফুল, উড়িফুল (শিমের ফুল), কন্যা মুখ, জামাই মুচরা, সতিন মুচরা, সাগর দিঘি ইত্যাদি। মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যে- রসমলাই, রসগোল্লা, কাচাগোল্লা, দই, সন্দেশ, ছানা সন্দেশ, বরফি-সন্দেশ, কালোজাম, জিলাপী, মোহনভোগ, লালমোহন, ছানামূখী, চমচম, খাজা, গজা, আমেত্তি, বুন্দা, রাজভোগ, মলাইকারি।

আলপনা চিত্র

আলপনা একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রথাগত শিল্প প্রকরণ। আলপনা আঁকার জন্য প্রধান উপকরণ আতব চালের গুড়ো। বিয়ের কুলা, ডালা, ঘরের মেঝ ইত্যাদিতে আধুনিক আলপনায় রংয়ের ছোঁয়া লাগায় তা বিচিত্র রং-এ রঞ্জিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জের শহরে ও শহরতলী অঞ্চলেই আলপনার ব্যবহার অধিক, তবে থানা বা গ্রাম পর্যায়ে আলপনা আঁকা ও হয়ে থাকে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'কাজল রেখা' নামক পালা কাব্যে উল্লেখ আছে-

আলপনা আইক্যা কন্যা জ্বালে ঘরেতে বাতি,
ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল পন্নতি।
জোড়া টাইল আঁকে কন্যা আর ধান ছড়া,
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা ঘর লক্ষ্মীর পাড়া।[২৫]

আলপনার ভিতর দিয়ে গ্রাম বাংলার হাজার বছরের বঙ্গ ললনা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় তাদের ধর্মকর্মের বাইরেও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার মুক্ত বুদ্ধি বিকাশে স্বীয় চিত্ত বৃত্তির এক অপরূপ রূপ চরিতার্থতার পথ দেখিয়েছেন-এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা রান্নাঘর ছিল নারীদের শিল্পশালা, আলপনা শোভিত আঙিনা উঠান ছিল তাদের চিত্রশালা, পিড়া-বারান্দা, নামারূপ কারুখচিত সামান্য পাটের দড়ির শিকা, মাটির হাঁড়ি রঞ্জিত চিত্রিত শোভা- এ সকল ছিল তাদের চিত্র শিল্পগুণ। আলপনা যে কত ধরনের ছিল তার হিসেব মেলেনা। ফুল, ফল, লতা, পাতা, নদ-নদী, মাছ, পশুপাখি, জীব-জন্তু, চন্দ্র, তারা, সূর্য, নক্ষত্র এছাড়াও কুলাচিত্র, ঘটচিত্র, দেয়াল চিত্র, সরাচিত্র, হাঁড়ি চিত্র, ধানছড়া, কলমীলতা, পিঁড়িচিত্র ইত্যাদি। আলপনার রং এর সাথে কখনো কখনো সিঁন্দুর ও ইটের গুড়ি, কালো ছাই ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গোবর মিশ্রিত আলপনা সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে আঁকা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্রত পূজা পার্বণে সর্বদা আলপনা আঁকা হয়। লৌকিক আলপনা চিত্র গুলোই গ্রাম-বাংলার পল্লী জীবনের দৃশ্য দেখা যায়।[২৬]

পাটশিল্প

কিশোরগঞ্জে একসময়ে উৎপন্ন হতো প্রচুর পাট। আর এসব পাটের খ্যাতি ছিল ব্যাপক। নিকলী উপজেলার দামপাড়া নামক এলাকায় ইংরেজ আমলে পাটের বিখ্যাত কারখানা গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বিরলা কোম্পানি, চিটাগাং কোম্পানি, ডেবিট কোম্পানি, রেলি কোম্পানি, পরবর্তীকালে আদমজী কোম্পানি, বাওয়ানী কোম্পানি প্রভৃতি কোম্পানির পাট ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্রিটিশ আমলে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এসব কোম্পানিগুলো বিলুপ্ত। ফলে এককালে এ অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হতো বলেই পাটের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পাট শিকা তৈরীর প্রধান উপকরণ হলেও নকশি ও কারুকার্যের জন্য এতে রঙিন সুতো, পুতি, ঝিনুকের বোতাম, কড়ি এমনকি এঁটেল মাটির গোলক করে শুকিয়ে তাও ব্যবহৃত হয়।

কিশোরগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন ধরনের নকশি শিকা প্রচলিত। তা মাটির হাঁড়ি, কলসি,বোতল, ঠুলি ইত্যাদির জন্য অদ্যবধি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিকার ব্যবহারিক ও কারুকার্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন নামে অবহিত করা হয়। যেমন- কবুতর খুপী, তারাফুল, ইচার ঠ্যাং, টাকাফুল, চড়াফুল, উড়িফুল, বেঁটফুল, হিজলপাতা, কাজলপাতা ইত্যাদি। পাট শিকা তৈরির উপকরণ। শিকাগুলো সাধারণত মুঠাশিকা, নেংটা শিকা, চাক শিকা ও কড়ি শিকা নামে খ্যাত ও পরিচিত। কিশোরগঞ্জের সর্বত্র শিকা ব্যবহৃত হয়।

কাগজ শিল্প

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কিশোরগঞ্জে স্থানীয়ভাবে কাগজ তৈরি হতো। কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান পাটের সংগে শামুক বা ঝিনুকের চুনের মিশ্রণ দেওয়া হতো। কাগজশিল্প অষ্টগ্রামে একটি বিরাট কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

সম্ভবত কাঁচামালের সহজলভ্যতাই প্রধান কারণ। এখানে শামুক, ঝিঁনুক ও পাট পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। অষ্টগ্রামে এককালে অনেক ঘর 'কাগজী' নামক সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে বসবাস করত। তাদের বসতি থেকেই অষ্টগ্রামে 'কাগজী গ্রাম' নামে একটি প্রাচীন জনপদ রয়েছে। নামের শেষে অনেকেই 'কাগজী' পদবি ব্যবহার করেন। অনেকে অন্য পেশায় চলে যাওয়ায় এ শিল্প এখন বিলুপ্ত প্রায়। কাগজ শিল্পের ইতিহাস পাঠে যতদূর জানা যায়- মুঘল আমলে ঢাকার নওয়াব ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তিনি সরকারি মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ তৈরির জন্য বাংলাদেশে 'কাগজী' সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোককে এনে সে সময়ে ঢাকায় তাদের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করে দেন। উদ্দেশ্য এদের দিয়ে এ অঞ্চলের উপকরণ দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি করানো এবং এটাকে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করা। আর তখন থেকে শুরু হলো ঢাকাসহ তার আশেপাশের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কাগজ তৈরির কারখানা।

পাটি শিল্প

পাটির ব্যবহার গ্রাম বাংলার সর্বত্র রয়েছে। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলায় পাটির ব্যবহার ব্যাপক হারে লক্ষণীয়। কারণ বাঁশ বেতের পাটি এবং মুত্তার বেতের নকশি বা শীতল পাটি এক সময়ে কিশোরগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো। নকশি পাটি, শীতল পাটি, মুত্তারার পাটি, জায়নামায পাটি, আসন পাটি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দোকান ঘরের পাটি, চাটি, চাটাই, বিছানার পাটি, কাতিয়া, কাইত্যা, কিশোরগঞ্জের প্রতি উপজেলা অঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাটি আর পাখার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। নল-বাঁশ-বেত হলো পাটি তৈরির উপকরণ। এতে সুতার ব্যবহার নেই। গাছপালা, ঘর-বাড়ি, লতাপাতা, জ্যামেতিক বিচিত্র নকশা মসজিদ-মন্দির, হাতি-ঘোড়া, মক্কা শরিফ-মদিনা শরিফ ছাড়াও নানান রঙের তৈরি পাটি পাওয়া যায়। কিশোরগঞ্জ জেলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় বিয়ের আসরে পান-চিনির সাথে শীতল পাটি বা নকশি পাটি অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার রীতির প্রচলন রয়েছে।

আজকাল কিশোরগঞ্জে প্রচুর বাঁশ-বেতের 'চাটি-পাটি' বা চাটাই তৈরি হয়। বিশেষ করে সরারচর ও কুলিয়ারচর এলাকায় তৈরি চাটি-পাটি-চাটাইগুলো রেল ষ্টেশন থেকে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জে একটি জনপদের নাম 'কাতিয়ারচর' এখানে এককালে প্রচুর পরিমাণে 'চাটি-পাটি' তৈরি হতো। চাটিয়াকে স্থানীয় ভাষায় কাতিয়া বা কাত্যা বলে। আজও এ অঞ্চলে অনেক বাঁশের ঝাড় চোখে পড়ে। বাংলাদেশে যে কয়টি জেলায় শীতল পাটি তৈরি হতো তার মধ্যে কিশোরগঞ্জ অন্যতম।

শোলা শিল্প

ভাটি কিশোরগঞ্জের নিম্ন জলাভূমিতে এককালে প্রচুর শোলা জন্মাতো। স্থানীয় হিন্দু-ব্রাহ্মণ ও মালাকারেরা এ কাজে পারদর্শী ছিলেন। শোলার উপরের ছাল ফেলে দিয়ে ভিতরের সাদা অংশ বের করে নিয়ে বিভিন্ন আকারের টুকরো করে নানা জীবজন্তুর আকৃতি তৈরি করত।

এগুলোর মধ্যে ময়ুর, তোতা পাখি ও কুমির অন্যতম। এছাড়া হাতপাখা, হাতী,ঘোড়া, দেব-দেবীর মূর্তি, অলংকার, বিয়ের বর ও কনের জন্য টোপর, মুকুট ইত্যাদি। শোলার কাজ মালাকারদের একটি বংশগত পেশা। নিকলী উপজেলার স্থানীয় ব্রাহ্মণ আচার্য শ্রেণির লোকেরা এ পেশায় বংশানুক্রমে করে থাকে। নরেন্দ্র মোহন আচার্য, ধীরেন্দ্র মোহন আচার্য করণ্ডী চিত্র তৈরির পাশাপাশি শীত মৌসুমে আকাশ প্রদীপ, দুর্গা মূর্তি, শীতলী মূর্তি, মনসা মূর্তিসহ বাড়ি ঘরে ও নৌকার সামনে রঙের কাজ করে। শোলা এখনও হাওর অঞ্চলের আশেপাশের জলাভূমিতে জন্মায়।

স্বর্ণ ও শঙ্খশিল্প

অলংকার বা গহনা ব্যবহারের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। স্বর্ণ সকল জাতি-ধর্ম গোত্র-বর্ণেরপুরুষ কিংবা নারী ব্যবহার করেন। কিন্তু শঙ্খ বা শাখা সামগ্রীর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কার-কুসংস্কার জড়িত। নববিবাহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কনেরা বিবাহ উত্তর দু'টি প্রতীক হচ্ছে 'সিথির সিঁদুর' এবং হাতের শঙ্খ শাখা বা বালা। এই শাখা বালা শ্বেত পবিত্র এবং হিন্দু ধর্মীয় বিবাহের বন্ধনের প্রমাণ প্রতীক চিহ্ন। প্রাকৃতিক বা সামদ্রিক শঙ্খ থেকে স্বর্ণকার বা শাঁখারি-শাখারু সম্প্রদায় আঙ্গুরীয়, ড্রোস, হেয়ার ক্লিপ, মঙ্গল ধ্বনি ইত্যাদি তৈরি করেন। ঢাকার বর্তমান শাঁখারি পট্টির শাঁখারিরা কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ও সদর উপজেলার বয়লা নামক এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীকালে তারা স্থান পরিবর্তন করেন। দেওয়ান ঈসা খাঁ'র আমলে অনেক স্বর্ণকার ও শাঁখারি এ অঞ্চলে শরণার্থী হয়ে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের পেশার স্থায়ীত্বকরণ আবারও স্থান পরিবর্তন করে ঢাকায় গিয়ে বসতি নির্মাণ করেন।

অলংকার শিল্প

অলংকার দ্বারা দেহ সাজিয়ে রূপ চর্চা করা পৃথিবীর প্রতিটি সমাজেই বিদ্যমান। আধুনিক অলংকার দ্বারা সজ্জাকরণ মানুষ প্রথমেই শিখেনি। প্রাচীনকালে মাটি পুড়িয়ে, তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, কড়ি, শঙ্খ, ঝিঁনুক, ফলের বীচি এমনকি জীবজন্তুর হাড় দিয়েও সুন্দরীদের লাবণ্য বৃদ্ধি করা হতো। কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে হাওর জনপদে আজও লোক অলংকার ব্যবহার এর প্রচলন রয়েছে।

শরীরের আটটি অঙ্গ-মাথা, নাক, কান, গলা, বাহু, হাতের কব্জি, কোমর ও পায়ে আট অলংকার পরার রীতি ছিল এদেশে। নববিবাহিত বধূর চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বেঁণী সদৃশ্য, সিঁথিপাটি, টিকলী, টায়রা, মাপা প্রভৃতি নামে আটাশ রকমের মাথার অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। কানের সৌন্দর্য চর্চায় মণি-মুক্তাখচিত কুন্তন, মাকড়ি, ঝুমকা, কানপাশা, হীরামঙ্গল কড়ি, বালি, কর্ণফুল, লকন, নবরত্ব প্রভৃতি ত্রিশ রকমের অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। মাঝেমধ্যে যৌগিক গহনা 'চক্রাবালি' পুরো কান জুড়ে রাখে। নাকে নথ, বোলাক, ত্রোলক, বেশর নথ, নাকফুল, ফুরফুরি প্রভৃতি। গলায় হাঁসুলি, সাতনরী, টাকার ছড়া, মোহনমালা, রত্নহার, পুষ্পহার, গ্রীবাপত্র, সীতাহার, চম্পাকলি, নওরত্ব, বাগানহার, মুক্তার মালা প্রভৃতি। হাতের বাজুতে পরিধেয় অঙ্গদ, তাগা, কেয়ূর, মাদুলি, বাজুবন্দ, মৌলান, তাবিজ প্রভৃতি। হাতের কব্জিতে পরিধেয় বলয় বা বালা, বাহুতি, কঙ্কন, চুড়ি, পাত্রী, কড়া, মান্তাশা, পাইচি, রত্নচূড়, গাহিয়া হস্তপদু প্রভৃতি।[২৭] হাতের আঙ্গুলে আরশী, দুলা, আঙ্গুষ্ঠার, শাহলামী, আনওয়াজ এবং গনরত্নের আংটি প্রভৃতি। কোমরে বিছা, চন্দ্রহার, কিঙ্কিনী, মেখলা। পায়ে ঝাঁঝর, নূপুর, খাড়, ঝাঁক খাড়, পায়েল, পায়জোড়, আংটি, তোড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীর দেহে সকল প্রকার অলংকার পরিধান নিষিদ্ধ।

ট্রাঙ্ক শিল্প

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে এককালে ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র কারখানা ছিল। এসব কারখানা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য একসময় উল্লেখযোগ্য হারে এর ব্যবহার ও বিক্রি ছিল। কিশোরগঞ্জ জেলার সকল অঞ্চলের মানুষদের বিয়ে-শাদি ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বর্তমান গৌরাঙ্গ বাজার এলাকার বিভিন্ন দোকানে পাইকারি ও খুচরা মূল্যে বিক্রি হতো। বিশেষ করে রঙিন বা আল্পনা আঁকা ট্রাঙ্কগুলোর নয়নাভিরাম দৃশ্য এখনো অনেকের মনে পড়ে, নজর কাড়ে। ট্রাঙ্কের ব্যবহার ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও অনেকের বাসা বাড়িতে আজও সেই আমলের জিনিস যত্নের সাথেই রক্ষিত আছে। ট্রাঙ্কের দোকান গুলোতেই বর্তমানে ব্যাগ-স্যুটকেস এবং বিভিন্ন রকমারি দ্রব্যের মিলন ঘটেছে।

৪.৪ লোক পেশাজীবী সমাজ

মানুষ যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাই বৃত্তি বা পেশা। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে জীবিকার উদ্ভব হয়েছে। নিম্নে কিশোরগঞ্জের উল্লেখযোগ্য লোক পেশাজীবী সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো:

কাঠমিস্ত্রি/ছুতার

মিস্ত্রি বা ছুতার কিশোরগঞ্জের ভাটি বা হাওর এলাকায় এদের বসবাস বেশি। হিন্দু সম্প্রদায় ও সমাজে তাদের নাম বা পদবি হলো সূত্রধর। সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রাচীন থেকে আধুনিক কালের সকল কারুকাজ করা বা অলঙ্করণের কাজ করে থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলায় সূত্রধর বংশজাত লোকের সংখ্যা বেশি। তাদের বসবাস এ জেলার সর্বত্র রয়েছে। বর্তমান কালে মুসলমান মিস্ত্রি বা ছুতার শ্রেণির লোকজন কাঠের কাজে গ্রাম-গঞ্জে কিংবা শহরেও দেখা যায়। হিন্দু সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোকজন গলায় চন্দন কাঠের মালা দেয়। এদের ব্রাহ্মণ হলো 'আচার্য'। কিশোরগঞ্জ জেলার উজান অঞ্চলের চেয়ে ভাটি বা হাওর অঞ্চলে সূত্রধরদের বসবাস অধিক হওয়ায় প্রায় প্রতি গ্রামেই 'আচার্য' পদবীধারী ব্রাহ্মণদের বসবাস রয়েছে। ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণে সূত্রধর পদবীর কাঠমিস্ত্রি বা ছুতাররাই শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।

কুলু বা তেলি

কিশোরগঞ্জে কুলুহাটি, কুলুপাড়া, তেলিহাটি, তেলিপাড়া, তেলিখাই ইত্যাদি নামের জনপদ রয়েছে। কিশোরগঞ্জে এদের অনেকেই নতুন পদবি গ্রহণ করে মূল পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ কাপড়ের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন।

তাঁতি

যারা কাপড় বুনে তাদের বলা হয় তাঁতি। কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাচীনকাল থেকেই এদের বসবাস রয়েছে। বঙ্গবীর ঈসা খাঁ'র আমলে কিশোরগঞ্জ জেলায় তাঁতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এককালে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী, বাজিতপুর, বত্রিশ, হয়বতনগর, কুলিয়ারচর প্রভৃতি জনপদে মসলিন কাপড় তৈরি করা হতো। সেই যুগ থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলায় তাঁতের শাড়ি বা কাপড় তৈরি করা হতো। তাঁতিরা সবাই পদবি গ্রহণ করত 'বসাক'। বসাক পদবিধারী হিন্দু সম্প্রদায় কিশোরগঞ্জে সদর বত্রিশ এলাকায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। হিন্দু তাঁতিদের মধ্যে আরেক শ্রেণির তাঁতি রয়েছে তাদের নাম 'যোগী'। এককালে কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলা যোগীহাটি, যুগীপাড়া-পাড়ার তাঁতিরা তাদের নিজেদের তৈরি দেশীয় কাপড়, চাদর, গামছা খুবই জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এসব গ্রামে যোগী/যুগী সম্প্রদায়ের লোকজন আছে কিন্তু তাদের ব্যবসা নেই, পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশায় জড়িত হয়ে পড়েছেন।

জেলে

কিশোরগঞ্জের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মৎস্যজীবী বা জেলে সম্প্রদায়। অসংখ্য খাল-বিল-হাওর জলাশয় ও নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এই জেলা নিকট অতীতেও ছিল মিঠাপানির হাজারো প্রজাতির মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ। এই মৎস্যসম্পদের আকর্ষণেই আদিবাসী কোচ সম্প্রদায় প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থায়ও জীবিকার অন্বেষণে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট হয়েছিল। এখানে অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির বণিকেরা শুকনা মাছের ব্যবসার জন্য নিকলী, ধুলদিয়া বাজারে কুঠি স্থাপন করেছিল। আমাদের হাওরে এখনও এই শ্রেণির অস্তিত্ব দেখা যায়। তাদের প্রধানত মালো ও কৈবর্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এরা উভয়ই মাছ ধরা ও কেনাবেচা করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে পার্থক্য হচ্ছে মালোরা তুলনায় গরিব এবং এরা খাল-বিলে ছোট জাল দিয়ে মাছ ধরে জীবন চালায়। অন্যদিকে কৈবর্তদের অবস্থা স্বচ্ছল। তারা অভয়াশ্রম তৈরি করে বড় মাছের চাষ করে। আঞ্চলিক ভাষায় এই অভয়াশ্রমকে বলা হয় 'নিম'। তিন বছর পর মাছ বড় হলে ধরা হয়। তখন মাছ ধরাকে বলা হয় 'নিম ডাংগা'। কৈবর্তদের অবস্থা ভালো হওয়ায় তাদের জীবনমান ও অর্থনৈতিক অবস্থাও মজবুত ছিল। কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে গুরুদয়াল কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা বাবু গুরুদয়াল সরকার। তার বাড়ি ইটনা এবং তিনি একজন অবস্থাসম্পন্ন কৈবর্ত ছিলেন। বলে রাখা ভালো, হাওর অঞ্চলের এসব মালো ও কৈবর্ত সম্প্রদায় প্রশাসনিক ভূগোলের বদলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলের অনুসারী এবং তারা কিশোরগঞ্জ ও এর পার্শ্ববর্তী হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বসতি স্থাপনসহ যোগাযোগসূত্রে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদী কুলিয়ারচর ও ভৈরবকে স্পর্শ করে বয়ে গিয়ে সমগ্র হাওর সংস্কৃতিকে একটি সূত্রে আবদ্ধ করেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস '*তিতাস একটি নদীর নাম*' মূলগতভাবে এই মালো-কৈবর্ত সম্প্রদায়ের একটি আখ্যান, যেমনটি লক্ষণীয় মানিক বন্দোপাধ্যায়ের '*পদ্মা নদীর মাঝি*' উপন্যাসে যেখানে তাদের সমাজ, ধর্ম, জীবন-জীবিকার অনবদ্য বিবরণ বিস্তৃত। তবে প্রাচীন প্রবাদ "জাল যার জলা তার" আজকের যুগে একথার পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় মাছ ধরা, মাছ ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে কিশোরগঞ্জে পারিবারিকভাবে পরিচিত জেলে সম্প্রদায়রা পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় জড়িত হয়ে পড়ছে।

কামার

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার একটি প্রাচীন জনপদের নাম রয়েছে 'লোহাজুরী'। এ জেলার কামারেরা দা, কোদাল, খণ্ডা, কাঁচি ছাড়াও লোহা লক্কর, তারকাটা, পেরেক, নৌকার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বানায়। এককালে কাঁসার বাসনপত্রও তারা তৈরি করত। অধুনা কিশোরগঞ্জে কামার-কুমার-জেলে-তাঁতি-মিস্ত্রি-ছুতার-সূত্রধর সবাই মিলেমিশে বসবাস করেন।

গাছি

যারা গাছে চড়ে গাছের ডালপালা কেটে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে এবং ফলমূল পাড়ে তাদেরকে 'গাছি' বলে। মানুষের বসতির আঙিনায় সুপারি, নারিকেল,আম, জাম, লিচু প্রভৃতি গাছ কেটে গাছের পরিচর্যা করা এবং সুপারি, নারিকেল, আম, জাম, লিচু গাছ থেকে পাড়ার কাজটুকু এ সম্প্রদায়ের লোকেরা পেশা হিসেবে করে থাকে। গাছিরা দরিদ্র জীবনযাপন করে।

গাইন ও বৈদ

নিকলী বৈদ্যার কান্দা একটি অন্যতম প্রাচীন জনপদ ছিল। বর্তমানে বিলুপ্ত নিকলীতে যে বৈদ এর সন্ধান পাওয়া যায় তারা ছিল বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এ অঞ্চলে বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ এর সন্ধান

পাওয়া যায়না। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কুঠিগির্দি থেকে হয়বতনগর ও হারুয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পাড়াটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। এককালে 'গাইন' বা 'বৈদ্যপাড়া' নামে পরিচিত ছিল। মূলত এ পাড়াটি ছিল বসতি বেদে সম্প্রদায়ের নিবাস। সম্প্রদায়গতভাবে বেদেরা বেশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত-এ কয়েকটি শাখার মধ্যেও দু'টি শাখাই প্রাধান্য একটি 'বসতি বেদে' অপরটি 'ভ্রাম্যমান বেদে'। বসতি বেদেরা যে কোন একটি জনপদে বসতি স্থাপন করে পেশাগত কারণে বাইরে গেলেও বছরে যেকোন একসময়ে তারা বসতিতে ফিরে আসে। আবার এ সম্প্রদায়ের অপর একটি শাখা ভ্রাম্যমান বা ভাসমান বেদেরা স্থায়ী কোন বসতি স্থাপন করেনা। এরা সারাবছরই নৌকার উপর জীবনযাপন করে। কিন্তু দু'টি শাখারই একটি বিষয়ে মিল রয়েছে যে- এরা একত্রে বা দল বেঁধে বসবাস করতে অভ্যস্ত।[২৮]

কিশোরগঞ্জে স্থায়ী বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ-গাইনদের বসতি রয়েছে। বর্তমানে তারা অন্য পেশায় জড়িত। এ সম্প্রদায়ের নারীপুরুষ উভয়ই কর্মঠ ও উপার্জনশীল। এদের শাখা ও গোত্রানুযায়ী বিভিন্ন পেশা রয়েছে- এসব পেশার মধ্যে সাপ ধরা, সাপ খেলা, বানর খেলা, টোটকা চিকিৎসা, তালা বিক্রয়, তালা মেরামত, ছাতা সারাই, ঝিনুকের মুক্তা আহরণ, নকল মুক্তা ও অন্যান্য ধাতব অলঙ্কার তৈরি, প্রসাধন সামগ্রী ফেরি, মসলা বিক্রয়, গান-বাজনা করা, পট দেখানো বা পট অঙ্কন উল্লেখযোগ্য। এদের নিজেদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ভাষাও ছিল বর্তমানে যা বিলুপ্ত। তবে কিছু কিছু লোকের মুখে মুখে তাদের নিজস্ব ভাষাটি বেঁচে আছে। নিজেদের গোত্রের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কৃতির বির্বতনে উল্লিখিত সম্প্রদায়দের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাচীন গোত্র ও বর্ণবাদ বা বর্ণপ্রথা আর নেই। এসব সম্প্রদায়ের অনেকেই আজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক কুলীনদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং অনেকেই তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা ও পদবি গ্রহণ করেছেন।

হাউইকর শিল্পী

কিশোরগঞ্জ শহরে এবং জেলার গ্রামে-গঞ্জেও এককালে হাউইকর কারিগরদের বসতি ছিল। তারমধ্যে কটিয়াদী, বাজিতপুর, নিকলী, কুলিয়ারচর, ভৈরব, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, করিমগঞ্জ, তাড়াইল ও অষ্টগ্রামে এ শিল্পের বেশ কদর ছিল। আতশবাজী বা নানান জাতের পটকা বা পটাশ বানানো বিক্রি ও শোলার মুকুট, টুপি বানানো ব্যবহার ও বিক্রির প্রচলন ছিল। কিশোরগঞ্জ শহরে এখনও অনেক হাউইকর শিল্পের ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায় নিয়োজিত। তবে তাদের বসতি ছিল হাউইকর শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন হাউইকর এখনও কিশোরগঞ্জ শহরে ট্রাঙ্ক, স্যুটকেসের পাশাপাশি জরির জিনিসপত্র বিক্রির প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছেন।

লিপিকর শিল্পী

এককালে কিশোরগঞ্জ শহরে এবং আশেপাশের বিভিন্ন থানা বা উপজেলার গ্রামাঞ্চলেও লিপিকরদের ব্যবসা বা বসতি ছিল। বিশেষ করে লিপিকর বা খোদাইকর যারা সাইকেল, ঘড়ি, ঘটি, বাটি, থালা, বাসন, কলস, কলম ইত্যাদি জিনিসপত্রে সুন্দর হাতে নাম ঠিকানা লিখে রাখার শখ ছিল তারা এ পেশায় জড়িয়ে যেতেন। এ যুগেও তাড়াইল উপজেলার বেশকিছু লোক এ পেশায় এ জেলা ছাড়াও ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে ঘুরে বেড়ান।

শিলপাটা ধার

এককালে গরম মসলার যাবতীয় দ্রব্য বিশেষ করে মরিচ, হলুদ, জিরা পাটা-পুতা ছাড়া বাটা কিংবা পিষার কাজ কোনোভাবেই সম্পন্ন করা যেত না। আজকের যুগে যেমন বাজারে তেমন একটা নেই, তেমনি বাসা বাড়িতেও পাটা-পুতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়না। সব কিছুই আজকাল প্যাকেটে পাওয়া যায়। তবুও কিছু কিছু বাসা-বাড়ি বা গ্রামাঞ্চলে শিলপাটা খোদানোর কাজে তাদের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ঝালাইকর

লৌহ, তামা, কাঁসা, সিলভার ইত্যাদি দ্বারা তৈরি জিনিসপত্রে ঝালা দেওয়ার কাজে যারা জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের ঝালাইকর বলা হতো। এখনও কিশোরগঞ্জ শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

মালাকার

জরীর দোকান গুলোতে যেসব রঙিন কাগজে তৈরি লাল, সাদা, হলুদ ছাড়াও বিভিন্ন রঙের মালা পাওয়া যায় এগুলো এসব পেশাধারী মালাকারগণ তৈরি করে থাকেন। এ শহরে এখনও অনেক মালাকারদের বসতি রয়েছে। তবে দিন বদলের পালায় আবার অনেকেই অন্য পেশায় মনোযোগী হয়েছেন।

কারিগর

কারিগর বিভিন্ন শ্রেণির হতে পারে। যেমন- যারা রঙ এর কাজ করতেন তাদের বলা হয় হতো 'রঙের কারিগর'। আর যারা ঘর নির্মাণ করত বিশেষ করে টিন বা কাঠের তাদের বলা হতো 'সূত্রধর কারিগর'। তেমনি টিনের কারিগর, কাঠের কারিগর, শন বা ছনের ঘর যারা নির্মাণ করতেন তাদের বলা হতো কারিগর তবে, স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'ছাপরবন'।

৪.৫ উপসংহার

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত হাওর বেষ্টিত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের অর্থনীতিও মূলত কৃষি নির্ভর। তবে যেহেতু হাওর বেষ্টিত সেহেতু হাওর অঞ্চলের মানুষের মূল জীবিকার উৎস মৎস্য আহরণ। কিশোরগঞ্জের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মত এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাই অর্থনৈতিক উৎস ও জীবন ধারনের উপাদানেও ভিন্নতা রয়েছে। এক সময় এ অঞ্চলের পাটের বেশ সুনাম ছিল। শুধু পাট নয় এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ ধানের চাষও হয়। কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামালের জোগানদানকারী অঞ্চল হিসেবে ব্রিটিশ-বাংলায়, পাকিস্তান আমলে এবং বর্তমান বাংলাদেশেও কিশোরগঞ্জ তার অবস্থান ধরে রেখেছে। ধান, পাটের পাশাপাশি এ জেলার চরাঞ্চলে বাদাম, আলু, মিষ্টি আলুসহ বিভিন্ন রবি শস্যের উৎপাদন হয়। পলি উর্বর এ অঞ্চলের বিভিন্ন ফসল তাই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাহিদাও মিটিয়ে থাকে।

কিশোরগঞ্জ প্রাচীনকাল থেকেই কুটির শিল্পে বিখ্যাত। এ অঞ্চলের বস্ত্রশিল্প একসময় বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। এছাড়াও এ অঞ্চলে রয়েছে মৃৎশিল্প, কারুশিল্প, ধাতুজাত শিল্প, মাদুর শিল্প, অলংকার শিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, কাঁসা শিল্প, লৌহ শিল্প ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী শিল্পসমূহ। এ অঞ্চলে রয়েছে লোক পেশাজীবী বিভিন্ন সম্প্রদায়। যেমন- জেলে, তাঁতি, কুলু, কামার, কুমার, গাছি, মালাকার ইত্যাদি।

শুধু কৃষি কাজ, মৎস্য আহরণ বা কুটির শিল্পই নয়, এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রাচীন যুগ থেকেই এ জেলার ভৈরব অঞ্চল ছিল বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এক সময় এ জেলার কালিয়াচাপরায় ছিল দেশের বৃহত্তম চিনিকল। যা বর্তমানে টাটা কোম্পানী তাদের মোটর পার্টস উৎপাদনে ব্যবহার করছে। এছাড়াও এখানে অনেক ছোট-বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিশোরগঞ্জের মারিয়া নামক স্থানে রয়েছে বিসিক শিল্প নগরী। যা কিশোরগঞ্জের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অন্যতম ভূমিকা রাখছে। আর এভাবেই ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এ জেলার অর্থনীতির চাকা।

তথ্য-নির্দেশ

১। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২৮৬

২। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২৮৭

৩। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২৯০

৪। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-১৯৯২, পৃ.২৫৫

৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২৫৮

৬। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২৯২

৭। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-১৯৯২, পৃ.২৫৭

৮। ডক্টর আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা-১৯৬৫, পৃ.৫৬

৯। তোফায়েল আহমেদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, ঢাকা-১৯৬৪, পৃ.১৮

১০। S. M. Ali, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan : Vol.XIII. No.2* (Dacca, 1968), Page 206.

১১। সরকারি ওয়েবসাইট- www.kishoreganj.gov.bd

১২। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.৩০৪

১৩। এম এ কাইয়ুম, *কিশোরগঞ্জের লোকজ ঐতিহ্য ও চারুকলা*, চন্দ্রাবতী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩, পৃ.২০

১৪। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.২৫৭

১৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২৫৭

১৬। এম এ কাইয়ুম, *আদি শিল্প: চিরন্তন সংস্কৃতি*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, জুলাই ২০১২, পৃ.১০৭

১৭। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.২৫৯

১৮। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২৭৪

১৯। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২৭৪

২০। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.২৬০

২১। এম এ কাইয়ুম, *লোকচিত্রের রূপ বৈচিত্র*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, জুলাই ২০১২, পৃ.১৪-১৫

২২। এম এ কাইয়ুম, *কিশোরগঞ্জের লোকজ ঐতিহ্য ও চারুকলা*, চন্দ্রাবতী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩,পৃ.২২

২৩। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.২৬১

২৪। এম এ কাইয়ুম, *আদি শিল্প: চিরন্তন সংস্কৃতি*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, জুলাই ২০১২, পৃ.১২১

২৫। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.২৬৩

২৬। এম এ কাইয়ুম, *কিশোরগঞ্জের লোকজ ঐতিহ্য ও চারুকলা*, চন্দ্রাবতী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩, পৃ.১৮-১৯

২৭। এম এ কাইয়ুম, *আদি শিল্প: চিরন্তন সংস্কৃতি*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, জুলাই ২০১২, পৃ.৭৯

২৮। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৪৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

কিশোরগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা

৫.১ ভূমিকা

সমাজ পরিবর্তন তথা কোন জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ, ক্রমবিকাশ ও গতশীলতায় এর প্রভাব অনস্বীকার্য। অনাদিকাল হতে সমাজ ও শিক্ষার এ ধারা একই খাতে প্রবহমান এবং পরস্পরের রূপায়ণ ও উন্নয়নে একে অন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আসছে।[১] আর তাই কোন সমাজের উন্নয়ন তথা পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার হলো সে সমাজের মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থা। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলেও মূলত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ব্রিটিশ আমলে। তবে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের অবক্ষয়ের কালেও এদেশে দেশীয় সনাতন শিক্ষার প্রচলন ছিল। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও ইতিহাসবিদ ম্যাক্সমুলার সরকারি নথিপত্র ও মিশনারিদের বিবরণ থেকে দাবি করেন যে, ইংরেজরা যখন দেশে প্রথম ঔপনিবেশ স্থাপন করে তখন বাংলায় ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ব্রিটিশ আমলেই এদেশে শিক্ষা পরিস্থিতি জরিপের প্রথম ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। মিশনারি ও সাংবাদিক 'উইলিয়াম অ্যাডাম' বাংলা ও বিহারে পরপর তিনটি জরিপ (১৮৩৫-৩৮) চালিয়েছিলেন; মূলত এটিই ছিল এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের ভিত্তি।[২] উক্ত রিপোর্টে জানা যায়, এ সময় শিক্ষাব্যবস্থা স্তর ছিল দু'টি। উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল টোল, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠশালা ও মক্তব নামেই অভিহিত হতো।[৩] তবে সে যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় শিক্ষার পাঠ্যসূচি ছিল ধর্মাশ্রয়ী। তবুও বাংলা স্কুল বা পাঠশালাসমূহের পাঠ্যসূচি অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। এতে বাংলা লিখন, পঠন-পাঠন, চিঠিপত্র লেখা ও ব্যবহারিক অঙ্ক শেখানো হতো। অঙ্ক ছিল দু'ধরনের, মহাজনি ও জমিদারি কৃষি। ব্যবসায়ী ও মহাজনের ছেলেরা মহাজানি অঙ্ক এবং জমিদারের কাচারিতে চাকুরি প্রত্যাশীরা শিখতো জমিদারি হিসাব।[৪]

মুসলমান ছেলেদের পাঠদান শুরু হতো মক্তবে। সেখানে নামাজ ও কুরআন শরিফ পাঠ শেখানো হতো। মক্তবগুলোর শিক্ষক ছিলেন 'কাট-মোল্লা'রা। অত্যন্ত সীমিত জ্ঞানের এরা যা পড়াতেন তা নিজেরাই বুঝতেন না। জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারই ছিল এঁদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কাজেই এই মক্তবের শিক্ষা মুসলমান সমাজে কোনো ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনতে পারেনি। অ্যাডাম এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'অকিঞ্চিৎকর ও অযোগ্য বিদ্যালয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫] উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মুসলমানদের মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচি হিন্দুদের টোল বা চতুষ্পাঠী থেকে উন্নত ছিল। টোলগুলো ছিল মূলত হিন্দুদের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র এবং শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষায় তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতো সেটি হলো, "Vain and empty subtleties, grammatical niceties and metaphysical discourses".[৬]

মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী-ফার্সি এবং সরকারি ভাষা ফার্সি হওয়াতে মুসলমানদের পাশাপাশি অনেক হিন্দুরাও এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা লাভ করতো।[৭]

আঠার শতক ছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক পালাবদল ও তজ্জনিত অস্থিরতার যুগ। ক্রান্তিকালের এই শতাব্দীতে পুরনো রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়াতে ভারতীয় সমাজ জীবনে যে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তাতে বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষাদীক্ষা ও মননশীলতার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়। কারণ স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সমাজের প্রতিপ্রত্তিশালী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের টিকে থাকার সংগ্রামেই বেশি ব্যস্ত ছিল বলে জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা তাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়নি।[৮]

বাংলা তথা ভারতবর্ষের এই যুগ-সংকটের কাল থেকে নবজাগরণ বা আধুনিক যুগ-পর্বে উন্মেষের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা তথা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন এক যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন ও সম্প্রসারণকে তাই বলা যেতে পারে- "The lever which moved the mediaeval Indian world, after centuries of inertia under Muslim rule."[৯]

৫.২ শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা যে কোন জাতির উন্নতির প্রধান শর্ত। যে জাতি শিক্ষাদীক্ষায় যত উন্নত সে জাতি তত উন্নত। কোন সমাজ কতটা উন্নত সেটা জানা যায় সে সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত মূলত ইংরেজ আমল থেকে। কেননা এ অঞ্চল ছিল প্রাচীন ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ বংশের পীঠস্থান। এখানে রাজত্ব করেছে কোচ, হাজং, গারো, রাজবংশী সম্প্রদায়। তাই পাল ও সেন আমলে এখানে তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। এমনকি মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামল সুলতানি ও মুঘল শাসনামলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষার তেমন প্রচলন দেখা যায়নি। তাছাড়া এ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশও ছিল অনেকটা এর অন্তরায়। কেননা এ অঞ্চল ছিল হাওর ও নদী বেষ্টিত বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থাময়। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীনকালে সংস্কৃত শিক্ষার যেমন প্রচলন ছিল, তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিল। মূলত তখন গ্রামের কোনো ধনী ব্যক্তির চণ্ডীমন্ডপে বা চালাঘরে পাঠশালা বা মক্তব খোলা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গুরু বা উস্তাদ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতেন। তারা ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো বেতন গ্রহণ করতেন না। ফসল কাটার মৌসুমে নির্দিষ্ট হারে ধান পেতেন।[১০] ছাত্র শাসন ছিল অত্যন্ত কঠিন। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে পাঠ দান চলত।

কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান কেদারনাথ মজুমদারের লেখা থেকে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার একটা অস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। সে সময় এ অঞ্চলে কোনো স্কুল ও কলেজ ছিল না।

১৮৪৬ সালে ময়মনসিংহে নাসিরাবাদ হার্ভিজ স্কুল এবং ১৮৫৩ সালে ইংরেজি স্কুল (English School), বর্তমান জেলা স্কুল স্থাপিত হলেও কিশোরগঞ্জে উচ্চশিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষার অগ্রযাত্রার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ওই সময় শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল। আবার হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এগিয়ে ছিল।[১১]

জানা যায়, ১৮৬৮ সালের পূর্বেই হয়বতনগরে একটি মাদ্রাসার অস্তিত্ব ছিল। যদিও ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র উনচল্লিশ জন। সাবেক 'উলুকান্দি' অর্থ্যাৎ বর্তমান ভৈরব বাজার সম্ভবত ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা ছিল। এখানে একটি ভালো স্কুল ছিল। ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ছয় বছর পর ১৮৬৬ সালে তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমায় কালীনাথ ধর এবং একই সাথে টাঙ্গাইলের প্যারীমোহন বিশ্বাস ময়মনসিংহে প্রথম বিএ পাস করেন। এমনকি এরাই বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রথম বিএ ডিগ্রিধারী।[১২]সে সময় তাদের এক নজর দেখার জন্য লোকের ভিড় জমে যেত।

১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে এ এলাকায় শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের একটি ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ আমলে বিশেষকরে বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদ এর পবর্তীতে এ অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ঘটে এবং ক্রমেই মানুষের মাঝে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এ সময় সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম সমাজের কেউ কেউ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মাদ্রাসা ও খানকাহ কেন্দ্রিক পাঠদান অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হন। ধারণা করা যায়, ১৯১০ সাল থেকে শুরু হয়ে এ ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে কিশোরগঞ্জ আজকের এ ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে।[১৩]

কিশোরগঞ্জের উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো- কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ (১৯৪৩), সরকারি মহিলা কলেজ (১৯৬৯), কিশোরগঞ্জ ওয়ালী নেওয়াজ খাঁন কলেজ (১৯৮২), আলহাজ্ব আবদুল কুদ্দুস হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (২০০২), জঙ্গলবাড়ী হাই স্কুল (১৮৬২), কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮১), বাজিতপুর হাফেজ আঃ রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯০), জাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৩), আগরপুর জি,সি, উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৭), কোদালিয়া সহরুল্লাহ ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১০), আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন (১৯১২), বনগ্রাম আনন্দ কিশোর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১২), আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৬), সরারচর শিবনাথ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৮), গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৮), ভৈরব কে.বি পাইলট হাই স্কুল (১৯১৯), হোসেনপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২০), মঙ্গলবাড়ীয়া কামিল মাদ্রাসা (১৮০২), টুটিয়ারচর মাজহারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা (১৯০৩), তারাকান্দি ফাজিল মাদ্রাসা (১৯১৯), আউলিয়াপাড়া ফাজিল মাদ্রাসা (১৯২১), গোবরিয়া ই.ইউ ফাজিল মাদ্রাসা (১৯২৩), মঠখলা ফাজিল (স্নাতক) মাদ্রাসা (১৯২৯)।

এক নজরে কিশোরগঞ্জের শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ তথ্যাদি:[১৪]

১। শিক্ষার হার (৫ বছর ও তদুর্ধ)	:	৫২.০৮%
২। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	৮০৮ টি
৩। রেজিস্টার্ড বেসঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	:	৪০৫ টি
৪। নন-রেজিঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	:	১৮ টি
৫। পরীক্ষণ বিদ্যালয়	:	০১ টি
৬। কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	৪৮ টি
৭। অন্যান্য	:	১৭৭ টি
৮। এবতেদায়ী মাদ্রাসা	:	৯৫ টি
৯। দাখিল মাদ্রাসা	:	১০৮ টি
১০। আলীম মাদ্রাসা	:	২২ টি
১১। ফাজিল মাদ্রাসা	:	১৬ টি
১২। কামিল মাদ্রাসা	:	০২ টি
১৩। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	২১ টি
১৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	২২৪ টি
১৫। স্কুল এন্ড কলেজ	:	০৮ টি
১৬। উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়	:	১৩ টি
১৭। ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়	:	১৫ টি
১৮। অনার্স কলেজ	:	০৫ টি
১৯। মাস্টার্স কলেজ	:	০১ টি
২০। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	:	০১ টি
২১। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	:	০১ টি
২২। টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	:	০১ টি
২৩। নার্সিং ইনস্টিটিউট	:	০১ টি
২৪। হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ	:	০১ টি
২৫। মেডিক্যাল কলেজ	:	০৩ টি
২৬। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	:	০৩টি

৫.৩ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

৫.৩.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ৩টি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তর হলো প্রাথমিক শিক্ষা। অন্য দুটি স্তর হলো মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার এ স্তরটি ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী। যা প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। মূলত অবিভক্ত ভারতবর্ষের অংশ এই বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন কবে ঘটে তা বলা কঠিন। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে মন্দির-মসজিদ ও পরবর্তীতে গীর্জা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যমান ছিল। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত মূলত ইংরেজ আমল থেকেই। লে. গভর্ণর ক্যাম্বল (১৮৭২) এর সময় হতেই বাংলার জেলাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। অধিকন্তু ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন (Primary Education Act VI of 1919) এর দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উপর আরো অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১৫] এ আইনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে শহর এলাকায় এবং পরে গ্রাম এলাকায় অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। এরপর ১৯৩০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনহ পাস হয়। এই আইন অনুসারে ৬-১১ বছরের সকল ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৪ (চার) বছর উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার ফজলুর রহমান শিক্ষা কমিটির সুপারিশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছরে উন্নীত করেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত "ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন" রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ১৯৭২ সালের সংবিধানের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য "Primary School Ordinance, 1973" এবং "Primary Education Taking Over Act, 1974" এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।[১৬] পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৮১ প্রণয়ন করা হয়। মোট ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হয় এবং বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ৫ বছর মেয়াদী ৬-১০ বছরের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তবে "জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০" অনুযায়ী এক বছর মেয়াদী প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। যেখানে শিশুদেরকে খেলাধুলা ও আনন্দের মাধ্যমে বর্ণমালা, সংখ্যা, ছড়া প্রভৃতি শিক্ষা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে মিল রেখে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাও এগিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ঝড়ে পড়া রোধে সরকারের উদ্যোগের ফলে কিশোরগঞ্জেও প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ঝড়ে পড়া অনেক কমেছে। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউটের হার শতকরা ৩.৬৩। আর এতে কিশোরগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

বত্রিশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কিশোরগঞ্জ পৌরসভাধীন বত্রিশ এলাকার শ্রী প্যারীমোহন সাহা নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজ বৈঠকখানায় প্রথমে ১৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ১৯২৪ সালে এই বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনিই প্রধান

শিক্ষক ছিলেন। তিনি ভারতে চলে গেলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘকাল দায়িত্বপালন করেন শ্রী ইদুভূষন রায়। এ বিদ্যালয়টি এখন বত্রিশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বিদ্যালয়ের বর্তমান জায়গার সমুদয়ই দান করেন এবং এলাকাবাসীর সহযোগীতায় একটি দোচালা ঘর নির্মাণ করান। তাঁর বৈঠকখানা ঘরটিও এরসাথে একত্রীভূত হয়। এসব কারণে তখনকার দিনে উক্ত বিদ্যালয়টি প্যারীবাবুর স্কুল নামে পরিচিত ছিল।

বাংলা স্কুল, বাজিতপুর

বাজিতপুর থানার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গোবিন্দ পালের বাংলা স্কুল। এটি আনুমানিক ১৮৫৬-৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিহারীলাল পাল। গোবিন্দ পালের মৃত্যুর পর এই বাংলা স্কুলটি ১৯১০ সালে গোবিন্দ চন্দ্র মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়। বাজিতপুরের খ্যাতনামা শিক্ষক তারিনী মাষ্টার এর প্রধান শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্কুলটি পরে পাগলার চর থেকে বর্তমান টাউন হাইস্কুলে চলে আসে নতুন নামে। ১৯৫৮ সালে এটি জুনিয়র হাই স্কুলে রুপান্তরিত হয়। ১৯৬৫ থেকে টাউন হাই স্কুল নামে সরকারি অনুদান পেয়ে আসছে। বর্তমানে বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব জহুরুল ইসলামের আর্থিক সহায়তায় স্কুলটি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর বড় ভাইয়ের নামানুসারে এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে নাজিরুল ইসলাম কলিজিয়েট হাই স্কুল।

৫.৩.২ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় ধাপ হলো মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতা, অনাগ্রহ সেই সঙ্গে উদ্যোগেও প্রচণ্ড অভাব। মূলত মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগই ছিল প্রধান।[১৮] বিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। পাকিস্তান আমলে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি ও আর্থিক বরাদ্দের অভাবে বাংলায় শিক্ষার বিস্তার কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করার ওপর জোর দেন। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরণের সাফল্য নিশ্চিত হয় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫)।[১৯]

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত কিশোরগঞ্জেও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। আর এ শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন-

সরারচর শিবনাথ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়

বাজিতপুর উপজেলার সরারচর ইউনিয়নের 'গোবিন্দপুর জুনিয়র হাই স্কুল' স্থাপিত হয় ১৯০৮ সালে। পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে স্কুলের নাম পরিবর্তন হয়ে 'সরারচর শিবনাথ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়' হয়। অনেকের

মতে ১৯১৮ সালে স্কুলটি তৎকালীন শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পায় বলেই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৮ গণ্য করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা কটিয়াদী উপজেলার মানিকখালীর কুড়িখাই জোয়ারিয়া গ্রামের বাসিন্দা বাবু শিবনাথ সাহা।[২০]

জানা যায়, তিনি এই স্কুলটি প্রথমে কটিয়াদীতেই করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে এলাকার লোকজন শিবনাথ বাবুর নিজের নামে স্কুল করতে আপত্তি জানালে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সরারচরে এসে এই স্কুল স্থাপন করেন। তখনকার সময় ১৫-২০ কি.মি. দূর থেকেও প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীরা সাইকেলে এসে এই স্কুলে ক্লাস করতো, আর যেসব ছাত্রদের বাড়ি অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে তার স্কুল বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করতো।

কাঞ্চণপুর হাওর উচ্চ বিদ্যালয়

কাঞ্চণপুর হাওর উচ্চ বিদ্যালয় মিঠামইন উপজেলার প্রত্যন্ত হাওরে অবস্থিত। যা আশেপাশের ১০কি.মি. দূরত্ব পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালাভের একমাত্র ভরসা। এ স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকে হাওরের প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সবসময়েই যুদ্ধ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে হয়। বর্ষার শুরুতে হাওর যখন পানিতে পূর্ণ হতে থাকে তখন অবধারিতভাবেই গ্রামগুলোর মধ্যে যোগাযোগের তেমন কোন মাধ্যম থাকে না। না যাওয়া যায় পায়ে হেটে, না পারা যায় নৌকায়। ঐ সময় বাধ্য হয়েই স্কুল বন্ধ রাখতে হয় ১.৫ (দেড়) মাসের মতো। ঠিক এমনভাবেই আবারও বন্ধ রাখতে হয় পানি চলে যাওয়ার সময়। এছাড়া বৈশাখ মাসে ঐ অঞ্চলে ছোটবড় সবাইকেই কাজ করতে হয়। তখনও ১ মাসের মতো স্কুল বন্ধ থাকে। বছরে মূল ক্যালেন্ডারের বাইরে ৪ মাসেরও অধিক সময় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে। তারপরও এ স্কুল হাওরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলোবর্তিকা হয়ে আছে।

মহেশচন্দ্র শিক্ষা নিকেতন

অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও উপেক্ষিত ভাটি এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য ইটনার কৃতীসন্তান ব্যারিষ্টার ভূপেশ চন্দ্র গুপ্ত ১৯৪৩ সনে নিজ আবাসভূমে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর পিতার নামে 'ইটনা মহেশচন্দ্র শিক্ষা নিকেতন'। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা ইটনা, মিঠামইনের হাওরের মানুষের মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। এটিই সম্ভবত হাওরের প্রথম বিদ্যালয়।এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন শিলুন্দিয়ার শ্রী ধীরেন্দ্র চৌধুরী। হাওর এলাকার প্রধান এবং প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষাবিস্তারে প্রতিষ্ঠানটি আজও সমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

নিকলী জি.সি. হাইস্কুল

ইংল্যান্ডের ডেভিড কোম্পানীর মি. স্টিফেনসন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সোয়াইজানী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয় নিকলী জি.সি হাই স্কুল। ১৯৩৮ সালে ডেভিড কোম্পানীর স্থানীয় গুদামের মালিক ও যৌথ পাট ব্যবসায়ী বাবু দয়াল সাহার স্বর্গীয় পিতার নামানুসারে ও আর্থিক সহায়তায় জি.সি অর্থ্যাৎ 'গোড়াচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়টি'র যাত্রা শুরু হয়।

আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন

আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কটিয়াদী থানার অন্তর্গত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিপুল ঐতিহ্য ও সুনামের অধিকারী। আচমিতার জমিদার ছিলেন রায় বাহাদুর কেদারনাথ রায়। তিনি ছিলেন দারুন ইংরেজ ভক্ত। তার আমন্ত্রণে ইংরেজ বড় লাট ৫ম জর্জ আচমিতায় আগমন করেন। ইংরেজদের প্রীতিভাজন হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখেন- আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন উচ্চ বিদ্যালয়।

বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়

১৯১২ সালে কটিয়াদী থানার বনগ্রাম আনন্দকিশোর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বনগ্রামের জমিদার বাবু আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী এর প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয়টি যেমনি সুপ্রাচীন তেমনি ঐতিহ্যমণ্ডিত। এখানে অধ্যয়নকরে বহু জ্ঞানীগুণীজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেছেন। শুধু লেখাপড়া নয় খেলাধুলায়ও এ স্কুলের সুখ্যাতি ররেছে।

জঙ্গলবাড়ী হাইস্কুল

করিমগঞ্জ থানার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী স্কুল এদেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর অন্যতম। বর্তমানে স্কুলটি ঈসা খাঁ'র স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক আড়া বা পরিখার মাঝখানে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এটি এম.ই স্কুল (Middle English School) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৬২ সালে এ স্কুলের যাত্রা শুরু। তখন বিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল আড়া বা পরিখার বাইরে দক্ষিণ দিকে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৬৮-তে আড়া'র ভিতর ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং 'মহল পুকুর' নামে পরিচিত একটি ঐতিহাসিক পুকুর ভরাট করে স্কুলটি বর্তমান জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

হোসেনপুর হাইস্কুল

আঠারবাড়ির জমিদার বাবু শঙ্কু চন্দ্র রায়ের বদান্যতায় ১৮৯০ সালে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের জন্য 'হোসেনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে স্কুলটি 'হোসেনপুর এম.ই স্কুল' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মঞ্জুরি পায়। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে অগ্নিকাণ্ডে স্কুলটি পুড়ে যায়। পরবর্তীকালে হোসেনপুরবাসী স্থানীয় চাঁদার মাধ্যমে স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে 'হোসেনপুর হাইস্কুল' নামে পুনঃনির্মাণ করেন। দীপেশ্বর গ্রামের দানশীল ব্যক্তি জয়নাল আবেদীন বিদ্যালয়ের জন্য ৩.২৬ একর জমি দান করেন। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন বরুণ সেন।

পাকুন্দিয়া হাইস্কুল ও মহাবিদ্যালয়

পাকুন্দিয়া হাইস্কুলটি প্রথমে ১৯০৮ সালে পাকুন্দিয়া ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা হিসেবে চালু হয়। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে এটি হাইস্কুল ও কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৪১ সালে নারান্দী গ্রামের মৌলভী খুর্শিদ উদ্দিন আহমদ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি হয়। ১৯৫৭ সালে এটি পাকুন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৯৬১ সালে মডেল হাইস্কুল ও কলেজে রূপান্তরিত হয়।

এস.ভি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

কিশোরগঞ্জ শহরের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এস.ভি. সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলটি কিশোরগঞ্জের মেয়েদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহুপূর্ব থেকেই সুনাম অর্জন করে এসেছে। পড়ালেখা ছাড়াও ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও এস.ভি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। স্কুলটির প্রথম নাম ছিল 'সরযূ বিদ্যা নিকেতন'।

অষ্টগ্রামের ইছাপুরের বাবু মহেন্দ্র দাসের সাহায্যে এটি স্থাপিত হয়। তাঁর পরলোকগত স্ত্রী সরযূবালার নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ করা হয়। এস. ভি উচ্চ বিদ্যালয়টির সরকারিকরণ হয় ১৯৬৮-তে। বিদ্যালয়ের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন প্রকাশ চন্দ্র নন্দী বিএ, বিএল (১৯৪৩-৪৪)। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন জগৎচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৪০-৪৮)। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যবধি নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়

আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুন্সী আজিম উদ্দিনের নামে। নিজ বাড়ির চত্বরেই ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন করিমগঞ্জের সাঁতারপুর গ্রামের এই কৃতীসন্তান। ১৯১৭ সালে ৯ম শ্রেণি এবং পরের বছর ১০ম শ্রেণি খোলা হয়। এর কয়েক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়টিকে বর্তমান স্থানে আনা হয়।

জেলা স্মরণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

জেলা স্মরণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৮৬ সালের ২৮ নভেম্বর এলাকার সচেতন ব্যক্তিবর্গ, বড় বাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কিশোরগঞ্জ শহরের বত্রিশ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি ১৯৯৫ ও ২০০২ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।[২১]

কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় নামে ১ জুলাই ১৮৮১ সালে যাত্রা শুরু হয় বর্তমান কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের। কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার দুই দশক পরে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মহকুমার হিন্দু-মুসলিম জমিদার, তালুকদার, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, জঙ্গলবাড়ী ও হয়বতনগরের বিখ্যাত দেওয়ান পরিবার, গাঙ্গাটিয়া, মসূয়া, আঠারবাড়ি, গুজাদিয়ার জমিদার, বত্রিশ পৌনে চারিআনার জমিদার বাড়ি, জয়কার প্রসিদ্ধ জমিদার-তালুকদার এবং স্থানীয় আইনজীবী ও সুধীবৃন্দের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সর্বোপরি তাদের এককালীন ও মাসিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল এ বিদ্যাপীঠটির শুভযাত্রা। বাবু দীননাথ চৌধুরী, বিএ, বিএল ছিলেন প্রথম প্রধান শিক্ষক। তিনি ১৮৮১-১৮৮৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এ বিদ্যালয়টির কার্যক্রম চলমান।

ভৈরব কেবি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজেশ্বর গ্রামের মুন্সি শরাফত উল্লাহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও মহারাজ জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরীর বদান্যতায় ভৈরব কাদির বক্স উচ্চ বিদ্যালয়টির সূচনা হয়।[২২] জানা যায়, ১৯০৮ সালে এটি মাইনর স্কুলে ও ১৯১৯ সালে ভৈরব হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৪২ সালে ভৈরব হাইস্কুলের নাম পরিবর্তন করে কেবি হাই স্কুল করা হয় ভৈরবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দাতা কাদির বক্স সরকারের নামে। তিনি এককভাবে বর্তমান সুদৃশ্য দালান নির্মাণের জন্য ১০ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন। এলাকার শিক্ষা বিস্তারে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

বাজিতপুর রাজ্জাকুন্নেছা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি 'বাজিতপুর এডওয়ার্ড গার্লস হাইস্কুল' নামে বাজিতপুর পৌরসভা অফিসের সামনে দড়িঘাগটিয়া গ্রামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে স্কুলটি বিশিষ্ট শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম সাহেবের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয় এবং স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে 'রাজাকুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' করা হয়।

জেলা পরিষদ আর্ট স্কুল

কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষানুরাগী বনমালী ভৌমিকের একান্ত আগ্রহে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জেলা পরিষদ আর্ট স্কুল। বর্তমানে এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও গবেষক এম.এ কাইয়ুম।

৫.৩.৩ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তার শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। ১৮৫৪ সালে উড ডেসপ্যাচ এর অনেক গুলো প্রস্তাব বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বাংলায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। তবে সরকারি ভাবে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের নীতি গ্রহণ করা হলেও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয় নামমাত্র; ফলে প্রধান জেলা শহর গুলোতে বেসরকারি উদ্যোগের জন্য অনুকরণীয় মডেল হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠাকে উৎসাহিত করে। হান্টার কমিশন (১৮৮২) এর রিপোর্টের পর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে পরবর্তী দুই দশকে সরকারি কলেজ গুলোর তুলানায় বেসরকারি কলেজ গুলোতে ছাত্র সংখ্যা অনেকগুন বৃদ্ধি পায়।[২৩] বেসরকারি পর্যায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ সময় স্থানীয় জমিদার ও বিত্তবানদের অনেকেই জমিজমা, ভবন ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তবে ব্যয়ের সিংহভাগই আসতো ছাত্র বেতন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৎসামান্য সরকারি অনুদান থেকে।[২৪]

গুরুদয়াল সরকারি কলেজ

১৯৪৩ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রথম কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কিশোরগঞ্জ কলেজ'। যার অবস্থান ছিল রাখুয়াইল পাট গবেষণা কেন্দ্রের পাশে তৎকালীন সিএন্ডবি এর ডাকবাংলোয়। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক

সাদত হোসেন চৌধুরী (পদাধিকার বলে সম্পাদক), আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী ও বিপিন রায়কে (যুগ্ম-সম্পাদক), শাহ আব্দুল হামিদ, প্রফুল্লচন্দ্র ধর এবং কিশোরগঞ্জের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আইন পরিষদের সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন ড. ডি.এল দাস। এখানেই কলেজের কার্যক্রম চলল দুই বছর। তখন কলেজের চরম আর্থিক সংকট চলছিল। ঐ সময় এগিয়ে এলেন ইটনা থানার কাটৈর গ্রামের নিরক্ষর কৈবর্তরাজ গুরুদয়াল সরকার। তিনি বিনাশর্তে দান করলেন ৪৮০০১ টাকা। তাঁর টাকায় কলেজর বর্তমান জায়গা খরিদ করা হয়। তাঁর দানের বদান্যতা কিশোরগঞ্জবাসী বিস্মৃত হয়নি। তাঁরই নামানুসারে কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল 'গুরুদয়াল কলেজ'।[২৫] ১৯৪৫ এর শেষে অথবা ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে গুরুদয়াল কলেজ বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সনে বিএ ক্লাস খোলা হয়। বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর পরামর্শে ১৯৪৮ সনে এই কলেজে বিজ্ঞান শাখা খোলা হয়। প্রায় প্রতিবছর বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার মেধাস্থান অধিকার করায় এর সুনাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ড. ডি.এল দাসের পরে অধ্যক্ষ ওয়াসীমুদ্দিনের হাতে এ কলেজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১৯৮০ সনে কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। এ কলেজের অনেক শিক্ষার্থী আছে যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণী বক্তিবর্গ প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রতি বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমেদ, বর্তমান রাষ্ট্রপতি এডভোকেট আবদুল হামিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. আঃ মান্নান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্ঠা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. দূর্গাদাস ভট্টচার্য্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল হাসান, সাবেক সেনাপ্রধান ও মন্ত্রী লে. জেনারেল নূরুদ্দীন খান, সিএমএইচ এর প্রাক্তন চীপ মেডিক্যাল অফিসার বর্তমানে বারডেম এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব:) জিয়া উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্ঠা মেজর জেনারেল (অব:) আব্দুল মতিন ও কবি আবিদ আজাদসহ অসংখ্য মেধাবী কৃতি শিক্ষার্থী যারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত তাঁরা এ কলেজেরই ছাত্র ছিলেন।

এছাড়া এ কলেজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন এ এলাকার গর্বিত সন্তান বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাঁর সুযোগ্য সন্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. এম. ওসমান গণি এর পুত্র প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক।
বর্তমানে এ কলেজের ক্যাম্পাসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী শহীদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম 'বীর বিক্রম' এর আবক্ষ ভাস্কর্য ও এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গুরুদয়াল সরকার এর আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। যা বর্তমান প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও প্রকৃত ইতিহাস জানতে সহায়তা করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবে ।

কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ

বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার নারী সমাজের উচ্চ শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ না থাকায় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। জন্মলগ্নে ও পরবর্তীতে স্থানীয় প্রসাশকের সক্রিয় সহযোগীতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন জনাব রাফিউল করিম, মহকুমা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ এবং সম্পাদক ছিলেন জনাব আইয়ুব আলী, ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মুহম্মদ ওয়াসীমুদ্দীন। প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুদয়াল কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ৫ একর খাস জমি কলেজ কর্তৃক ৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়ে বর্তমান স্থানে কলেজটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক জনাব শহীদউদ্দীন আহমেদের প্রচেষ্টায় ছাত্রীনিবাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৭৫ সালে।

ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজ, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভাধীন কলেজগুলোর মধ্যে ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজ একটি। এটি ১৯৮২ প্রতিষ্ঠিত এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ জনাব ওয়ালীনেওয়াজ খান। ১০ জন ছাত্র নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে তার কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সরকার থেকে কলেজের স্বীকৃতি পায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ।

কুলিয়ারচর ডিগ্রি কলেজ

১৯৭৩ সালের ২৬ এপ্রিল ৫ একর জমির উপর কুলিয়ারচর ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক আ. ছাত্তার আনুষ্ঠানিকভাবে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে সৈয়দ মোহাম্মদ মুসা অন্যতম। তাকে সহযোগিতা করেছেন কুলিয়ারচরের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

ডা. আবদুল মান্নান মহিলা ডিগ্রি কলেজ

আবদুল মান্নান মহিলা ডিগ্রি কলেজ কটিয়াদী পৌর সদরের ভোগপাড়ায় অবস্থিত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন এমপি প্রফেসর এম.এ মান্নান ১৯৯৩ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই ডা. এম.এ মান্নান কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে এবং জেবা মান্নান অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৫ সালে কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) পর্যায়ে বিএ, বিএসএস ও বিবিএস শাখাসমূহের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮টি ও স্নাতক পর্যায়ে ১০টি বিষয়ে পাঠদান চলছে।[২৬]

কটিয়াদী ডিগ্রি কলেজ

কটিয়াদী পৌর সদরের কলেজ রোডের পূর্বপাশে ৭.৭৮ একর জমির উপর। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কটিয়াদী ডিগ্রি কলেজ। ১৯৬৮ সালে মোজাফফর উদ্দিন আহমেদ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কলেজটি ১৯৬৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্বীকৃতি এবং ১৯৭২ সালে স্নাতক এর স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮টি বিষয় এবং ডিগ্রি পর্যায়ে ২৪টি বিষয়ে পাঠদান হচ্ছে। তাছাড়া কলেজটি এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে চালু রয়েছে। বর্তমানে কলেজটির অধ্যক্ষ মজিবুর রহমান।

মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ কলেজ

নিকলী সদরে মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ কলেজটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান রয়েছে তারা হলেন- তৎকালীন এমপি আমির উদ্দিন আহম্মদ, কিশোরগঞ্জের প্রথম জেলা প্রশাসক এম.এ মান্নান, তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুলহাস উদ্দিন আহম্মদ, নিকলী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ প্রমুখ। প্রিন্স রফিক খান প্রাথমিক পর্যায়ে এ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।[২৭]

হাজী আসমত কলেজ, ভৈরব

ঐতিহ্যবাহী হাজী আসমত কলেজ ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে ভৈরবের কিছুসংখ্যক সমাজহিতৈষী ও শিক্ষানুরাগী কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেন। এ প্রচেষ্টায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন তদানীন্তন কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক এম.এন.এইচ রিজভী। উদ্যোক্তাদের মধ্যে হাজী আবদুর রহমান (কালা মিয়া), হাজী আবদুল লতিফ মিয়া, মোঃ তালেব হোসেন মিয়া, বটকৃষ্ণ কুন্ডু, আবদুর রাজ্জাক (কেবি হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক), হাজী আসমত আলী বেপারীর নাম উল্লেখযোগ্য।[২৮]

কলেজটি ৯ (নয়) বিঘা জমির উপর কেবি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ভৈরবের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও দানবীর হাজী আসমত আলী বেপারী কলেজ স্থাপনের জন্য এককালীন ৪০ হাজার টাকা দান করেন। তাঁর মহানুভবতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁরই নামে 'হাজী আসমত কলেজ' নামকরণ হয়। কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তার সাথে ছিলেন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মুয়াজ্জেম উদ্দিন হোসাইন। ১৯৪৭ সালে ১ জুলাই থেকে কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। বর্তমানে কলেজটি ভৈরব-কিশোরগঞ্জ হাইওয়ের পাশে সুন্দর পরিবেশে ৪২ বিঘা জমি ক্রয় করে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাজিতপুর কলেজ

সুপ্রাচীন বাজিতপুর পৌরশহরে বাজিতপুর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। ওই বছর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে কলেজটি যাত্রা শুরু করে। পরে ১৯৭০ সালে ঢাকা

বিশ্বদ্যিালয়ের অধীন বিএ, বিএসএস ও বিকম এবং ১৯৯১ সালে বিএসসি কোর্সে পাঠদানের অনুমতির মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ হিসেবে উন্নীত হয়। এদিকে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাজিতপুর কলেজে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এইচএসসি প্রোগ্রাম চালু হয়। বাজিতপুর তথা হাওরের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এটি প্রায় ১১ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশাল তিনটি দ্বিতল ভবন, ছাত্রীদের জন্য ফজিলাতুন্নেছা হোস্টেলসহ ছাত্রদের হোস্টেল, আধুনিক ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ও প্রজেক্টর সমৃদ্ধ। আইসিটি ল্যাব, অডিটরিয়াম, বিশাল খেলার মাঠ ও মিলনায়তন, মসজিদ, ক্যান্টিন ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ

সমাজকর্মী মোঃ রফিকুল ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় ১৯৮৭ সালে ভৈরবে প্রতিষ্ঠিত হয় রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ। মানবিক বিভাগ দিয়ে শুরু হলেও ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখা চালু করা হয়। ২০০২ সালে কলেজটি জাতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার অর্জন করে। ২০০৬ সালে এ কলেজে বিএ, বিএসএস, বিবিএস এবং ইংরেজি, সমাজকর্ম ও হিসাববিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু করা হয়।[২৯]

কিশোরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

কিশোরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ কিশোরগঞ্জ জেলার বত্রিশ এলাকায় অবস্থিত। ১৯৭৩ সালে কিশোরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। র্বতমানে কিশোরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ৪ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে চারটি বিভাগ চালু আছে:

১. এগ্রোমেশিনারী বা ফার্মমেশিনারী
২. মেশিনইস্ট বা মেশিন টুলস অপারেশন
৩. জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল
৪.অটোমোবাইল

কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদ এলাকায় কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ সড়কের পাশে প্রায় ৫ একর ভূমির উপর স্থাপিত হয়েছে কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। ২০০৫ সালের ৫ মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুকের একান্ত আগ্রহে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। ২০০৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় । বর্তমানে মোট ৪টি ট্রেড চালু আছে। এগুলো হচ্ছে- কম্পিউটার, ইলেকট্রিক, ফুড টেকনোলজি, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ।

ঈসাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

ঈসাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মার্চ ২০১২ সালে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর প্রফেসর দুর্গা দাস ভট্টাচার্য ঈসাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে ৩টি বিষয় নিয়ে ঈসাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যাত্রা শুরু করেছে-

১। ফেকাল্টি অব বিজিনেস স্টাডি (বিবিএ, এমবিএ)

২। ফেকাল্টি অব ল (এল.এল.বি)

৩। ফেকাল্টি অব আর্টস এন্ড সোস্যাল সাইন্স (বিএ অনার্স ইংলিশ, এমএ ইংলিশ, ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স)।

জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাংলাদেশের বিখ্যাত ও সর্বজন পরিচিত শিল্পপতি ও সমাজসেবী আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম স্বীয় জন্মস্থান বাজিতপুর থানার ভাগলপুরে ১৯৮৯ সালে গড়ে তুলেছেন 'জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল' নামে একটি অত্যাধুনিক ও বহুশয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। একইসাথে এতে নার্সিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যস্ত মহানগরী বা শহুরে সংস্কৃতি থেকে দূরে গ্রামীণ মনোরম পরিবেশে বেসরকারি পর্যায়ে এ ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের জন্য এক বিরল ঘটনা। কিশোরগঞ্জ জেলা সে গৌরবের দাবীদার। বাজিতপুর থানা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী হলেও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ছিল বরাবরই দূর্বল। উচ্চ শিক্ষার ও উন্নত চিকিৎসার সুযোগ ছিল সীমিত। এই এলাকার কৃতী সন্তান আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম সে শূন্যস্থান পূরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আগষ্ট ১৯৯২ থেকে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে। এর অগ্রযাত্রা এখনও অব্যাহত রয়েছে। পল্লী বাংলার কোলে এরূপ ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে বাজিতপুরের বাসিন্দা ও উদ্যোক্তা জনাব জহুরুল ইসলাম বিরাট জনগোষ্ঠীর মনে সহজেই দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছেন।

মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক সরকারি মহাবিদ্যালয়

মিঠামইন মহাবিদ্যালয় ১৯৯১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বর্তমান নাম হচ্ছে 'মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক সরকারি মহাবিদ্যালয়'। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ অ্যাডভোকেট এ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর একান্ত আগ্রহ এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় কলেজটি গড়ে ওঠে। হাওরবেষ্টিত ইটনা, মিঠামইন ও নিকলী উপজেলাতে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন এবং শিক্ষার প্রসার ঘটায় এ কলেজ।

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা দানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। সরাসরি সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ সালে

প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুবছর ধরেই জনবহুল জেলা কিশোরগঞ্জে একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল মহল থেকে দাবি জানানো হচ্ছিল।

বর্তমান সরকার এই দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরতলির যশোদল এলাকায় মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কিশোরগঞ্জের কৃতিসন্তান জেলহত্যার ৪ শহীদের অন্যতম সৈয়দ নজরুল ইসলামের নামে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করছে। শহরের দক্ষিণ পাশে যশোদল এলাকায় প্রায় ৪০ বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ন্যাশনাল সুগার মিলের ৩৫ কোটি টাকা মূল্যের ২০ একর ৮৪ শতাংশ জায়গার ওপর নির্মিত হচ্ছে মেডিকেল কলেজটি। এই প্রকল্পের অধীনে মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন, ছাত্র ও ছাত্রীদের দু'টি হোস্টেল, ডাক্তারদের কোয়ার্টার, ৫০০ শয্যার হাসপাতাল, ডিগ্রি পর্যায়ের নার্সিং ইনস্টিটিউট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে। জানা যায়, স্থাপনা নির্মাণ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১২ কোটি ৭২ লাখ টাকা। আর আসবাবপত্রসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ ধরা হয়েছে ১৩২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। অবশ্য ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ৫৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সৈয়দ নজরুল মেডিক্যাল কলেজের ক্লাশ শুরু হয়েছে। স্থাপনা নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত পাঠদান চলছে শহরের জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন নার্সিং ইনস্টিটিউটে।[৩০]

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদের একান্ত আগ্রহে ইটনা উপজেলা সদরে ১৯৯৮ সালের ২৬ মে ইটনা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এর নাম 'রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সরকারি মহাবিদ্যালয়'। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় আরও যারা ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা হলেন- ইটনার মরহুম দেওয়ান আবুল ফয়েজ মোঃ আবদুর রহিম, সমরেশ চন্দ্র রায় (অ্যাডভোকেট), মরহুম শাহাবুদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম মল্লিক, মোঃ আবদুল হামিদ, তাপস চন্দ্র রায় প্রমুখ। ২০০২ সালে কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। কলেজটিতে ডিগ্রি ক্লাস চালুর প্রক্রিয়া চলছে।

৫.৩.৪ মাদ্রাসা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম দিক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের পর বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও মুসলিম পীর আউলিয়াগণ এ সময় মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠে। খলজী তুঘলক শাসকদের সময় যা আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সরকারি উদ্যোগ থেকে বেসরকারি উদ্যোগই লক্ষ্যনীয়। কিশোরগঞ্জ জেলায়ও বেশির ভাগ মাদ্রাসা বেসরকারি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায় ১৮৬৮ সালের পূর্বে হয়বতনগরে একটি মাদ্রাসার অস্তিত্ব ছিল। যদিও ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯ জন।[৩১] কিশোরগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা সমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ:

আউলিয়াপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসা

১৯২১ সালে ১ জানুয়ারি থেকে এবতেদায়ি (মক্তব) হিসেবে আউলিয়াপাড়া মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়। সদর থানার বিন্নাটী ইউনিয়নের আউলিয়াপাড়া গ্রামে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন মাওলানা উবায়দুল্লাহ। ১৯৪২ সালে আলিম এবং ১৯৫২ সালে ফাজিল ক্লাস চালু হয়। নরসুন্দা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত এই মাদ্রাসাটি অদ্যবধি সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। এলাকার বিশিষ্ট দাতা আলহাজ ফজলুর রহমান একাধারে ৪৫ বছর নিষ্ঠারসাথে এ মাদ্রাসার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া এ মাদ্রাসার সাথে যাদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁরা হলেন প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল হালিম হুসাইনী, মাওলানা শামছুল হক পাঁচভাগী, মাস্টার আব্বাছ উদ্দীন, ছমির উদ্দিন প্রমুখ।

নূরুল উলুম আদর্শ মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা

১৯৭৯ সালে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রতিষ্ঠার সাথে প্রখ্যাত আলেম ও লেখক মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ নুরুল্লাহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী হাজী ছফির উদ্দিন ভূইয়া ও হাজি আবদুল করিমসহ বিশিষ্টজনেরা জড়িত ছিলেন। এতে গরিব ও এতিম ছাত্রীদের জন্য থাকা-খাওয়া, বই, পোশাক, চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া

কিশোরগঞ্জ শহরের পুরান থানায় ১৯৫৪ সালে হযরত মাওলানা আতহার আলী 'ইমদাদুল উলুম' নামে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এই মাদ্রাসায় আগমন করেন। এরপর থেকে মাদ্রাসার কাজ দ্রুততার সাথে শুরু হয় এবং 'আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া' নামকরণ করা হয়। এখানে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তাধারা ও পাঠ্যনীতির অনুকরণে আরবী বর্ণমালা থেকে শুরু করে ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্যক্রম চলছে।

হয়বতনগর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা

১৯৩৪ সালে ঐতিহ্যবাহী হয়বতনগর আনোয়ারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩৬ সালে আলিম, ১৯৩৮ সালে ফাজিল ও ১৯৪৯ সালে কামিল হাদিস হিসেবে মঞ্জুরি পায়। এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন হয়বতনগরের দেওয়ান মান্নান দাদ খানের সাথে পরামর্শ করে মাদ্রাসার কাজ শুরু করেন। উপমহাদেশের খ্যাতনামা মুহাদ্দেস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর (র) নামানুসারে মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়। এখানে ১৯৮৩ সালে আলিম ও বিজ্ঞান, ১৯৮৫ সালে মুজাব্বিদ ও হেফজুল কোরআন বিভাগ, ১৯৮৯ সালে কামিল ফিকাহ এবং ১৯৯১ সালে কামিল আদব ও তাফসির বিভাগ খোলা হয়।

মাথিয়া ইইউ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা

১ জানুয়ারি, ১৯৪১ সালে সদর থানার দানাপাটুলী ইউনিয়নের মাথিয়া গ্রামে 'মাথিয়া এশায়াতুল উলুম সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা' যাত্রা শুরু করে। উদ্যোক্তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- মোঃ ইয়াকুব আলী, আমির

উদ্দিন, মাসুদ আলী, মাওলানা আবদুল হেকিম প্রমুখ। ১ জানুয়ারি, ১৯৪৩ সালে মাদ্রাসাটি সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। মোঃ ইয়াকুব আলী ৫৮ শতাংশ জমি ও একটি টিনের ঘর এবং আলহাজ আমির উদ্দিন একটি ঘর প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করেন। ১৯৬৬ সালে এটি ফাজিল মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। মাদ্রাসার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মাওলানা মোঃ আবদুল হেকিম।

মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাসা, পাকুন্দিয়া

মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাসা কিশোরগঞ্জের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ দরবেশ এর নামে এই মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়। তৎকালীন অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যতিক্রম এ মাদ্রাসায় শুধুবৃহত্তর ময়মনসিংহ নয় অন্যান্য অঞ্চল থেকেও শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত।[৩২] ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে খন্দকার বংশের ধর্মপ্রাণ মাওলানা জনাব নুরুল ইসলাম সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব নেন এবং ১৯৮০ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়েই মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাসা চরম উন্নতির সীমায় আরোহন করে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ মোঃ তৈয়বুজ্জামান। আজ অবধি এ মাদ্রাসার সুনাম অব্যাহত রয়েছে।

৫.৪ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ

স্বর্গীয় শিবনাথ সাহা (১২৫৫-১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

শিবনাথ সাহা কটিয়াদীর ও বাজিতপুর অঞ্চলের একটি পরিচিত নাম। ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ১৭ আষাঢ় জোয়ারিয়া কুড়িখাই গ্রামে শিবনাথ সাহা জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কার্তিক চন্দ্র সাহা। বাবু শিবনাথ সাহা অনেক জনহিতকর কাজ করেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্ত্রীর নামে বাজিতপুরে 'কালিতারা পাঠশালা', বনগ্রামে পিতার নামে 'কার্তিক চন্দ্র সাহা লাইব্রেরী', ধুলদিয়ায় শিবনগর, কামালপুরে পূজামন্ডপ এবং ইংরেজী ১৯১৮ সনে 'গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়' স্থাপন করেন, যা পরবর্তীকালে 'সরারচর শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়' নাম ধারণ করে। তিনি ১৯২০ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। এই শিক্ষানুরাগী শিবনাথ সাহা বাংলা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৭ই আষাঢ় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। তার বাড়ীর পাশেই নদীর পাড়ে শিবসাহা শ্মশানঘাট। শ্মশানের সাথেই রয়েছে দীর্ঘ উঁচু শিবসাহা মঠ। মঠের এই সুউচ্চ চূড়াটিই জানান দেয় স্বর্গীয় বাবু শিবনাথ সাহা'র ঔদার্য্য আকাশের মতো মহান। কুড়িখাই গ্রামে শিবনাথ সাহা বাজারটি তাহার নামেই রাখা হয়। বাবু শিবনাথ সাহার বাড়ির কারুকার্যপূর্ণ দালানের ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে।

সূফী সাধক আবু আলী আক্তার উদ্দীন শাহ্ (১৮৭২-১৯৮৩)

বৃহত্তর ময়মনসিংহে আজকের কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার কোল ঘেঁষে বহমান ব্রহ্মপুত্র নদ। এ নদীর পাড়ে নির্জন এক গ্রাম ফরিদপুরে তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে। তাঁর ৮৫

বছরের সুদীর্ঘ সাধনা জীবনে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন ব্যক্তিজীবনে সত্য বলা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। 'ধর্ম মানবতার জন্য, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য নয়'- এই মন্ত্রই ধারণ করে তিনি হয়েছিলেন ধার্মিক। মহানবী (সঃ)-এঁর জীবনাদর্শনই তাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর গোটা জীবনে। তিনি ছিলেন হযরত আজান গাছী (রঃ)-এঁর ভাবশিষ্য। সত্যের আলোকবর্তিকা হাক্কানী ধারার প্রধান স্রোতে পরিণত হন তিনি। কান্দুলিয়ার মৌলভী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। ১৯৮৩ সালে অবসান ঘটে তাঁর বিস্ময়কর সাধনা জীবনের। কিন্তু বয়ে চলেছে হাক্কানীর শ্বাশত ধারা। তাঁরই প্রধান ভাবশিষ্য সুযোগ্য উত্তরসূরী সূফী সাধক আনোয়ারুল হক-এঁর জীবনে হাক্কানীর আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে অমিত তেজে, যা ধারাবাহিকভাবে আজও উদ্ভাসিত দেশ হতে দেশান্তরে।

বিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসু (১৮৮৫-১৯৭৫)

নদীমাতৃক বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকা ইটনা থানার জয়সিদ্ধি গ্রামে ২৬ নভেম্বর ১৮৮৫ সালে বিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহিনী মোহন বসু। ব্যাংলার আনন্দ মোহন বসু তার সহোদর কাকা। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাতুল বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে ভারতে বসবাস করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন দীর্ঘকাল। কিশোরগঞ্জের ইটনা থানার জয়সিদ্ধি গ্রামের কৃতিসন্তান ভারতীয় উপমাহাদেশের তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি এ উপমহাদেশে 'উইলসন ক্লাউড' চেম্বার নিয়ে প্রথম এ দেশে পরমাণু বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনিই আচার্য বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর ভারতের বসু বিজ্ঞান মন্দির- এর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পর স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৫ সালের ২ জুন তিনি ভারতের কলকাতা শহরে পরলোকগমণ করেন। বিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসু আজও কিশোরগঞ্জের গর্ব, কিশোরগঞ্জের অহংকার।

মাওলানা আব্দুল হালিম হুসাইনী (র.)

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর নাম সবার আগে আসে তিনি হলেন পীরে কামেল মাওলানা আব্দুল হেলিম হুসাইনী (র.)। তিনি এ উপজেলার একজন প্রখ্যাত আলেম ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত তারাকান্দি জামিয়া হুসাইনীয়া আছআদুল উলুম কওমী ইউনিভার্সিটি বর্তমানেও পাকুন্দিয়া তথা কিশোরগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে বিরাট ভূমিকা রাখছে। প্রতি বছর এই ইউনিভার্সিটি ময়দানে প্রতি বছর খতমে বোখারী শরীফ উপলক্ষ্যে ০২ (দুই) দিন ব্যাপী ইছলাহী ও তালিমী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে সারাদেশ থেকে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষের আগমন ঘটে।

ওয়ালীনেওয়াজ খান (১৯০৪-১৯৮৬)

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রাজনীতিবিদ, ন্যায় বিচারক, সমাজসেবক, সফল ব্যবসায়ী কিশোরগঞ্জের কালজয়ী পুরুষ ওয়ালীনেওয়াজ খান ১৯০৪ সালের ১২ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জের তারাপাশা বয়লা গ্রামে ছায়াবৃক্ষ ঘেরা নরসুন্দা নদীর পাড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম নেওয়াজ খান এবং মাতার নাম

আতরজান। তিনি যৌবনে রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে ভারতের আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে কারাবরণ করেছেন। এক সময়ে রাজনীতি থেকে সরে এসে ব্যবসায় মনোযোগ দেন। তিনি ১৯৮৬ সালের ২৫ শে নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।[৩৩]

সমাজসেবক হিসেবে তিনি দেশের মানুষ যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য কিশোরগঞ্জ শহরে 'আরজত আতরজান উচ্চ বিদ্যালয়', 'ওয়ালীনেওয়াজ খান কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লেখা আছে কমরেড খোকা রায়ের '*সংগ্রামে তিন দশক*' গ্রন্থে, কবি আবিদ আজাদ এর '*কবিতার স্বপ্ন*' গ্রন্থে ও লেখক বদরুদ্দীন এর '*পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*' গ্রন্থে এবং '*কিশোরগঞ্জ এর ইতিহাস*' গ্রন্থে।

এম ওসমান গনি (১৯১২- ১৯৮৯)

এম ওসমান গনি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ১ মার্চ করিমগঞ্জ উপজেলার গোজাদিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী মোঃ দরবার আলী এবং মাতার নাম মকবুলা বেগম। এ উপমহাদেশের অন্যতম জ্ঞানতাপস, কিশোরগঞ্জ জেলার এই কৃতিসন্তান। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক ও লেখক। তাঁর প্রাজ্ঞতা ও পান্ডিত্য, গবেষণাকর্ম, অবিচল নিষ্ঠা, শিক্ষাদান, সহিষ্ণুতা, স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবোধ সকলেরই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র তখন থেকেই কবিতা আবৃত্তি করে সুনাম ও খ্যাতি দুটোই অর্জন করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে এগ্রি ক্যামিস্ট্রিতে তিনি পিএইচ.ডি অর্জন করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ড. ওসমান গনি মূলত ছিলেন বিজ্ঞানী, পাশাপাশি লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি অনুরাগী, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও রাজনৈতিকবিদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। এক কথায় ড. ওসমান গনি বহুমাত্রিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞা ও সাহিত্যে সংস্কৃতির ধারক-বাহক এবং বহু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।[৩৪]

মাওলানা আতাহার আলী (১৮৯১-১৯৭৬)

১৩০৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৯১ইং সালে সিলেট জেলার বিয়ানিবাজারের ঘোঙ্গাদিয়া নামক নিভৃত পল্লীর এক মধ্যবিত্ত দ্বীনদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মসূত্রে কিশোরগঞ্জ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থানকালীন তাঁর কর্মবহুল জীবন ও ভূমিকার কারনে কিশোরগঞ্জের ইতিহাস-ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্দ অংশে পরিণত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ধর্মীয় জ্ঞান-তাপস, লেখক, শিক্ষানুরাগী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নিজ গ্রাম থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর ভারতের মুরাদাবাদ কাসেমিয়া, রামপুর আলিয়া মাদ্রাসা, মাজাহারে উলুম সাহারানপুর ও দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে উচ্চ শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। হিজরি ১৪০০ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হাকিমুল

উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর পবিত্র হস্তে বাইয়্যাত গ্রহণ করেন। কঠোর পরিশ্রম ও মুজাহাদার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির স্তর সমূহ অতিক্রম করে স্বল্প সময়েই খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং তার মুর্শিদের নির্দেশে কিশোরগঞ্জের বৌলাই নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে আগমন করে তথায় দাওয়াত, তাবলীগ ও আত্মশুদ্ধির কাজে নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জ হয়বতনগরের জমিদার মরহুম দেওয়ান মান্নান দাদ খাঁন সাহেবের অনুরোধে হয়বতনগরে তশরীফ আনেন এবং তাবলীগী কর্মতৎপরতার ফলে অতি অল্প সময়েই সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক একটি শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের ঘটনায় মর্মাহত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি নিজগ্রামের দিকে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তাঁর কতিপয় প্রভাবশালী ভক্তের সবিনয় অনুরোধে তিনি কিশোরগঞ্জ শহরের পুরান থানা এলাকায় একটি ছোট মসজিদে সাময়িক অবস্থান নেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মুর্শিদের নিকট পত্র লিখেন। প্রতি উত্তরে মুর্শিদের পক্ষ থেকে এখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে দাওয়াত, তাবলীগ, সমাজসেবা ও সংস্কার কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসায় এখান থেকেই তার কর্মবহুল জীবনের সূত্রপাত ঘটে।

কিশোরগঞ্জের পুরান থানা এলাকায় যে ছোট মসজিদটিতে তিনি স্থায়ীভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাই আজকের শহীদী মসজিদ নামে পরিচিত। এ মসজিদে অবস্থানকালীন সময়ে পাকিস্তান আন্দোলন তীব্র আকার ধারন করলে তিনি স্বীয় উস্তাদ আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (র.) এর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এ মসজিদ থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে "জমীয়তে উলামায়ে ইসলাম" কর্মসূচী ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের খ্যাতনামা উলামায়ে মাশায়েখ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে "নেজামে ইসলাম" নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করেন ১৯৫৩ সালে। এখান থেকেই তিনি পাকিস্তানের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের এম.এন.এ এবং এম.এল.এ নির্বাচিত হন। তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিলেও তিনি নিজে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করে অনেককেই মন্ত্রীত্বের আসনে বসিয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে ১৯৫০ সালে "আদর্শ প্রস্তাব" গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে যে ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছিল এটাও তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল। ইসলাম ও মুসলামনদের হিফাজতের জন্য ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতকে মুসলিম নির্যাতন বন্ধে বাধ্য করা এবং ১৯৫১ সালে আগস্টে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একটা সম্মিলিত ব্লক কায়েম করার সিদ্ধান্তে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

মাওলানা আতাহার আলী সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য খেদমত ও অবদান রেখে গেছেন। তিনি কিশোরগঞ্জ শহর ও আশে পাশে অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও কিশোরগঞ্জে আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া ও ময়মনসিংহের চরপাড়ায় জামিয়া ইসলামিয়া নামে দুইটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং প্রতিষ্ঠান দুইটি খুব স্বল্প সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। ৬ অক্টোবর ১৯৭৬ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে এই কৃতিমান পুরুষ পরলোকগমণ করেন।

এ.এফ.এম আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-১৯৭১)

বিখ্যাত চিকিৎসক এ.এফ.এম আবদুল আলীম চৌধুরীর জন্ম ১৯২৮ সালে (বাংলা ১৩৩৫ সালে ৩ বৈশাখ) কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থানার খয়েরপুর গ্রামে। ১৯৪৫ সালে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৪৫ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। এই দুই পরীক্ষায়ই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন তিনি। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লন্ডনে যান এবং সেখান থেকে ১৯৬১ সালে ডিও ডিগ্রি অর্জন করেন। ছবি তোলা ও লেখালেখির শখ ছিল আবদুল আলীম চৌধুরীর।

ছাত্রজীবনে '*খাপছাড়া*' ও '*যাত্রিক*' নামে দু'টি প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ছাত্র থাকাকালেই তিনি '*দৈনিক ইত্তেহাদ*' ও '*দৈনিক মিল্লাত*' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। কিশোর বয়স থেকেই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন আবদুল আলীম চৌধুরী। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘট সফল করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তিনি। এজন্য ১৯৫৩ সালে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

পেশাগত জীবনে আবদুল আলীম চৌধুরী ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত লন্ডনের সেন্ট জেমস হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ছিলেন। এরপর দেশে ফিরে ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে তিনি মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে যোগদেন প্রধান চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে। ঢাকার পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন তিনি ১৯৬৭ সালে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ১৯৬৮ সালে। এরপর কিছুদিন ছিলেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগে। তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আবদুল আলীম চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (তৎকালীন পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। পরে ১৯৬৭ সালে এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে লন্ডনে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠায় তিনি জোরালো ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৯ সালে ইস্ট পাকিস্তান অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হন। এর আগে ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক ছিলেন তিনি।

১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর আলবদররা তাঁকে ঢাকার পুরানা পল্টনের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১৮ ডিসেম্বর রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে আরও অনেকের সঙ্গে আবদুল আলীম চৌধুরীর ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। আলবদররা মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এই চিকিৎসককে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ নূরুল্লাহ (১৯৩৯-২০০৬)

হযরত মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ নূরুল্লাহ (রহঃ) ১৪ আগস্ট ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার দগদগা গ্রামে তার নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ নভেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার পিতা মরহুম মাওলানা কাজী মোহাম্মদ শাহনাওয়াজ, মাতা মোছাঃ ফায়জুন্নেছা ফাতিমা। তিনি ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া হতে কামিল ফিকাহ, কামিল হাদিস ও কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে তাফছির এবং গুরুদয়াল সরকারি কলেজ কিশোরগঞ্জ হতে স্নাতক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলা ছাড়াও ইংরেজী, আরবী, ফারসি, উর্দু ভাষায় পারদর্শি ছিলেন।[৩৫]

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিদআতকে পরাভূত করতে আমরণ জিহাদ করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনে চিন্তা চেতনায় সার নির্যাস ছিল 'ত্বরীকায়ে রাছুলুল্লাহ (সা:) দর্শন'। জামায়াতে আহলে কোরআন ওয়াচ্ছুন্নাহপন্থী ছিলেন। এ বিষয়ে স্বাধীনতাত্তোর সময়ে ঢাকায় পুরাতন সংসদ ভবনে ওআইসি আয়োজিত সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ আমিনুল ইহসান এর নিকট থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে দ্বীনি ত্বরিকায় বায়াত হন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা আবুল আনছার আবদুল কাহার সিদ্দিকী ফুরফুরা হতে খিলাফত প্রাপ্ত হন।

উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক কিশোরগঞ্জ শোলাকিয়া ঈদগাহ এর ইমাম হিসেবে ১৯৭৫ খ্রি. হতে ২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ খ্রি. হতে ১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ খ্রি.হতে ২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ বড়বাজার শাহাবুদ্দিন জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ খ্রি. হতে ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ হয়বতনগর এ.ইউ আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং এর পূর্ব সময় ১৯৬৩ খ্রি. হতে মুহাদ্দিস এর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ১৯৭২ খ্রি. হতে ১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া মাদ্রাসার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র হাদিস বিষয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দশ সহস্রাধিক।

তিনি ১৯৬১ খ্রি. হতে লিখতে শুরু করেন। আরবীতে ৪১টি, উর্দুতে ২৫টি, ইংরেজীতে ১টি, বাংলায় ৬৫টিসহ সর্বমোট ১৩২টি গ্রন্থ রচনা করেন। এরমধ্যে *'ফাজায়েলে মেছওয়াক'*, *'কোরবানী ও আক্বীকার ইতিহাস'*, *'ওয়াহী উচ্ছিয়াম (রোজার ওয়াহী)'*, *'ইসলামের দৃষ্টিতে মুছীবাত'*, *'চিকিৎসা ও মৃত্যু'*, *'আদর্শ বিবাহ (ইসলাম ও যৌবন বিজ্ঞান)'*, *'ফাযায়েলে নিয়াতি মাকবূল (ইসলামী দর্শন)'*, *'ফাযায়েলে দোয়া'*, *'স্বপ্নে রাছুলুল্লাহ (দঃ) (নবী দর্শন)'*, *'আছারুন্নাবী (দঃ) (নবীজীর পত্রাবলী)'*, *'ফাযায়েল ও মাছায়েলে দরুদ ও ছালাম'*, *'তাফছিরে নূরে আল্লাহ'*, *'ত্বরীকায়ে রাছুলুল্লাহ (দঃ) (শাজারা)'*, *'শরীয়ত, এলেম, ঈমান, পবিত্রতা, ত্বরীক্বত, হকীক্বত, মারেফত, বায়আত ও যিকরুল্লাহ)'*, *'কোরআন পাঠের আদব কায়দা'* এই গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছে।[৩৬]

সৌদি আরবের জেদ্দা ভিত্তিক 'ওজারাতুল ইলাম'র আহুত ১৯৭৭ খ্রি. ইসলামী ফিকাহ্ বিষয়ে, ১৯৭৮ খ্রি. ইসলামী ইতিহাস বিষয়ে, ১৯৭৯ খ্রি. ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সৌদি আরব সরকার কর্তৃক পুরস্কার হিসেবে অর্থ ও সম্মান অর্জন করেন।

১৯৮১ খ্রি. হয়বতনগর এ.ইউ আলীয়া মাদ্রাসায় এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কামিল, ফিতাহ, তাফছির, আদব বিভাগ ও হেফজুল কোরআন, মোজাব্বির-ই-মাহিব ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু করেন। ১৯৭৯ খ্রি. কিশোরগঞ্জ জেলা শহরে প্রথমবারের মতো নূরুল উলুম আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা ও বালিকা এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৫ খ্রি. কিশোরগঞ্জ জেলা শহরে প্রথমবারের মতো এস.ভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মহিলাদের ঈদের জামাত চালু করেন এবং মহিলাদের জুম্মার নামাজ আদায়ের পক্ষে ফতোয়া দেন।

তার পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার ৬নং রাজগাতী ইউনিয়নের পাঁছদরিল্লা গ্রামে 'কাজী বাড়ী' সংলগ্ন তাঁদের পারিবারিক সম্পত্তি দান করে ১৯৮০ খ্রি. শাহনাওয়াজ ছফিরিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, ১৯৮৬ খ্রি. নূরুল উলুম ফাইজুন্নেছা ফারকুন্দা বালিকা মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং ১৯৮০ খ্রি. নূরে এলাহী জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলাসহ বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, খানক্বাহ, দাতব্য চিকিৎসালয়সহ শতাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

কিশোরগঞ্জের নেতৃত্বস্থানীয় আলেম ও ওলামা মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়ে এক অনুকরণীয় ও সাহসী ভূমিকা রেখে ভাস্বর হয়ে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর পৈত্রিক নিবাস 'কাজী বাড়ী' পাক হানাদার বাহিনী আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত কর্মকান্ডের কারণে স্বাধীনতাত্তোর সময়ে কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেলে 'ইসলাম' প্রসারের কথা চিন্তা করে তিনি মাদ্রাসাটি খোলার উদ্যোগ নেন এবং সফলকাম হয়ে চালু করে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. এম ওসমান ফারুক (জন্ম-১৮ জুলাই ১৯৪০)

ড. এম ওসমান ফারুক ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও অনেক কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তার শিক্ষা জীবনের পুরো সময়টাই ছিল সাফল্যে ভরা ও কৃতিত্বপূর্ণ। কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানাধীন গুজাদিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে ১৮ জুলাই ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বাংলাদেশের গর্বিত সন্তান, শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ ওসমান গণি ও মাতা বেগম সামসুন নাহার গণি।

স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে মেট্রিকুলেশন ও ১৯৫৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬১ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ও ১৯৬২ সালে এম.এ (অর্থনীতি) পাস করেন। এরপর তিনি ১৯৬৩ সালে (USAID) ফেলোশীপের প্রোগ্রামের

আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র-টেক্সাস এ এণ্ড এম ইউনিভার্সিটি থেকে Agriculture Economics বিষয়ে এম.এস ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে নিউ ইয়র্কের বিশ্ব বিখ্যাত Lvy leauge school, the Comell University Ithaca থেকে Acriculture Economics (With Spelization in Agriculture Marketing and in International Development) থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সে বছরই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে Department of Co-operation and Marketing-এ এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি ২০০১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) তে যোগদেন এবং দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন ও জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং সরকার গঠনের পর তিনি শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে সাজানো ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসনকল্পে ড. এম ওসমান ফারুক নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

অধ্যাপক ড. দূর্গাদাস ভট্টাচার্য (জন্ম-১৯৪১)

কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল ভট্টাচার্য পাড়ার এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯৪১ সালের ১লা নভেম্বর ড. দূর্গাদাস ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ স্বর্গীয় কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত। সাত পুরুষ ধরে তার পরিবারের পূর্বপুরুষগণের অধিকাংশ শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তার পিতা অবশ্য শিক্ষকতা ছেড়ে পরবর্তীকালে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ধর্মীয় অঙ্গনে তার পিতা ও পিতামহের অসংখ্য অনুসারী বাংলাদেশ ও ভারতে রয়েছে। ডা.ভট্টাচার্যের পিতা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেছেন। স্বীয় পারিবারিক ঐতিহ্যরক্ষণে আপোষহীনতার নীতি তারমধ্যে সবসময়ই কাজ করে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬০ সালে গুরুদয়াল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬২ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি ও ১৯৬৪ সালে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালের শেষ দিকে তিনি জগন্নাথ কলেজে বাণিজ্যে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে তার দু'টি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। বাংলাভাষায় এ উপমহাদেশের তিনিই প্রথম ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিষয়ে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। প্রভাষক হিসাবে কর্তব্য সম্পাদনের পাশাপাশি ১৯৭০ সালে *'The People'* দৈনিক পত্রিকায় বাণিজ্য বিষয়ক পাতায় সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিপ্লবী সরকার প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমবারের মত ১৯৭৩ সালে তিনি গবেষণামূলক '*Business Review*' নামক একটি জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ঐ

জার্নালের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । পরবর্তীকালে '*Dhaka University Studies, Part-C, Staff Development Review*'সহ দেশে ও বিদেশে গবেষণামূলক একাধিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য হিসেবে কার্যসম্পাদন করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ।ঐ সময় মুজিবনগর সরকারের শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রশাসক ও হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যুগ্ন সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে পরপর দু'বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৭৪ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত সরকারের বৃত্তি নিয়ে 'লেলিনগ্র্যাড ইনস্টিটিউট অব লাইট এন্ড টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ' এ প্রায় তিন বছর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতের কার্যে নিয়োজিত থাকেন। ১৯৭৭ সালে মস্কো টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে তার থিসিস পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করেন। ঐ বছর মস্কো টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে পরীক্ষক কাউন্সিলের সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাউন্সিল অব মিনিস্ট্রার্সের অধীন সুপ্রিম এ্যাটেশটেশন কাউন্সিল তাকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু *'বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কতিপয় উপায়সমূহ'*। তিনি পিএইচ.ডি সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কোর্সগুলোর পরীক্ষায় ডিস্টিংশনসহ উত্তীর্ণ হন।

এ পর্যন্ত তার দশটি গবেষণামূলক গ্রন্থ/মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে। যে সমস্ত দেশে তার প্রবন্ধ/গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হলো- ভারত, জাপান, কানাডা ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন। তিনি অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন দেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। মোট তিনটি ভাষায় বাংলা, ইংরেজি ও রুশ ভাষায় তার প্রকাশনা রয়েছে। জাপানি ভাষায় তার শিল্প সম্পর্কের মডেল অনুদিত হয়েছে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগের প্রবীণতম অধ্যাপক এবং ইএমবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক ছিলেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বহু প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

শেখ রফি আহমেদ (জন্ম-১৯৪৩)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক-গবেষক শেখ রফি আহমেদ ১৯৪৩ সালে ২২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ থানার জঙ্গলবাড়ী। ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী শেখ রফি আহমেদ শিক্ষা ও কর্মজীবনে প্রতিটি সিঁড়ি অতিক্রম করেছেন উজ্জ্বল সাফ্যলের সঙ্গে। বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণায় তার অবদান রয়েছে। তিনি আনবিক শক্তি কমিশনের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। 'লেজার রশ্মি' বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার। বিজ্ঞানের কঠিন জটিল বিষয়গুলো সরল বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপনে তার জুড়ি নেই। খ্যাতিমান গবেষক রফি আহমেদ যুক্তরাজ্যের রয়েল মিলিটারী কলেজ অব সায়েন্স এবং বর্তমানে কার্নফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে লেজার বিজ্ঞানী

হিসাবে গবেষণা করেছেন। শেখ রফি আহমেদ কার্নফিল্ড ইউনিভার্সটিতে স্টেক্টোস্কপি বিভাগের উচ্চতর গবেষণা শাখার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। তিনি মুক্তিযুদ্ধে লন্ডনে প্রবাসীদের সংগঠিত করে বিদেশীদের মাঝে জনমত সৃষ্টি করা এবং প্রবাসী সরকারের তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন।

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে এটমিক এনার্জিতে চাকরি গ্রহণ করেন ১৯৬৫-৬৬ সালে। এটমিক এনার্জি থেকে প্রেষণে ৬ মাস শিক্ষকতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে। ইংল্যান্ডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন রয়্যাল মিলিটারি কলেজ অব সায়েন্স লন্ডনে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১৯৭১-৮৫)। কার্নফিল্ড ইউনিভার্সিটি ইংল্যান্ড-এ লেজার বিজ্ঞানী হিসেবে গবেষণা করেন (১৯৮৫-৯৬)। কার্নফিল্ড ইউনিভার্সিটি ইংল্যান্ড-এর অধীনে লেজার স্পেক্টরসকপি এর উপর গবেষণা শাখা প্রতিষ্ঠা করে তার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৯২ থেকে।

ড. প্রকৌশলী নিয়াজ পাশা (মৃত্যু-২০১৭)

মোঃ নিয়াজ উদ্দীন, কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার হাওরবেষ্টিত লাইম পাশা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে পহেলা বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামের সাথে তাঁর প্রিয় গ্রাম- 'লাইম পাশা'র 'পাশা' সংযোজিত হয়ে তিনি নিয়াজ পাশা হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৮১ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশের পর ভর্তি হন তৎকালীন অভিজাত ও ব্যয়বহুল কলেজ কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলে (বর্তমান কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ)। ১৯৮৫ সালে নিয়াজ পাশা ভর্তি হন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে।

স্কুল জীবনেই তাঁর মধ্যে লেখালেখি ও নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ড. নিয়াজ পাশা সাংবাদিকতা ও ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পরেন। বাকৃবি'র ফজলুল হক হলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘ চার বছরেরও বেশী সময় ব্যাপী দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে সরাসরি ভোটে হল সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি একজন প্রতিশ্রুতিবান কৃষি সাংবাদিক হিসাবেও পরিচিতি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগে তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংগঠনের সাথে জড়িত হন, যা ছাত্র সংসদের বিকল্প হিসাবে কাজ করতো। ড. পাশা ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ছাত্র, শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সংগঠন বিনোদন সংঘ, সাহিত্য সমিতিতে কাজ করেছেন। ড. পাশা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) সাংবাদিক সমিতি ও ইউনিভার্সিটিজ ইয়্যুথ'র সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বাকৃবি সাংবাদিক সমিতির সাংগঠনিক, সহ-সভাপতি, সভাপতি ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সম্মানিত আজীবন সদস্য।

হাওরের কাদা জলে বেড়ে উঠা মানুষ হিসাবে এ অঞ্চলের প্রতি তাঁর রয়েছে দায়বদ্ধতা। হাওরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে রয়েছে ড. নিয়াজ পাশার অসংখ্য প্রকাশনা। সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি হাওরের অফুরন্ত সম্ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপন করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুসংস্কার, পরিবহন, যোগাযোগ-ডুবা সড়ক, বিদ্যুৎ, পানির মধ্যে বৃক্ষ রোপন, পর্যটন, ঐতিহ্য, কালচার, কর্মসংস্থান, পরিবেশ-প্রতিবেশ, মৎস্য চাষ, জলজ কৃষি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রয়েছে ড, নিয়াজ পাশার অসংখ্য প্রতিবেদন। হাওর নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি ও চিন্তা-ভাবনার জন্য অনেকেই তাঁকে 'হাওরী নিয়াজ পাশা' বা হাওর ভূমিপুত্র হিসাবেও অভিহিত করে থাকেন। জন্মভূমি প্রিয় গ্রাম বা হাওরকে ভালবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এখন ড. নিয়াজ পাশা অন্য হাওরবাসির কাছে প্রেরণাদায়ক ও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছেন। হাওরের আলো বাতাসে বেড়ে উঠা মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে তিনি গর্ববোধ করেন।

১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিনা), ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ পান। ১৯৯৭-৯৮ সনে নিয়াজ পাশা আন্তর্জাতিক আনবিক সংস্থার অর্থায়নে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণগ্রহণ করেন। কর্মক্ষেত্রেও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অনেকগুলো জাতীয় ইস্যুভিত্তিক সেমিনারে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়াও তিনি দেশে বিদেশে অনেক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অয়োজক ও অংশগ্রহণ করেছেন। ড. নিয়াজ পাশা হাওরের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ভিত্তিক সংগঠন 'হাজি তারা পাশা ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি লাইম পাশা হাই স্কুলে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, গরীব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। আর একটি কৃষি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন।

নিয়াজ পাশা ২০০৭ সালে ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া (ইউ.পি.এম.) হতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল- ফার্টিগেশন, সয়েল ওয়াটার মোভমেন্ট, ওয়াটার রিকয়ারম্যান্ট ফর ক্রপস ইত্যাদি। ড. নিয়াজ পাশা হচ্ছেন স্বাধীনতাত্তোর ইটনা উপজেলার প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনকারী। ড. নিয়াজ পাশা মধ্য এপ্রিল ২০০৯ এ সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার, ফার্মগেট, ঢাকা তে সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে পদযাত্রা শুরু করেছেন। 'হাওরভূমি পুত্র' খ্যাত ড. নিয়াজউদ্দিন পাশা সোমবার ৯ জানুয়ারী ২০১৭ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

৫.৫ উপসংহার

শিক্ষা মানুষের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। যা মানুষকে আলোকিত করে। শিক্ষিত ব্যক্তি শুধু নিজেকে নয় বরং তার জনপদকেও আলোকিত করে। কোন সমাজের উন্নতির চাবিকাঠি নির্ভর করে এই শিক্ষার উপর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বঙ্গ ভূ-খণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও সনাতনী শিক্ষা পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। তখন মক্তবে বা টোলে পড়ানো হতো। এদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলেও প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষার সূত্রপাত ব্রিটিশ আমলে। ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৬৮ সালের পূর্বেই হয়বতনগরে একটি মাদ্রাসার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত ছিলনা। এ অঞ্চলে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল পিছিয়ে। ১৯১০ সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জ জেলার শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নয়ন ঘটে আজকের অবস্থানে এসেছে। আর এখনও কিশোরগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। ঐতিহ্যবাহী কলেজ হিসেবে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ আজও তার ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, মেডিক্যাল কলেজসহ আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হাওর বেষ্টিত এ জনপদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য বর্ষাকালে ভ্রাম্যমান স্কুলও দেখা যায়। যা এ জেলাকে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগামী করে তুলেছে।

তথ্য-নির্দেশ

১। মোঃ হাবিবুল্লাহ, *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০০-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি (ঢাকা-জুন, ২০০৯), পৃ.৬২

২। আবদুল্লাহ আল-মুতী, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৬), পৃ.৫-৬

৩। মোহাম্মদ আজহার আলী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ.১১-২১

৪। ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ.৩১

৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩১

৬। উদ্ধৃত, *Nemai Sadhan Bose, Indian Awakening and Bengal* (Calcutta: Ananda Press & Publications Private Limited, 3rd Revised Ed., 1976), Page- 93.

৭। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-১৯৯২, পৃ.৩৫৮

৮। জাহেদা আহমদ, *রাষ্ট্র ও শিক্ষা*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৭৭১*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ.১০১

৯। উদ্ধৃত, *Nemai Sadhan Bose, Indian Awakening and Bengal* (Calcutta: Ananda Press & Publications Private Limited, 3rd Revised Ed., 1976), Page- 92.

১০। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২০০

১১। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২০০

১২। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালাঃ কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৫৪

১৩। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২০২

১৪। সরকারি ওয়েবসাইট: www.kishoreganj.gov.bd

১৫। শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত কবিরত্ন (এম.এ.অনু.), *বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সম্বন্ধীয় বিবরণী* (কলিকাতা: বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়ট বুক ডিপো, ১৯২১), পরিশিষ্ট 'ক', পৃ. ১-৫

১৬। bn.banglapedia.org

১৭। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৫৬

১৮। মোঃ হাবিবুল্লাহ, *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০০-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০৯, পৃ.৬৭

১৯। bn.banglapedia.org

২০। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২১৯

২১। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২০৯

২২। মু শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৫৯

২৩। জাহেদা আহমদ, *"রাষ্ট্র ও শিক্ষা"*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা:এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ.১০৫

২৪। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১০৪-১০৫

২৫। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-১৯৯২, পৃ.৪০১

২৬। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২২৫

২৭। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২২৬

২৮। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী (জুলাই, ২০১৮), পৃ.২১৩

২৯। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২১৭

৩০। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২১৯

৩১। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২০১

৩২। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-১৯৯২, পৃ.৩৫৯

৩৩। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.১০১

৩৪। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী (অক্টোবর, ২০১৪), পৃ.৫৫-৬০

৩৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৯৩-৯৪

৩৬। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি, ২০১৫), পৃ.১০৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হলো জীবন পদ্ধতি। মানব জীবনের প্রতিটি পড়তে পড়তে লোকায়িত রয়েছে সংস্কৃতি। মানুষ তার জীবন পথে চলার জন্য যে অভ্যাস, চলন-বলন, কথা-বার্তা রপ্ত করে তাই সংস্কৃতি। আর তাই একেক অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার পার্থক্যের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক জীবনেও পার্থক্য দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশের মানুষের জীবনাচারণ আর আমেরিকার মানুষের জীবনাচারণ এক নয়, তেমনি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মানুষের জীবনধারাও এক নয়। আর এক অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার সাথে আরেক অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক পার্থক্যই তাই তাদের মাঝে স্বাতন্ত্র্যতা এনে দেয়। আর তাই সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের বহুভঙ্গিম রূপ। সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।[১] অর্থ্যাৎ সূক্ষ্ম, পরিশ্রুত ও সুন্দর শোভন অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।[২]

৬.১ সংস্কৃতি

ইংরেজি Culture শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ এর দশকে সংস্কৃতি কথাটি Culture অর্থে বাংলা ভাষায় চালু করেন।[৩] সংস্কৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ সংস্কার, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজণিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি।[৪]অর্থ্যাৎ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। কোন স্থানের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হল টিকে থাকার কৌশল এবং পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতিবান প্রাণী। মূলত মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর তফাৎটা এই সংস্কৃতির জোড়েই।[৫]

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য-গীত-বাদ্য, চিত্রকর্ম, মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য বুঝে থাকি। এগুলো সংস্কৃতির অপরিহার্য অংগ, মানস ফসল; তবে সংস্কৃতির সবটা নয়।[৬] সংস্কৃতির গোড়ার কথা হলো সৃষ্টি; নব প্রকাশ, নব প্রয়াস। এ প্রয়াসের মূললক্ষ্য প্রকৃতির সংগে সংগ্রামে মানুষকে জয়ী করা, অগ্রগামী করা, শক্তিশালী করে তোলা। সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝায়, সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমস্ত সৃষ্টিসম্পদ।[৭]

৬.২ কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন

কিশোরগঞ্জ জেলার মাটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে লোক সংস্কৃতি। সখিনা, মলুয়া, মাধবী, মালঞ্চী কইন্যার অঞ্চল কিশোরগঞ্জ। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন যে হারানো গীতিকা সম্পদকে উদ্ধার করে ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমাদেরকে বিশ্বের কাছে বরেণ্য করে তুলেছেন তার চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি আমাদের পূর্ব ময়মনসিংহের তথা কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের।

কিশোরগঞ্জ জঙ্গলবাড়ীর কোচ রাজা লক্ষন হাজরা, সুশংরাজ রঘুপতি আর এগারসিন্দুর বেবুদ রাজার কাহিনী কিংবদন্তী। বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা দ্বিজবংশী দাসের পূন্যভূমি এ কিশোরগঞ্জ। তাঁরই কন্যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। তিনিই রামায়ণের সার্থক অনুবাদকারী ফোকলোর কাব্যের নায়িকা।

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিগর্ভা কিশোরগঞ্জের বীরত্বগাঁথা আর বীর সন্তানদের নাম ইতিহাসের বিশাল অধ্যায়। এ অধ্যায়ের ভূবন কাঁপানো নাম- মহারাজ তৈলোক্যনাথ, ব্যারিষ্টার ভূপেশগুপ্ত, নগেণ সরকার, জমিয়াত আলী, গঙ্গেশ সরকার, ওয়ালীনেওয়াজ খান, রেবতী বর্মনসহ অসংখ্য খ্যাতিমান স্বাধীনতা সংগ্রামী এ জনপদের বীর সন্তান। তেমনি এ জেলায় জন্ম নিয়েছেন মধ্য যুগের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, মনসা মঙ্গলের আদি কবি দ্বিজ বংশী দাস, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ অসংখ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

তবে ঐতিহ্যের প্রাচীনতা থাকলেও কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি চর্চার সর্বগামী ব্যাপকতা খুব একটা প্রাচীন নয়। মূলত ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এ অঞ্চলের মানুষ ব্যাপক সংস্কৃতি চর্চায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্র এবং বাণিজ্যিক এলাকাকে ঘিরেই এ জেলায় সংস্কৃতি চর্চার বলয় গড়ে উঠে। কিশোরগঞ্জ জেলায় নাট্যাভিনয়ের সূচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়না। তবে ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীরা ভৈরবে এসে যাত্রাপালা 'রামলীলা' পরিবেশন করেছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে ১৮৮৩ সালে নিকলী থানায় বিদেশী বণিকদের মাধ্যমে নাট্যাভিনয়ের প্রথম সূত্রপাত ঘটার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৩৫ সালে টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসী নাট্য পাগল জনৈক রমনী প্রসাদ তালুকদার নিকলী উপজেলায় স্থানীয় আরো কিছু সংস্কৃতি বোদ্ধা ব্যক্তিকে নিয়ে 'নিকলী থিয়েটার' নামক একটি নাট্য সংগঠন গড়ে তোলেন। আপাদমস্তক নাটক পাগল এই মানুষটি নিকলী থিয়েটারের ব্যানারে কৃষ্ণকীর্তন, রাধাকৃষ্ণসহ পৌরানিক কাহিনী নির্ভর অনেক নাটক মঞ্চায়ন করেছেন। বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে ভৈরবের বেণীমাধব ভট্টাচার্য 'ভৈরব অপেরা' নামে একটি যাত্রা দল গঠন করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা উপলক্ষে যাত্রাভিনয়ের আয়োজনে ভৈরব অপেরা ছাড়াও কলকাতা থেকে যাত্রাদলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হতো।

১৯৪৮ সালে কতিপয় শিক্ষিত সংস্কৃতি কর্মীর সমন্বয়ে ভৈরবে হয় 'ইয়ং ম্যানস প্রগ্রেসিভ এসোসিয়েশন' ঐ বছর মহেন্দ্র গুপ্তের নাটক 'টিপুসুলতান' মঞ্চস্থ হয়। এতে সহ-নায়িকার ভূমিকায় সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এবং কথা সাহিত্যিক মিল্লাত আলী যথাক্রমে রুনী বেগম ও সুফিয়ার চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।[৮] এ দু'জন প্রথিতযশা ব্যক্তি ভৈরবে 'আযান' নাটকেও নারী চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

তাছাড়া কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ও প্রকৃতি এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দিয়েছে সমৃদ্ধি এবং নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কিশোরগঞ্জ জলাভূমিতে পরিপূর্ণ হওয়ায় এ অঞ্চলে সাপের উপদ্রব বেশি ছিল। তাই সর্প থেকে আত্মরক্ষার্থে এখানকার মানুষ লৌকিক দেবী মনসার বন্দনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। কারণ মনসা বৈদিক দেব-দেবীদের পরম শত্রু। তবে সর্পদংশনের বিষ-জ্বালা থেকে মনসা মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন; দিতে পারেন মৃতকে পুনঃর্জীবন। এ কারণে মধ্যযুগে কিশোরগঞ্জে কাব্যরচনায় মনসার বন্দনা প্রাধান্য লাভ করেছে।

এছাড়া বয়াতিদের রচিত পালাগানগুলো ছিল কিশোরগঞ্জের অপূর্ব সৃষ্টি। মানবমুখী পালাগানের মধ্যে বীর ঈসা খাঁ'র বীরত্বগাথায় এখানকার মানুষ উদ্দীপ্ত হতো, আবার মদিনার মর্মান্তিক আত্মাহুতিতে ফেলত চোখের জল; মলুয়ার নিপীড়নে প্রকাশ করত সমবেদনা। কিশোরগঞ্জের জারিগান লোকসংগীতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কারবালার মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা অবলম্বনে পরিবেশিত এসব জারিগান এ অঞ্চলের মানুষকে আপ্লুত করত বিশেষভাবে। এ জেলার অষ্টগ্রামে এখনো মহরমের সময় জারিগানের প্রচলন রয়েছে।

কিশোরগঞ্জে পুঁথিপাঠ ও নাট্যচর্চার এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। উনিশ শতকে কিশোরগঞ্জের খ্যাতনামা পুঁথিসাহিত্যিক মুন্সি আবদুর রহিমের 'গাজী কালু চম্পাবতী' সারা দেশে জনপ্রিয় ও ব্যাপকভাবে পঠিত। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতির আঙ্গিনায় এক নতুনমাত্রা যোগ হয়। জেলার আর্টস কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে নব উদ্দীপনায় এখানে নাটক ও সঙ্গীতের সুবাতাস বইতে শুরু করে। নবান্ন উৎসব শেষে পালাগান, বাউলগান, নাটক, লাঠিখেলা, যাত্রাপালার আসর বসতে থাকে। এখনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রখ্যাত বাউল সঙ্গীত শিল্পীদের এনে সারারাত ব্যাপী বাউল গানের আসর বসে। শিশু একাডেমি জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করার জন্য আগামী দিনের কুশলী শিল্পী সৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিশোরগঞ্জ এক গৌরবান্বিত জেলার নাম। নাটক, যাত্রাপালা, রেডিও, টেলিভিশন, এমনকি চলচ্চিত্রেও কিশোরগঞ্জের অবদান অনস্বীকার্য।

৬.৩ সাহিত্য

সাহিত্য শিল্পের একটি অংশ। ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য।আর আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ছিলো মূলত কাব্য প্রধান। ষোড়শ শতকে যার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এসময় কিশোরগঞ্জ অঞ্চলও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে।

ষোড়শ শতকের সাংস্কৃতিক রাজধানী কিশোরগঞ্জের সাহিত্য ও সংস্কৃতি দেশব্যাপী বিপুলভাবে পরিচিত। এ ধারা এখনো প্রবহমান। কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি লোকজ ও আধুনিকতায় উদ্ভাসিত ইতিহাসের একটি উজ্জ্বলতম

অধ্যায় হিসেবে গণ্য। '*মৈমনসিংহ গীতিকা*'র বয়াতিরা মঙ্গলের কবি দ্বিজবংশী দাস, চন্দ্রাবতী, নারায়ণ দেব, উপেন্দ্রকিশোর, কেদারনাথ মজুমদার, আবদুর রহিম মুন্সী এবং নিকট অতীতের কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ, আজহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইদুর, আবিদ আজাদ, রাহাত খান, মিন্নত আলী, বেগম রাজিয়া হোসাইনের উত্তরসূরিরা এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছে।[৯]

পুরো মধ্যযুগে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ দেবকীর্তন ও বন্দনার মধ্য দিয়েই কেবল সাহিত্যসৃষ্টি ও সংস্কৃতিচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। তখন কিশোরগঞ্জ তথা ময়মনসিংহের '*মৈমনসিংহ গীতিকা*' ও '*পূর্ববঙ্গ গীতিকা*' প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঘটে যায় বিপ্লব। এ অঞ্চলের বয়াতি ও কবিরা লিখলেন নতুন সাহিত্য। সেখানে মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, দুঃখ, বেদনার অনুপম চিত্র ফুটে উঠল। উদ্ভাসিত হলো এক উজ্জ্বল ও মহৎ সাহিত্য। সৃষ্টি হলো এক আধুনিক সাংস্কৃতিক জগৎ। ড. দীনেশ সেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংকলিত উল্লিখিত দু'টি কাব্য প্রমাণ করল মানুষ শুধুধর্মের মহিমা ও দেবকীর্তনের জন্য নয়, বরং মানুষ তার ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা নিয়েও সাহিত্যসৃষ্টি করতে সক্ষম। তাছাড়া কিশোরগঞ্জের আদি নারী কবি চন্দ্রাবতী ও তাঁর পিতা দ্বিজবংশী দাসেররচনা এখানকার লোকজ ভাণ্ডার বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করে তুলল।

কিশোরগঞ্জের নতুন প্রজন্ম তাঁদেরই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এখানকার সাহিত্যকে সম্প্রসারিত করে চলেছে। নিম্নে এ জেলার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬.৪ বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও লেখকবৃন্দ

দ্বিজবংশী দাস

কবি দ্বিজবংশীদাস একজন সুপ্রাচীন কবি। পিতার নাম যাদবানন্দ ভট্টাচার্য। কবি'র পিতা ছিলেন সংস্কৃত পন্ডিত। দ্বিজবংশীর স্ত্রীর নাম সুলোচনা। কবি'র এক পূর্বপুরুষ চক্রপাণি রাঢ়দেশ থেকে কিশোরগঞ্জে এসে বসতি স্থাপন করেন। 'পাতুয়ারী দর্জি বাজু গ্রামেতে নিবাস' বলে কবি তাঁর পূর্বপুরুষের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। সদর থানার মাইজখাপন ইউনিয়নের কাচারিপাড়া গ্রামের দর্জিবাজুতে দ্বিজবংশী দাসের জন্ম। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '*পদ্মপুরাণ*'। এই কাব্যে তিনি রচনাকাল উল্লেখ করেছেন- 'জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার' ।তবে ড. আহমদ শরীফ তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিজবংশীদাসের কন্যা ও প্রখ্যাত নারী কবি চন্দ্রাবতীও বংশ পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী-নদী বহি যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।

ভট্টাচার্য ঘরে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী ।।
বাঁশের পালায় তালপাতার ছাউনী
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায় ।
কোপ করে সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায় ।।
দ্বিজবংশী বড় হৈল মনসার বরে
ভাসান গাইয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥[১০]

কবি ভাসান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর '*পদ্মপুরাণ*' অনন্য সৃষ্টি। পৌরাণিক আখ্যানের মিষ্ট ও সুদীর্ঘ অনুসৃতি তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কবি সংস্কৃত, আগম, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলে। তিনি পদ্মপুরাণ ছাড়াও '*কৃষ্ণর্ণব*', '*রামগীতা*' ও '*চণ্ডী*' নামে তিনটি বৃহৎ কাব্যও রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী

মধ্যযুগের তিনজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবির অন্যতম চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। তাঁর বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাঠবাড়ী বা পাতুয়ারী গ্রামে। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে- কবি চন্দ্রাবতী ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। '*মৈমনসিংহ-গীতিকা*'র '*জয়-চন্দ্রাবতী*' উপাখ্যানের নায়িকারূপে তিনি অমর হয়ে আছেন। জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রেমের করুন সমাপ্তিতে বেদনাহত চন্দ্রাবতী শোক ভুলে থাকার অভিপ্রায়ে পিতার আদেশে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। চন্দ্রাবতী প্রেমাস্পদ জয়ানন্দের বিচ্ছেদজ্বালা নিবারণের জন্য ফুলেশ্বরী নদীর তীরে পিতৃনির্মিত শিবমন্দিরে শিব-আরাধনায় কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন। ৩৫৪ ছত্র ও ১২ অঙ্কে বিভক্ত নয়ান ঘোষ প্রণীত চন্দ্রাবতী পালায় কবি চন্দ্রাবতীর জীবনকাহিনী বিধৃত হয়েছে।

১৯৩২ সালে দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রাবতীর রামায়ণ প্রকাশ করেন। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার চতুর্থ খন্ডের ২য় ভাগে এ রামায়ণ স্থান পেয়েছে। দীর্ঘদিন এ কাব্য পূর্ব ময়মনসিংহে ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হয়েছে। লৌকিক, মানবিক ও অন্যান্য মৌলিক উপাদানসমৃদ্ধ এ কাব্যটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানে পঠিত ও মহিলাদের দ্বারা গীত হয়েছে তাঁর রামায়ণ গান। দস্যু কেনারামের কাহিনীটি '*দ্বিজ বংশীসুতা*' এ ভণিতায় চন্দ্রাবতীর রচনা বলে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া তিনি '*পদ্মপুরাণ*' ও '*মলুয়া*' নামে আরও দু'টি কাব্য রচনা করেন। তাছাড়া চন্দ্রাবতী অজস্র লোকগীতি রচনা করেন। নৌকার মাঝির কণ্ঠে, ব্রতে, বিয়েতে এবং প্রতিদিনের গার্হস্থ্য জীবনে আজও শোনা যায় চন্দ্রাবতীর গান। ষোল শতকের সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনায়।

নারায়ণ দেব

কিশোরগঞ্জের সুপ্রাচীন কবির নাম নারায়ণ দেব। তিনি প্রতিভাধর ও কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার ইউনিয়নের বোর গ্রামে। পূর্বপুরুষ উদ্ধারণ রাঢ় থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর কাব্যের রচনাকাল উল্লেখ না থাকলেও তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

নারায়ণদেব কয় জন্ম মগধ।
মিশ্রপণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ ॥
অতিশুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদগোল্য গোত্র মোর গাই গুণাধর ॥
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিনী মোর মাতা ॥
পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় তেজিয়া মোর বোরামে বসতি ॥[১১]

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য নারায়ণ দেবের আঠারতম প্রজন্মের বংশধরদের বোর গ্রামে সন্ধান পেয়েছিলেন। বংশ তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাঁর জন্ম পনের শতকের শেষদিকে এবং গ্রন্থ রচনা ষোল শতকের প্রথম দশকের বলে ধারণা করা যায়।

নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম '*পদ্মপুরাণ*'। তিন ভাগে এটি বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে কবির আত্মকথা ও দেবতাস্তুতি, দ্বিতীয় ভাগে সমষ্টি এবং তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে চাঁদ-বেহুলার উপাখ্যান। আহমদ শরীফের মতে-এ কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কবি মনসা কাহিনীকে পুরাণের মর্যাদা ও গুরুত্বে উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু গ্রন্থির অভাবে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল পরে পুনর্জীবিত স্বামীসহ বেহুলার মর্ত্যজীবনের অবসান বা স্বর্গারোহণ এবং মর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্রোহী চাঁদ এক বালিকার কৃচ্ছসাধনার ও সিদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, মনসার কাছে নয়। তাই অনিচ্ছায় বেহুলার খাতিরে মনসাকে বাম হাতে প্রণাম করেছে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে 'পিছ দিয়া বাম হাতে তোমাকে পূজিব'। উন্নত শির বিদ্রোহী চাঁদকে এ মর্যাদা ও গৌরব আর কোনো কবি দেননি। পদ্মপুরাণের মতো এত বৃহৎ কাব্য বাংলাদেশে তৎকালে আর কেউ রচনা করেননি। অসামান্য কবি প্রতিভার জন্য তাকে 'কবিবল্লভ' উপাধি দেওয়া হয়। অসমীয় ভাষায় তাঁর পদ্মপুরাণ '*সুকনান্বি*' নামে পরিচিত।

নীহাররঞ্জন রায়

নীহাররঞ্জন রায় বাঙালি ইতিহাসবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও শিল্পকলা-গবেষক পন্ডিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী ছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ১৯৮১ সালের ৩০শে আগষ্ট কলকাতায় তাঁর বাসভবনে লোকান্তরিত হন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের শিল্পকলা শাখায় এমএ পাস করে রেকর্ড মার্কসহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এ রিসার্চ ফেলো হিসাবে নিযুক্ত হয়ে গবাষণায় ব্রতী হন। বৃত্তি নিয়ে ১৯৩৫ সালে ইউরোপ যান এবং হল্যান্ড-এর লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি এবং লন্ডন থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে ডিপ্লোমা নেন।

তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে শিল্পকলা বিষয়ে রানি বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে ব্রত হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই। ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে প্রফেসর এমিরেটস করা হয়। সিমালয় প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব এ্যাডভান্স স্টাডিজ প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক হয়ে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ঐ পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। একসময়ে রাজনীতি ও সাংবাদিকতা করেছেন; আকৃষ্ট হয়েছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রতি, অসহযোগ আন্দোলন-এ অংশ নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী *'লিবার্টি'* পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ পরিচালনা করেছেন। আরএসপি (Revolutionary Socialist Party) দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং দলের মুখপত্র ক্রান্তির পরিচালনা মন্ডলীতে ছিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় কারাবরণ করেন। তিনি ১৯২৮ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মোয়াট পদক লাভ করেন। তিনি নিম্নে উল্লেখিত গ্রন্থাবলী রচনা করেন-[১২]

- *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব* (১৯৪১)
- *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা* (১৯৪১)
- *Brahminical Gods in Burma* (১৯৩২)
- *Sanskrit Buddhism in Burma* (১৯৩৬)
- *Meurza and Sanga Art* (১৯৪৫)
- *Tera-veda Buddhism in Burma* (১৯৪৬)
- *India and Image in Indian Art* (১৯৭২)
- *An Approach to Indian Art* (১৯৭৪)

উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী

উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১০ই মে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার সমূয়া গ্রামের বনেদি রায় পরিবারে। বাবা কালীনাথ রায় তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য পরিচিত ছিলেন মুন্সী শ্যামসুন্দর নামে। তাঁরই দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন কামদারঞ্জন। এই পরিবারের আর এক শাখার নিঃসন্তান জমিদার হরি

কিশোর রায় চৌধুরী দত্তক নিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়ের চার কি পাঁচ বছরের এই রূপবান সুন্দর ছেলেটিকে। বাড়ি বদলের ফলে নামবদলে- কামদারঞ্জন রায় হয়ে গেলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

পড়ুয়া ছেলে না হয়েও ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাস করলেন উপেন্দ্র কিশোর। এরপর কলকাতা গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে। যোগাযোগ ও যাতায়াত ঘটল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। সেখানকার ও সঙ্গীতচর্চায় অনুপ্রাণিত হলেন উপেন্দ্র কিশোর। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত '*বালক*', শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত '*মুকুল*' প্রভৃতি ছোটদের কাগজ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল শিশুসাহিত্য সৃষ্টিতে। নতুন জন্ম নিলেন ছোটদের প্রাণের লেখক, মনের লেখক অদ্বিতীয় উপেন্দ্র কিশোর। ১৯১৩ সালের এপ্রিল, অর্থ্যাৎ বাংলা ১৩২০ সনের বৈশাখ থেকে প্রকাশিত হতে লাগল শিশুসাহিত্যের কিংবদন্তীতুল্য পত্রিকা '*সন্দেশ*'। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক, লেখক ও চিত্রকর স্বয়ং উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। শুধু নিজেই লিখলেন না, '*সন্দেশ*' পত্রিকা ঘিরে তৈরি করলেন ছোটদের নতুনধারার নতুন লেখক-গোষ্ঠী। উপেন্দ্র কিশোরের প্রেরণায় সেকালের অনেক খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা যেমন কলম ধরলেন ছোটদের জন্য, তেমনি তাঁর পরিবারের লোকজনও। ১৯১৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর উপেন্দ্র কিশোর ডায়াবেটিস রোগে ভুগে মারা যান মাত্র ৫২ বছর বয়সে। তাঁর রচনাবলী নিম্নরূপ-[১৩]

- *টুনটুনির বই*
- *ছেলেদের রামায়ণ*
- *ছেলেদের মহাভারত*
- *মহাভারতের গল্প*
- *সেকাল ও একালের গল্প*
- *বেচারাম ও কেনারাম (শিশু নাটক)*
- *শিশুমন ও শিশুসাহিত্য* (প্রবন্ধ)
- *শিশু সাহিত্যের উপকরণ* (প্রবন্ধ)

সুকুমার রায়

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতায় তাঁর জন্ম। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অর্থ্যাৎ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামে। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও যন্ত্রকুশলী উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তাঁর পিতা এবং অস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর পুত্র।

সুকুমার রায়ের প্রধান অবদান শিশু-কিশোর উপযোগী বিচিত্র সাহিত্যকর্ম। কবিতা, নাটক, গল্প, ছবি সবকিছুতেই তিনি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস সঞ্চার করতে পারতেন। তাঁর কাব্যে হাস্যরসের সঙ্গে সমাজ চেতনাও প্রতিফলিত হয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো- *আবোল-তাবোল* (১৯২৩), *হ-য-ব-র-ল* (১৯২৪), *পাগলা দাশু* (১৯৪০), *বহুরূপী* (১৯৪৪), *খাইখাই* (১৯৫০), *অবাক জলপান*, *শব্দকল্পদ্রুম*, *ঝালাপালা* ইত্যাদি।[১৪] এছাড়া বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত তাঁর কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধও রয়েছে। ডাইরির আকারে রচিত হেসোরামের ডাইরী নামে তাঁর একটি অপ্রকাশিত রম্যরচনা আছে।

সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি চলচ্চিত্রকার, আলোকচিত্রী, চিত্রকর, শিশুসাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও সুপরিচিত। ১৯২১ সালের ২ মে তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামে। পিতা প্রখ্যাত লেখক, সম্পাদক ও আলোকচিত্রী সুকুমার রায় ছিলেন রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন-এর ফেলো। তাঁর মাতা সুপ্রভা রায় ছিলেন একজন সঙ্গীতশিল্পী ও হস্তশিল্পে পারদর্শী এবং তাঁর পিতামহ উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীও ছিলেন প্রখ্যাত লেখক, শিশু সাহিত্যিক, চিত্রকর, আলোকচিত্রী, ব্লক ডিজাইনার এবং শিশুতোষ পত্রিকা '*সন্দেশ*' (১৯১৩) -এর সম্পাদক।

তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা দশজন চলচ্চিত্রকারের মধ্যে একজন। তাঁর চলচ্চিত্র কর্মের মধ্যে রয়েছে ২৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৫টি তথ্যচিত্র এবং ৩টি টেলিফিল্ম। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫), *অপরাজিত* (১৯৫৬), *পরশপাথর* (১৯৫৭), *জলসাঘর* (১৯৫৮), *অপুর সংসার* (১৯৫৯), *দেবী* (১৯৬০), *তিন কন্যা* (১৯৬১), *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬১), *কাঞ্চনজঙ্ঘা* (১৯৬২), *অভিযান* (১৯৬২), *মহানগর* (১৯৬৩), *চারুলতা* (১৯৬৪), *কাপুরুষ ও মহাপুরুষ* (১৯৬৫), *নায়ক* (১৯৬৬), *চিড়িয়াখানা* (১৯৬৭), *গুপী গাইন বাঘা বাইন* (১৯৬৯), *অরণ্যের দিনরাত্রি* (১৯৭০), *প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৭০), *সিকিম* (১৯৭১), *সীমাবদ্ধ* (১৯৭১), *অশনি সংকেত* (১৯৭৩), *ইনার আই* (১৯৭৪), *জনারণ্য* (১৯৭৫), *বালা* (১৯৭৬), *শতরঞ্জ কি খিলাড়ি* (১৯৭৭), *হীরক রাজার দেশে* (১৯৮০), *পিকু* (১৯৮২), *সদগতি* (১৯৮২), *ঘরে বাইরে* (১৯৮৪), *সুকুমার রায়* (১৯৮৭), *গণশত্রু* (১৯৮৯), *শাখা প্রশাখা* (১৯৯০), *আগন্তুক* (১৯৯১)। এছাড়াও তিনি বহু ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

লেখক হিসেবেও সত্যজিৎ রায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- '*বিষয় চলচ্চিত্র*', '*একেই বলে শুটিং*', '*আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস*', '*ফেলুদা সিরিজ*', '*শঙ্কু সিরিজ*', '*পিকুর ডায়েরী*' ইত্যাদি। পুরস্কার: পথের পাঁচালী-এর জন্য ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৬-এর মধ্যে ভারত ছাড়াও মোট ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার; অপরাজিত পেয়েছে ভেনিস, সানফ্রান্সিসকো, বার্লিন, ডেনমার্কসহ ৫টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। তথ্যচিত্র '*রবীন্দ্রনাথ*' ও '*ইনার আই*' এবং টিভি চিত্র '*সদগতি*' ও পেয়েছে দেশ-বিদেশের পুরস্কার। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তিনি পেয়েছেন বিশেষ সম্মান ও পুরস্কার। তিনি ভারত সরকারের নিকট থেকে ৪০টি পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৬০টি পুরস্কার লাভ করেন।

এসবের মধ্যে রয়েছে দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি, বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম', 'দাদা সাহেব ফালকে' পুরস্কার, ম্যাগসেসেই পুরস্কার, ফ্রান্সের 'লিজিয়ন অব অনার' (১৯৮৭), 'ভারতরত্ন' (১৯৯২), বিশেষ 'অস্কার' (১৯৯২) পুরস্কার ইত্যাদি। ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু হয়।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী

নীরদ সি চৌধুরীর '*The Autobiography of an Unkown Indian*' দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত গ্রন্থ। ১৯৫১ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর পৈতৃক নিবাস কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম। ১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর তার জন্ম। পিতার নাম উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। ছাত্রজীবনের প্রথম অবস্থায় ময়মনসিংহে এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্বশেষ প্রবাসে অবস্থান হলেও তিনি একজন আলোচিত-সমালোচিত লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[১৫]

কলকাতার '*The Modern Review*'-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বাংলার জাতীয় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া 'All India Radio'র ভাষ্যকার হিসেবে বিভিন্ন সময়ে কর্মরত ছিলেন। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে '*A Passage to England*' (১৯৫৯), '*The Continent of Circe*' (১৯৬৫), '*বাঙালীর জীবনে নারী*' (১৯৬৮), '*Scholars Extra Ordinary : The Wife of Professor The Rt. Hon. Freiedrich Maxmuller P.C*' (১৯৭৪), '*Clive of India*' (১৯৭৫), '*আত্মঘাতী বাঙালী*' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৯ সালের ১ এপ্রিল কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক '*দেশ*' তাঁর উপর একটি প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ করে।[১৬]

আবুল কাসেম ফজলুল হক

আবুল কাসেম ফজলুল হক বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। তিনি ৩১শে জুলাই ১৯৪৪ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি নিরপেক্ষ রাজনীতি চিন্তা ও তত্ত্বের বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর রচনায় স্বদেশ ভাবনা ও রাজনৈতিক চিন্তায় ঋদ্ধ। তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে '*লোকায়ত*' নামীয় সাময়িকপত্র প্রকাশনা করে চলেছেন। তিনি একুশটিরও বেশি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি নজরুল রচনাবলীর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ:[১৭]

- *মুক্তিসংগ্রাম* (১৯৭২)
- *কালের যাত্রার ধ্বনি* (১৯৭৩)

- *একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন* (১৯৭৬)
- *উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৭৯)
- *নৈতিকতা : শ্রেয়োনীতি ও দুর্নীতি* (১৯৮১)
- *যুগসংক্রান্তি ও নীতি জিজ্ঞাসা* (১৯৮৪)
- *মাও সে তুঙের জ্ঞানতত্ত্ব* (১৯৮৭)
- *মানুষ ও তার পরিবেশ* (১৯৮৮)
- *রাজনীতি ও দর্শন* (১৯৮৯)
- *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য* (১৯৮৯)
- *সাহিত্যচিন্তা* (১৯৯৫)
- *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা* (১৯৯৭)
- *অবক্ষয় ও উত্তরণ* (১৯৯৮)
- *রাজনীতি ও সংস্কৃতি : সম্ভাবনার নবদিগন্ত* (২০০২)
- *সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে* (২০০২)
- *আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা* (২০০৪)
- *মানুষের স্বরূপ* (২০০৭)
- *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ* (২০০৮) ইত্যাদি ।

অনুবাদ গ্রন্থ:

- বার্ট্রান্ড রাসেল প্রণীত : *রাজনৈতিক আদর্শ* (১৯৭২)
- বার্ট্রান্ড রাসেল প্রণীত : *নবযুগের প্রত্যাশায়* (১৯৮৯)

সম্পাদিত গ্রন্থ:

- *ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি* (১৯৭৮)
- *স্বদেশচিন্তা* (১৯৮৫)
- *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত : সাম্য* (২০০০)
- *মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী : মানবমুকুট* (২০০০)
- *এস ওয়াজেদ আলি প্রণীত : ভবিষ্যতের বাঙালি* (২০০০)
- *আকবরের রাষ্ট্র সাধনা* (২০০২) ।

সম্পাদিত সাময়িকপত্র:

- *সুন্দরম* (১৯৬২-৬৩)
- *লোকায়ত* (১৯৮২ থেকে চলছে) ।

তিনি বহু পুরস্কার লাভ করেন। যেমন-

- বাংলাদেশ লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৪)
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১)
- আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৭)
- অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (২০০৬)।

মোহাম্মদ সাইদুর

মোহাম্মদ সাইদুর কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মারিয়া ইউনিয়নের বিন্নগাঁও নামক গ্রামে ২৮ জানুয়ারি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম কুতুবউদ্দিন। পিতামহ আসমত আলী বেপারী থেকে বংশ পরম্পরায় লোক সংস্কৃতি চর্চার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার পরিবারে। পিতা ছিলেন লোকগীতি রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক-কবি। পুঁথিপাঠে ও তার দক্ষতা ছিল। সরকারি পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি বিভাগ ইত্যাদিতে গীতিকার হিসেবে চাকরী করতেন। বিষয়ভিত্তিক গান বেঁধে তাতে সুর লাগিয়ে নিজেই গান গাইতেন। কৃষিভিত্তিক গান তিনি বহু রচনা করেছেন। পিতা ও পিতামহের এই ঐতিহ্যকেই পরবর্তীতে মোহাম্মদ সাইদুর আশ্রয় করে নিজগৃহে লোক ঐতিহ্যের আশ্রম ও সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁর পূরণ হয়নি। এর আগেই তিনি এই ইহধাম ছেড়ে, সংসার ছেড়ে সাহিত্যচর্চার সহযোগীদের ছেড়ে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন।

মোহাম্মদ সাইদুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক '*পূর্বদেশ*' এবং সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'সহ কিছুকাল স্থানীয় সংবাদপত্র '*কিশোরগঞ্জ বার্তা*'র সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রথম লেখা ফিচার '*পূন্যতীর্থ সীতাকুন্ড*' শিরোনামে প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত '*দৈনিক পূর্বদেশ*' পত্রিকায়। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভাসানী আহুত কাগমারী সম্মেলনে জারীগানের দল নিয়ে সে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তাঁর প্রথম রচিত প্রবন্ধ '*দ্বিজ বংশীদাস*' প্রকাশিত হয়েছিল '*দৈনিক ইত্তেফাক*' পত্রিকায়।

তিনি প্রথমে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলা একাডেমিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সাথে বাংলা একাডেমি একীভূত হলে তিনি স্থায়ীভাবে নিয়োগপত্র পান। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমিতে তাঁর একক লোকশিল্প সংগ্রহ প্রদর্শনী হয়।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল আর্ট গ্যালারীতে ওপেন এয়ার প্রদর্শনীতে তাঁর নিজস্ব লোকশিল্প সংগ্রহের প্রদর্শনী হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদীনের সাথে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত যৌথভাবে নকশীকাঁথা প্রদর্শনী করেন। এছাড়া এই শেকড়সন্ধানী তাঁর সারাজীবনের সাধনার ফলস্বরূপ ভারত, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে ও বিদেশে সংবর্ধিত এবং পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর কর্মের স্বীকৃতি

হিসেবে পেয়েছেন ২০০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দে কারুশিল্পী পরিষদ থেকে সম্মাননা। তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং '*মোমেনশাহী গীতিকা*' ছাড়াও বিভিন্ন পালাগান তথ্য সংগ্রাহক ছিলেন।

'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' নামক পালাগানটি নিকলী উপজেলা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংগ্রহের জন্য মোহাম্মদ সাইদুরকে ভারতের কলকাতা শহরে সংবর্ধনা প্রদান করেন। সংবর্ধনা দিয়েছিলেন কলকাতা থিয়েটারে কর্ণধার বিভাস চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল শিশির মঞ্চে। মোহাম্মদ সাইদুর জাপানের ফুকুওয়াকা এশিয়ান আর্ত গ্যালারী ২০০১ খ্রিস্টাব্দে সম্মানসূচক ক্রেস্ট লাভ করেন। ইতিহাস সচেতনতা তাঁকে কিশোরগঞ্জের ইতিহাস রচনা ও সম্পাদনায় উদ্যোগী করেছেন। যৌথ সম্পাদনায় তিনি '*কিশোরগঞ্জের ইতিহাস*' রচনা করেছেন।[১৮]

প্রিন্স রফিক খান

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট নিকলী উপজেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী কারারবাড়ির মাতুলালয়ে জন্ম প্রিন্স রফিক খানের। কারার মরহুম রইছ উদ্দিন আহম্মদ ছিলেন তার মাতামহ। তিনি আজীবন নিকলী সদরে প্রথমে ইউনিয়ন বোর্ড এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন কাউন্সিলর-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। পৈত্রিক বাড়ি ভৈরব উপজেলার মানিকদী নামক গ্রামে। পিতামহ সাঈদ উদ্দিন খান (গিরানী মিয়া) ছিলেন একজন স্বনামধন্য তালুকদার। তার পূর্বপুরুষ অজর উদ্দিন খান ছিলেন একজন সেনানায়ক। সুদূর কাবুল থেকে আগত এক সম্ভ্রান্তমুসলিম অধিবাসী ছিলেন।

প্রিন্স রফিক খান সেই 'খান' বংশধারার একজন কৃতীসন্তান। পিতা মরহুম সিরাজ উদ্দিন খান এবং মাতা হাসিনা বেগম। তিনি বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের হয়বতনগর এলাকায় বসবাস করেন। হয়বতনগর ফিসারী রোডসহ মসজিদ-ই-এলাহীর তিনি সাধারণ সম্পাদক। কিশোরগঞ্জ জেলা শহরে যে ক'জন সাহিত্য সংগঠক সাহিত্য সম্মেলন কিংবা ছড়া উৎসব করে মাতিয়ে রেখেছেন প্রিন্স রফিক খান তাদের মধ্যে অন্যতম এবং উল্লেখযোগ্য।

প্রিন্স রফিক খান একজন সেরা সংগঠক ও সাহিত্য সম্পাদক। কিশোরগঞ্জে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গঠিত কিশোরগঞ্জ জেলা ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি প্রকল্পের (নিয়োগ প্রাপ্ত) একজন লেখক-গবেষক ও সদস্য। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর লোক সংস্কৃতি সমীক্ষা প্রকল্পের একজন (নিয়োগ প্রাপ্ত) গবেষক-সংগ্রাহক ও লেখক এবং সদস্য বাংলা একাডেমি, ঢাকা। বাংলাদেশ লেখক কল্যাণ সমিতি ঢাকা এর কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ন-সম্পাদক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি। তিনি কিশোরগঞ্জ সাংবাদিক এসোসিয়েশন, কিশোরগঞ্জ এর সভাপতি। রাজ্জাক-সখিনা কল্যাণ ট্রাস্ট এর ত্রৈমাসিক

সাহিত্য পত্রিকা '*আলোকিত কিশোরগঞ্জ*' এর সম্পাদক। সদস্য সচিব রাজ্জাক-সখিনা কল্যাণ ট্রাস্টের এবং আলহাজ্ব আবদুল কদ্দুছ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরী এর সদস্য। বৃহত্তম ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক। নিকলী প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবংনিকলী সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। নিকলী মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ কলেজ এর (প্রাক্তন) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব। নিকলী সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিন স্মৃতি সংসদ এর প্রতিষ্ঠাতা। নিকলী সিরাজ স্মৃতি সংসদ এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। নিকলী থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা '*হাওর তরঙ্গ*' এর প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা। বাংলাদেশ জাতীয় হাওর উন্নয়ন পর্ষদ কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ন-আহব্বায়ক। পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য অধিকার প্রকল্প 'জেলা স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন' কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটির তিনি উপদেষ্টা।

প্রিন্স রফিক খান কিশোরগঞ্জ জেলার একটি অনিবার্য নাম। তিনি একজন দক্ষ ও সফল আলোকচিত্র শিল্পীও বটে। তার সংগ্রহে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন আলোকচিত্র ও অনেক গুণীজনদেরজীবনীও তথ্য। তার প্রকাশিত গ্রন্থ '*কিশোরগঞ্জের লোক-ঐতিহ্য*' (২০০৭)। এছাড়া সম্পাদনা করেছেন দু'টি গ্রন্থ '*নরসুন্ধা পাড়ের ছবি, ছড়া ও কবিতা*' এবং '*কিশোরগঞ্জের লেখক জীবনী*'।

ফজলুল করিম খান চৌধুরী

ফজলুল করিম খান চৌধুরী কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার জমিদার বাড়িতে ১৩ বৈশাখ ১৩৪৩ বাংলা এবং ২৯ এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তৎকালীন জমিদার আব্দুল করিম খান চৌধুরী এবং মাতা আমিরুন্নেসা খাতুন চৌধুরানী। তিনি পাঠান সোনাপতি রাহাত খান মোয়াজ্জেম-এর অধ:স্তন পুরুষ। পাঠান সোনাপতি রাহাত খান মোয়াজ্জেম পাঠানের রাজ্য বিস্তারের সময় ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তারই উত্তরাধিকারী জনাব ফজলুল করিম খান চৌধুরী। শৈশবেই তিনি মাতৃহারা হন। তার শৈশব ও কৈশর কেটেছে জাওয়ার ও সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার রাজাপুর জমিদার বাড়ীতে। সেখানে খালাদের তত্ত্বাবধানে তিনি বেড়ে উঠেন। অতঃপর কিশোরগঞ্জ ফিরে এসে আজিমউদ্দীন স্কুলে ভর্তি হন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে গুরুদয়াল ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে পড়ালেখা করেন।ছাত্রাবস্থায় তিনি লেখালেখিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। কবিতা, গল্প, ছড়া, ও গান লিখতে থাকেন।সাহিত্যানুরাগী মন তাকে সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়তে প্রেরণা জোগায়। তিনি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ পাঠাতেন, বিশেষ করে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত '*দৈনিক জাহান*' পত্রিকায় তার উর্দু ভাষা থেকে অনুবাদকৃত 'মোল্লা ও শয়তান' রম্য গল্পটি প্রচুর পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে।

সেই সাথে তিনি গল্পকার বা অনুবাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এককালে তিনি ভারত থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'রাখালিয়া বার্তা' পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। তার সীমাহীন চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সরকারি ছাড়পত্র নিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে তিনি সক্ষম হন ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। তারও পূর্বে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ছাড়পত্র ছাড়া আরও একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন '*সাপ্তাহিক দূরবীন*'। সে সময়ে কিশোরগঞ্জ জেলায় আর কোনও সাপ্তাহিক কিংবা দৈনিক কোনও পত্রিকাই প্রাকাশিত হতোনা।

'*সাপ্তাহিক কিশোরগঞ্জ সংবাদ*' ছাড়পত্র নিয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সর্ববহুল প্রচারিত সাপ্তহিক পত্রিকা হয়ে উঠে। ফজলুল করিম খান চৌধুরী সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চর্চা উভয়টির সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। যেসময় নিজ সম্পাদনায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন সেসময় কিশোরগঞ্জ জেলায় সাহিত্যিক সাংবাদিক হিসেবে তার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু সাহিত্য চর্চায় তার যে গভীর অনুরাগ এবং এক্ষেত্রে তিনি যে সৃজনশীল কর্ম রেখে গেছেন তা এখনও অজানা রয়ে গেছে। সাংবাদিকাতায় ব্যস্ত থাকার কারণে তাঁর অনেকগুলো পান্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশ করতে পারেননি। জীবদ্দশায় তাঁর জীবন ও যৌবনে একটা বিশেষ অংশ ব্যয় করেছেন সাহিত্যকর্ম ও সংবাদপত্র প্রকাশনায় এবং সাংস্কৃতিক সেবায়। যার ফলশ্রুতিতে অনেকগুলো বই ও পান্ডুলিপি তিনি রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এই গুলোর মধ্যে রয়েছে একটি কবিতার বই যার নাম '*রুবাইয়াত*'। এই বইয়ে তিনি জীবন, জীবনতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, পারলৌকিকতা ইত্যাদির এক গভীর উপলব্ধির পরশ দিয়ে গেছেন। কাব্য ও নান্দনিকতায় এই বইটি উচ্চতার শীর্ষে আরোহন করেছে বলে মনে হয়।

গল্প লেখায় তার পারঙ্গমতা লক্ষ্য করার মত। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক জাহানে নিয়মিত তার অনুবাদকৃত উর্দু গল্প 'ফিত্রাতে শয়তান' বিভিন্ন পর্ব বিভিন্ন নামে যেমন, মোল্লা বেশে শয়তান, ঘোরার বেশে শয়তান, দাতার বেশে শয়তান ও অথিতির বেশে শয়তান দারুন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশেষ করে তার রচনাশৈলি বিশেষভাবে পাঠকের কাছে প্রশংসিত হয়। এছাড়া যেসব গল্প গ্রন্থ পান্ডুলিপি আকারে রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- দেওলিয়া, সুরের বাঁধন, ডাবল চান (রম্য গল্প), ভন্ড দরবেশ ইত্যাদি। কবিতা, গল্প ছাড়াও তার বেশকয়টি নাটকের পান্ডুলিপি রয়েছে, যার মধ্যে 'আনারকলি'-এটি একটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং 'নারী'-এই নাটকটি লোককাহিনী অবলম্বনে রচিত। তাঁর অনেকগুলো অনুবাদ কর্ম রয়েছে। বিশেষ করে উর্দু ভাষা থেকে অনুবাদকৃত বেশ কয়টি গল্পের মধ্যে 'ফিত্রাতে শয়তান', 'তিন নারী-তিন কাহিনী', 'ছাই' উল্লেখযোগ্য।

তিনি হয়বতনগর জমিদার বাড়ীতে নিজ বাসভবনে ১৯৯৪ সনের ৫ই জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন। তাকে হয়বতনগর জমিদার বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

মনিরউদ্দীন ইউসুফ একাধারে কবি, গবেষক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, শিশু-সাহিত্যিক, নাট্যকার, অনুবাদক ও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। তিনি ১৯১৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার গ্রামে এক সম্ভ্রান্তমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পারিবারিক পরিবেশে ফারসি, আরবী ও উর্দুর ব্যাপক চর্চা হলেও তিনি বাংলায় তাঁর সাহিত্যকীর্তিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে সরে যাননি। তাঁর জীবদ্দশাতে ২২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ বহুভাষাবিদ ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ছাড়াও সংস্কৃত ভাষাও জানতেন। আর এজন্য মৌলিক সাহিত্যকর্ম-কবিতা, উপন্যাস, কিশোর রচনাসহ অন্যান্য সাহিত্যকীর্তির বাইরে অনুবাদও উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে আছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে-তিনিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গরূপে মহাকবি ফেরদৌসী'র '*শাহনামা*' অনুবাদ করেছেন। এর বাইরেও রুমি, জামি, হাফিজ, গালিবেরও অনেক ফারসি-উর্দুসাহিত্য অনুবাদ করেছেন। এ অনুবাদকর্মে তিনি প্রত্যেকটি শব্দের মর্মার্থ এমনকি পাদটীকাও লিখেছেন। তিনি কবিতা-উপন্যাস কিংবা কিশোর সাহিত্যে অত্যন্ত সফল। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ সাহিত্য, চরিতকথা, কিশোরপাঠ্য গ্রন্থসহ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মহাকবি ইকবালের '*বাঙ্গেদারা*', '*বালেজিব্রীল*', '*জারবেকলীম*' ও '*আরমুগানে হেজাজ*' থেকে নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ সংকলন হিসেবে ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন তিনি প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সালে তার আলোচিত রুমির মসনবী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে, এটি বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফের অনন্য এবং বিস্ময়করসৃষ্টি '*শাহনামা*'র পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। তিনি '*ঝড়ের রাতের শেষে*', '*পনসের কাঁটা*', '*ওর বয়েস যখন এগারো*' এই তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর রচিত ২৪টি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ গভর্নরের স্বর্ণপদক পান। একই বছর তিনি হাবিব ব্যাংক সাহিত্যপুরস্কার, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্যপুরস্কার লাভ করেন।[২০] তিনি ১৯৯৩ সালে (মরণোত্তর) একুশে পদক পেয়েছিলেন।

রহিমা আখতার কল্পনা

১৯৬২ সালের ৭ আগস্ট কিশোরগঞ্জ শহরের রথখলায় (ঈসা খাঁ রোড) রহিমা আখতার কল্পনার জন্ম। পিতা মরহুম মোঃ আবদুল মোতালিব ভূঁইয়া এবং মাতা আনোয়ারা বেগম। একজন রুচিঋদ্ধ, আধুনিক ও সৃজনশীল লেখক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। রহিমা আখতার কল্পনার রচিত বইগুলো হচ্ছে- '*বেনোজলে বেহুলার ভেলা*' (কবিতা), '*পাখিদের পার্লামেন্ট*' (গল্প), '*পাথর সরিয়ে দাও*' (কবিতা), '*কেউ জানে না*' (কবিতা), '*দাহপর্ব*' (কবিতা) এবং '*নির্বাচিত শত কবিতা*'।

মোহাম্মদ আশরাফ

বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ আশরাফ ১৯৫১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাজিতপুর উপজেলার নিতারকান্দি (পশ্চিমপাড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোহাম্মদ তারু মিয়া এবং মাতা মোছাম্মৎ সালেহা খাতুন। কবি ও শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ আশরাফের মোট প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৪টি। যথাক্রমে- '*হৃদয়ে বৃষ্টি ঝরে*' (কবিতা, ১১৯৮৬), '*আমরা মরিনি*' (নাটক, ১৯৮৮), '*প্রাকৃতজনের গান*' (কবিতা, ২০০১) এবং '*নির্বাচিত কবিতা*' (কবিতা, ২০০৫)।[২১]

তিনি কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তার সম্পাদনায় '*স্বদেশবার্তা*' নামে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থের নাম '*কবিতাসমগ্র*'। তিনি ২৮ জুলাই ২০১৮ শনিবার মৃত্যুবরণ করেন।

শফিক আলম মেহেদী

শফিক আলম মেহেদী কটিয়াদী উপজেলার মুমুরদিয়া গ্রামে ১৯৫৩ সালের ২০ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃসুলতান উদ্দিন ভূইয়া, মাতার নাম মরহুমা হাজেরা বেগম। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে কর্মরত।

তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ '*মাধবী হৃদয় মেহেদীর রং*', '*বিরল নারী*', '*কদমের গন্ধ নেই*', '*ছিন্ন মেঘ*', '*মৃত্তিকা*' ও '*নির্বাচিত কবিতা*'। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 'কবি জসীমউদ্দীন পরিষদ পুরস্কার', 'পালক অ্যাওয়ার্ড' এবং কিশোরগঞ্জ ছড়া উৎসব ২০০৬ উপলক্ষে 'সুকুমার রায় সাহিত্য পদক ও সম্মাননা' লাভ করেন।[২২]

দেলওয়ার বিন রশিদ

দেলওয়ার বিন রশিদ ১৯৫৪ সালের ২১ আগস্ট তাড়াইল উপজেলার পুরুড়া গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি একই উপজেলার দড়িজাহাঙ্গীরপুর গ্রামে। তার পিতার নাম মোঃ আবদুর রশিদ খান এবং মাতার নাম বেগম রেনুয়ারা।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে '*ইস্টিশনে বিষ্টি*', '*ভেন্না পাতায় দই*', '*শাপলা পাতা শীতল পাটি*', '*খুকু সোনা চাঁদের কণা*', '*মননে ফোটা ফুল*', '*অপরাহ্নে বিনম্র উচ্চারণ*', '*নকশি কাঁথার ফুল*', '*নূরের ফুল হাত মুহাম্মদ (সা.)*', '*ছোটদের হযরত হামযা (রা.)*', '*ছোটদের ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম*', '*বিদ্রোহী কবির ছোটবেলা*' এবং '*ছোটদের স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২৩]তিনি 'কবি বন্দে আলী মিয়া স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার', 'সাংবাদিক আমির স্মৃতিসাহিত্য পদক', 'মনির উদ্দিন ইউসুফ স্মৃতিসাহিত্য পদক' এবং পঞ্চম কিশোরগঞ্জ ছড়া উৎসবে 'সুকুমার রায় সাহিত্য পদক' লাভ করেন।

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কাতিয়ারচর গ্রামের মাতুলালয়ে ১৯৫৮ সালের ১৫ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও কৃতী লেখক হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। তার প্রকাশিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলো হচ্ছে-*'ঈসা খান মসনদ-ই-আলা'* (১৯৯৪), *'ঈসা খান'* (২০০৫), *'ঐতিহ্য ও প্রকৃতির কবি আজহারুল ইসলাম'* (২০০৭) এবং *'কিশোরগঞ্জের কবিগান ও কবিয়াল'*।[২৪]

গবেষণাধর্মী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০৪ সালে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রবর্তিত গুণীজন সম্মাননাসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন।

সিরাজুল ফরিদ

সিরাজুল ফরিদ ১৯৪৩ সালের ১ অক্টোবর পাকুন্দিয়া উপজেলার সালুয়াদি (মসুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মিছবাহ উদ্দীন ভূইয়া এবং মাতা মঞ্জিলুন্নেছা। ডেসা'র সহকারী পরিচালক পদে চাকরি শেষে বর্তমানে অবসরে আছেন। তিনি একজন ছড়াকার। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও লেখালেখি করেন।

প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে অন্যতম *'লাগাম টেনে ধর'* (ছড়া, ১৯৮২), *'আমি রাজা হবো না'* (গল্প, ১৯৮৬), *'পায়রা নাচে সূর্য হাসে'* (কিশোরকাব্য, ১৯৯২), *'লড়াই গণতন্ত্রের'* (ছড়া, ২০০৬), *'বৈরী সময়'* (ছড়া, ২০০৭), *'মুক্তিযুদ্ধের ছড়া'* (২০০৮), *'কাশফুল সাদা চুল'* (কিশোরকাব্য, ২০০৯), *'বুকের ভিতর আগুন'* (২০১০), *'পঞ্চক'* (২০১০)। সম্পাদনা করেছেন *'সব সঁপেছি তাকে'* (১৯৭৩)।

১৯৮২ সালে খেলাঘর তাকে সম্মাননায় ভূষিত করে। ছড়াসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য চতুর্থ কিশোরগঞ্জ ছড়া উৎসব তাকে 'সুকুমার রায় সাহিত্য পদক ও সম্মাননা' প্রদান করে।

মহীউদ্দীন খান চৌধুরী

মহিউদ্দীন খান চৌধুরী ১৯৪১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জ উপজেলার কিরাটন (মিয়াবাড়ি) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম সিরাজউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী এবং মাতা মোছাঃ হাজেরা আক্তার চৌধুরী। তিনি একজন প্রবীণ কবি হিসেবে পরিচিত।

তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে- *'পিরিতির নকশা'* (আঞ্চলিক ভাষার কাব্য), *'বেদনা আমারি থাক'* (গীতিকবিতা), *'যে দেশে মানুষ ঘুমায়'* (সংগীত বিষয়ক) এবং *'আমি কেন পাব না তোমায়'* (কাব্য)। *'পিরিতির নকশা'* কাব্যের জন্য তাকে ২০০৫ সালে প্রথম কিশোরগঞ্জ ছড়া উৎসব উপলক্ষে 'সুকুমার রায় সাহিত্য পদক ও সম্মাননা' দেওয়া হয়।[২৪]

আশুতোষ ভৌমিক

কবি আশুতোষ ভৌমিক ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ২ অগ্রহায়ণ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলাই ইউনিয়নের পাটধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র ভৌমিক এবং মাতা স্বর্গীয় তরুলতা ভৌমিক। সত্তর দশকে কবি হিসেবে আশুতোষ ভৌমিকের উত্থান। বিভিন্ন জাতীয় পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *'ঝড়বাদলের দিনের গল্প'* (১৯৮০) এবং *'স্বপ্নেরা দ্যাখে স্বপ্ন'* (১৯৯২)। তিনি জেলা শহর থেকে *'বিন্যাস'* নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

জাহাঙ্গীর আলম জাহান ১৯৬০ সালের ১২ এপ্রিল কুমিল্লার ময়নামতিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার লতিবাবাদ ইউনিয়নের কাটাবাড়িয়া গ্রামে। পিতা শহীদ মোঃ জমশেদ আলী এবং মাতা লুৎফুন্নেছা বেগম। তিনি ছড়াকার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণাসহ সাহিত্যের নানা শাখায় তার বিচরণ। তার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ২৬টির বেশি। এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছে-*'ভালবাসার শেকড়'* (যৌথকাব্য, ১৯৮৮), *'তিন যুবকের ভালবাসা'* (ত্রয়ীকাব্য, ১৯৮৮), *'কিশোরগঞ্জের ছড়া'* (যৌথ, ২০০৬), *'কিশোরগঞ্জের কবি ও কবিতা'* (যৌথ, ২০০৭), *'কিশোরগঞ্জের কবি : নির্বাচিত কবিতা'* (যৌথ, ২০০৯)। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। এর মধ্যে ১৯৮৯ সালে জাতীয় গণগ্রন্থাগার প্রবর্তিত একুশের সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ছোটগল্পে শীর্ষস্থান অর্জন অন্যতম।[২৫]

ডঃ এ কে এম মাহফুজুল হক

মাহফুজ পারভেজের জন্ম ১৯৬৬ সালের ৮ মার্চ কিশোরগঞ্জ শহরের গৌরাঙ্গ বাজারের পিত্রালয়ে। পূর্ব-পুরুষের আদিবাস কুলিয়ারচরের লক্ষ্মীপুর গ্রামের বি.টি বাড়ি। পিতা ডা. এ.এ মাজহারুল হক ঢাকা মেডিকেল কলেজের আদিপর্বের ছাত্র, ভাষাসৈনিক, কিশোরগঞ্জ আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং *'আমার জীবন ও কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহের জীবনধারা'*সহ একাধিক গ্রন্থের লেখক। মাতা নূরজাহান বেগম সমাজসেবী।

কিশোরগঞ্জ আদর্শ শিশু বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও গুরুদয়াল সরকারি কলেজের শিক্ষাক্রম শেষে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরকার ও রাজনীতি' বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন *'দক্ষিণ এশিয়ার জাতিগত সংঘাত প্রশমন প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীলঙ্কা'*র ওপর গবেষণার জন্য।

১৯৭৩ সালে মাহফুজ পারভেজের প্রথম লেখা ছাপা হয় কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাব স্মরণীকায়। ছাত্রজীবন থেকে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আশির দশকের কিশোরগঞ্জের সাহিত্য-সাংবাদিকতায় উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন। সম্পাদনা করেছেন লিটল ম্যাগাজিন *'প্রতিধ্বনি'*। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পূর্ণ ও খণ্ডকালীন কাজ করেছেন *'নিউ নেশন'*, *'সাপ্তাহিক রোববার'*, *'বাংলাবাজার পত্রিকা'*, *'ইত্তেফাক'* ও *'জনকণ্ঠে'*। সাপ্তাহিক রোববারের ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সাংবাদিক, ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন। দৈনিক জনকণ্ঠের সূচনাকালে ছিলেন বিভাগীয় সম্পাদক। সাপ্তাহিক কাগজ, বিচিন্তা ইত্যাদিতেও নানাভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৯৩ সাল থেকে গবেষণা-অধ্যাপনায় জড়িত। বর্তমান কর্মস্থল রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি-লেখক। সকল জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার ও প্রতিবেদন।

প্রকাশিত গ্রন্থ: *'আমার সামনে নেই মহুয়ার বন; মানব বংশের অলঙ্কার'* (কবিতা), *'বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি; বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব'* (গবেষণা), *'একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ'* (প্রবন্ধ), *'শতাব্দীর বাংলাদেশ'* (সম্পাদনা), *'এক ডজন মজার বিষয়'* (কিশোর ফিচার), *'সুপারনোভা'*, (গল্প), *'মুঘল পরম্পরা'* (ইতিহাস), *'রক্তাক্ত নৈসর্গিক নেপালে'* (ভ্রমণ), *'পাশ্চাত্যের দশ দার্শনিক'* (দর্শন ও তত্ত্ব), *'বাংলা বানান সহায়িকা'* (ভাষা-ব্যকরণ), *'সুইসাইড বোম্বার ও এক ডজন মজার বিষয়'* (জ্ঞানকোষ) ইত্যাদি অন্যতম।

বেগম রাজিয়া হোসাইন

বেগম রাজিয়া হোসাইন ১৯৩৮ সালে ২ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ সদরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে কিশোরগঞ্জ এস.ভি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে লেটার ও মেধাবৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পাশ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছিলেন। তৎপূর্বে ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতেও তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ থেকে লেটার ও মেধাবৃত্তি বিভাগে আইএ পাস করেন। ১৯৫৯ সালে বিএ পাশ করে ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শ্রেণিতে বাংলায় এমএ পাশ করেন। ১৯৬০-৬১ সালে ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে ২য় শ্রেণিতে বিএড ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরর্বতীতে প্রধান শিক্ষকের জন্য আয়োজিত শর্ট কোর্সসহ বয়স্ক শিক্ষা, দূরশিক্ষন, পুষ্টিও শিশু শিক্ষা এবং অফিস বাব্যস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে শিক্ষা বিভাগীয় পরীক্ষা পাশ করেন।

স্কুল জীবন থেকে তার লেখালেখি শুরু। কবিতা-গল্প সবই লেখেন। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে *'নবারুন'* পত্রিকায়। *'শিরোনাম'*, *'বাংলা বর্ণমালা'* ও 'আমার দেশ'সহ দেশের বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা ও দৈনিকে তার লেখা প্রকাশিত হয়।

তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ হলো: *'বুকের ভিতরে নদী'* (কাব্যগ্রন্থ-১৯৮৬), *'শিকড় সমুদ্র খুঁজছে'*(কাব্যগ্রন্থ-১৯৮৭), *'ঘুম ভেঙ্গে যায়'* (কাব্যগ্রন্থ -১৯৮৭), *'গাঙ চিলের ঘর'* (গল্পগ্রন্থ -১৯৮৮), *'ঘাসের নূপুর'* (শিশুকিশোর কাব্যগ্রন্থ-১৯৮৯), *'জোবেদা খানম'* (জীবনীগ্রন্থ, বাংলা একাডেমি-১৯৯২), *'আলোকিত*

বর্ণমালা' (ভাষান্তর-১৯৯৩), *'ছোট্ট সোনার নাও'* (শিশুকিশোর কাব্যগ্রন্থ-১৯৯৩), *'রোদ্দুর হেটে যায় অন্ধকারে'* (কাব্যগ্রন্থ-১৯৯৭), *'পাতার শব্দে শব্দে'* (কাব্যকনিকা-১৯৯৮), *'আমি তোমাকেই ভালবাসি'* (গল্পগ্রন্থ-২০০১), *'শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম'* (জীবনচরিত সম্পাদিত-২০০১), *'ছোটদের বেগম রোকেয়া'*(২০০২), *'তেপান্ততেরর মাঠ পেরিয়ে'* (কিশোর উপন্যাস-২০০২), *'অন্তরঙ্গ উচ্চারন'* (প্রবন্ধ-যন্ত্রস্থ), *'বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বিচিত্রা'* (৭ম ও ৮ম শ্রেণি-১৯৮৬), *'ব্যাকারণ ও রচনা'* (৬ষ্ঠ শ্রেণি-১৯৯৩), *'ভাষা প্রকাশ ও ব্যাকারণ ও রচনা'* (৫ম শ্রেণি-১৯৯৬), *'সরস গল্প'* (৭ম শ্রেণির দ্রুত পঠন-১৯৯১), *'গল্প মেলা'* (৭ম শ্রেণির দ্রুত পঠন-১৯৯৮)।[২৬]

মুহম্মদ বাকের

মুহম্মদ বাকের ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ ১৭ জানুয়ারী কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানার সরিষাপুর গ্রামের মাষ্টার বাড়ীতে জন্মগ্রহন করেন। পিতা মরহুম আলহাজ্ব সামসুদ্দিন আহমদ এবং মাতা মরহুমা জহুরা আক্তার খাতুন। তার পিতামহ মাহমুদ মাষ্টার ছিলেন সরিষাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বলে তাঁকে মাষ্টার বলা হতো এবং এই নামেই 'মাষ্টার বাড়ী'র নামকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বার্মায় (মায়ানমার) বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনাব বাকেরের মাতামহ করম নেওয়াজ উকিল ছিলেন বাজিতপুর থানার প্রথম মুসলমান বিএল পাশ উকিল। তিনি বাজিতপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তার নামেই তার বাড়ীটি 'উকিল বাড়ী' নামে পরিচিতি লাভ করে। মুহম্মদ বাকেরের পিতা আলহাজ্ব সামসুদ্দিন আহম্মদ ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে দীর্ঘ বাইশ বছর হিলচিয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি জুরী বোর্ডেরও একজন সদ্যস ছিলেন। জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন।

তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ ছাড়াও পোলান্ডের ওয়ারশ শহরস্থ Central School of Planning & Statistics থেকে উচ্চতর শিল্প ব্যবস্থাপনায় পোষ্ট গ্রেজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। একজন নাট্যকার হিসেবে তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। ষাটের দশকে তিনি নিজ

গ্রাম সরিষাপুরে 'নাট্যগোষ্ঠী' নামে একটি নাট্যসংস্থা গঠন করেন। তখন তিনি ছিলেন মাধ্যমিক স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। নিজেই নাটক লিখে নাটক মঞ্চায়নের কাজ শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই নাট্যগোষ্ঠী নাট্যমোদীদের বিশেষ আকর্ষণ করে নেয় এবং ধীরেধীরে বাজিতপুর অঞ্চলে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। বাজিতপুরে সরিষাপুর নাট্যগোষ্ঠীই সর্বপ্রথম বিভিন্ন ধরনের নিরীক্ষাধর্মী আধুনিক নাটক মঞ্চায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে বেশ ক'জন খ্যাতিমান নাট্যব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেন। বাজিতপুর তথা সমগ্র পূর্ব ময়মনসিংহের প্রবাদপুরুষ প্রয়াত নাট্যশিল্পী হরিদাস বণিক এই নাট্য সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট নাট্যকার গোলাম শফিক ও বদরুজ্জামান আলমগীর এবং বিশিষ্ট গল্পকার কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর এই সংস্থার মাধ্যমেই সংস্কৃতি জগতে প্রবেশ করেছেন। মঞ্চনাটক লিখে যাত্রা শুরু করার পর সত্তরের দশকে মুহম্মদ বাকের বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর অনেকগুলো বেতার (শ্রুতি) নাটক রচনা করেন। তার লেখা বেতার নাটক- 'চম্পাবতীর মেইল ট্রেন', 'ক্ষুধিত পাষান' ও 'সরল বৃক্ষের কথা' এবং মঞ্চনাটক-'চিতাবাঘের কথা', 'চন্দ্রধরের পালা'সুধীমহলে বিশেষভাবে নন্দিত হয়েছে।

নব্বই এর দশক থেকে তিনি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর লেখালেখি শুরু করেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ইতোমধ্যে তার কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ কিশোরগঞ্জ ইতিহাস পরিষদ তাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেছেন। কিশোরগঞ্জ ছড়া উৎসব পরিষদ ২০০৭ সালে গবেষণাকর্মের জন্য তাকে সুকুমার রায় সাহিত্য পদক প্রদান করেছেন। মুহম্মদ বাকের বাংলাদেশ বেতারের একজন তালিকাভুক্ত গীতিকার ও ছড়াকার। তার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হল:[২৭]

- **মঞ্চনাটক:** অগ্নিশিখা, মহাবিদ্রোহ (স্পার্টাকাস অবলম্বনে), পিতৃঘাতী পাষন্ড (ইডিপাস অবলম্বনে), পলাশীর কান্না, চিতা বাঘের কথা ইত্যাদি।
- **বেতার নাটক:** যখন ফুলে বন্যা এলো, ক্ষুধিত পাষান এবং, ফিরোজা বেগমের দিনগুলো, তমা আমার তমা, সরল বৃক্ষের কথা, ছায়া ছায়া মেঘ রোদ্দুর, চন্দ্রধরের পালা, হেমলক কিংবা গরুর দুধ, কুসুম রঙ, উথাল পদ্মায় হরিপদ কেরানী, একদিন রোববারে, চম্পাবতীর মেইল ট্রেন ইত্যাদি।
- **গল্প থেকে নাটক:**শান্তি (মূল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), পোষ্ট মাষ্টার (মূল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), নসর-পেয়াদা (মূল-প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ), রানুর প্রথম ভাগ (মূল- বিভূতিভূষন মুখোপাধ্যায়), ফরমায়েসী গল্প (মূল- প্রমথ চৌধুরী), প্রাগৈতিহাসিক (মূল- মানিক বন্দোপাধ্যায়), আমাকে একটি ফুল দাও (মূল- আলাউদ্দীন আল আজাদ)।
- **শিশু কিশোর নাটক:** মিথ্যা বলার অনেক জ্বালা, দর্জি পাড়ার নতুন দা (শরৎ চন্দ্রের শ্রীকান্ত থেকে)।

- **ইতিহাস :**Glimpse of Cox's Bazar (১৯৯৫), বাজিতপুরের কথা (১৯৯৫), টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৯৭), লৌহিত্যে প্রতিরোধ (১৯৯৭), আরব ইতিহাসের মর্মান্তিক অধ্যায় (২০০৩), মুক্তিযুদ্ধে বাজিতপুর (২০০৭) ইত্যাদি ।

৬.৫ নাটক ও বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী

নাট্যচর্চায় ষোড়শ শতকের সাংস্কৃতিক রাজধানী খ্যাত কিশোরগঞ্জের ব্যাপক খ্যাতি রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রাপালার প্রচলন এ অঞ্চলে ছিল। তবে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এ অঞ্চলের মানুষ ব্যাপকহারে সংস্কৃতিচর্চায় সক্রিয় হয়ে পড়ে। এলাকার ব্যবসাকেন্দ্র ও বাণিজ্যিক বন্দরকে ঘিরে গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। ব্রহ্মপুত্রের তীরসংলগ্ন হোসেনপুর বাজার, মেঘনাতীরের ভৈরব নৌবন্দরসহ পাটের বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত হাওরের নিকলী ও তাড়াইল বাজারের ব্যবসায়ীদের বিনোদনকে কেন্দ্র করে নাচ-গানের অনুষ্ঠান এবং নাটক ও পালার আয়োজন হতো। তখনকার সময় হিন্দু সম্প্রদায় পূজাপার্বণে যাত্রাপালার আয়োজন করতেন। জানা যায়, ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে শিল্পীরা ভৈরবে 'রামলীলা' যাত্রাপালা পরিবেশন করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, বিদেশী বণিকরা নিকলীতে সাংস্কৃতিক চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন। পাটের বাণিজ্যকেন্দ্র নিকলীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে বিদেশী বণিকরা বিনোদনের জন্য প্রথমে সেখানে নাটক মঞ্চায়ন শুরু করেন ১৮৮৩ সালে। পরে সম্ভবত ১৮৯১ সাল 'কিশোরগঞ্জ নাট্যসমাজ' নামে একটি শৌখিন নাট্য সংগঠন গড়ে উঠে। তৎকালীন কিশোরগঞ্জ দেওয়ানি আদালতের একজন মুসেফের আগ্রহ ও কিছু কর্মচারীর মাধ্যমে এটি গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।[২৮] কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমির হলটি তখন এই নাট্যসমাজ কর্তৃক নির্মিত হয়। ইংল্যান্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ডের নামানুসারে হলটির নামকরণ করা হয় 'এওয়ার্ড হল'। পরে ১৯৫৮ সালে তৎকালীন কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক আবদুল করিম চৌধুরীর একান্ত আগ্রহ এবং স্থানীয় সংস্কৃতি সচেতন ব্যক্তি ও নাট্যকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এডওয়ার্ড হলকে আর্টস কাউন্সিল নামকরণ করা হয়।

এদিকে ১৯৩৫ সালে টাঙ্গাইলের অধিবাসী রমণী প্রসাদ তালুকদার নিকলীতে 'নিকলী থিয়েটার' নামে একটি নাট্য সংগঠন গঠন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে নিকলীতে গোড়াচাঁদ হাই স্কুলে স্থায়ী মঞ্চ তৈরি হলে এখানে প্রায় প্রতিমাসেই নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।

কিশোরগঞ্জের রথখলা পৌনে চারআনি বাড়ির জমিদার বিরাজ মোহন রায় তার বাড়িতে নাটকের আয়োজন করতেন। তিনি নাটকের প্রতিযোগিতারও আয়োজন করতেন। তিনি নিজে একজন উৎকৃষ্ট সেতারবাদক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ত্রিশের দশকে ভৈরবের বেণীমাধব ভট্টাচার্য 'ভৈরব অপেরা' নামে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। যা ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

সে বছরই ভৈরবে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ইয়ং ম্যানস প্রোগ্রেসিভ এসোসিয়েশন'। তারা প্রথম মঞ্চস্থ করেন 'টিপুসুলতান'। সুবোধ বাগচীর পরিচালনায় এ নাটকে অন্যান্যের মধ্যে অভিনয় করেছিলেন মোঃ জিল্লুর রহমান (সাবেক রাষ্ট্রপতি) ও কথাসাহিত্যিক মিন্নাত আলী। ১৯৫৭ সালে ভৈরবে প্রতিষ্ঠিত 'সাংস্কৃতিক সংঘ' এবং ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'শিল্পী পরিষদ' ভৈরবে নাটক ও সংস্কৃতির চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এসময় ভৈরবের নাট্যাভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন- নুরুল ইসলাম, মোখলেছ মিয়া, নুরুল হক, খুর্শিদ মাস্টার, মিহির সেন, মজিবুর, হীরা, আতাউর, মুর্শেদ আনোয়ার, বশীরউদ্দিন, শফিকুর রহমান অন্যতম।

তাছাড়া কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর, তাড়াইল, কটিয়াদীসহ বিভিন্ন এলাকায়ও নাটক মঞ্চায়ন ও সাংস্কৃতিক চর্চা কমবেশি হয়েছে। কটিয়াদীর বনগ্রাম, মসুয়া, আচমিতা, বানিয়াগ্রামেও নিয়মিত যাত্রাপালা ও নাটক মঞ্চস্থ হতো। কটিয়াদীর পশ্চিমপাড়ার জমিদার কুমুদ সাহা রায় তৎকালে একজন বিশিষ্ট নাট্যামোদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ওই সময় আচমিতা ও মসুয়ার বেশকিছু নাট্যকর্মীর আগ্রহে 'নাট্যসংঘ' গঠন করা হয়েছিল। এ সংগঠনটি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। তাড়াইলের দামিহা গ্রামের চৌধুরীবাড়ির তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশের দশকে নাট্য কোম্পানি নামে একটি যাত্রাদল সক্রিয় ছিল।

কিশোরগঞ্জের আর্টস কাউন্সিলকে ঘিরে তখন বেশকিছু প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব সক্রিয় ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডা. জেবি রায়, অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক চুণীলাল রায়, অধ্যাপক আতিকুল্লা চৌধুরী, এম এ আজিজ (মুক্তিযোদ্ধা), মোহাম্মদ সাইদুর, প্রিয়নাথ বসাক, অবনী বর্মন, বিরাজ মোহন রায়, নীলোৎপল কর, গিয়াস উদ্দিন খান, এটিএম সহিদ, অনন্তলাল সাহা, আবদুল খালেক প্রমুখ। অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ একাধারে নাটক লেখক ও নাট্যাভিনেতা ছিলেন। তাঁর রচিত 'ছিন্ন আশা' আর্টস কাউন্সিল মঞ্চে এবং রেডিও পাকিস্তান থেকেও প্রচারিত হয়েছিল। এম.এ আজিজ ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা। এছাড়া তিনি ছিলেন আলোর জাদুকর। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আর্টস কাউন্সিল মঞ্চে তার আলোসজ্জা ও আলো প্রক্ষেপণ অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তুলত। পরে নীলোৎপল কর আলোকসম্পাতে অধিকতর আধুনিকতা এনেছিলেন। অধ্যাপক চুণীলাল রায় নাট্য পরিচালনায় ছিলেন কুশলী কারিগর।

একসময় কিশোরগঞ্জে যাত্রাগানের বেশ প্রচলন ছিল। যাত্রাগানে তখন প্রধানত রাধাকৃষ্ণের লীলা, নৌকা বিলাস, নিমাই সন্ন্যাস ও মৈমনসিংহ গীতিকার মলুয়া পালা অবলম্বনে পরিবেশন করা হতো বাইদ্যার গান। জানা যায়, জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানরা এসব সংস্কৃতিচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ৬০ থেকে ৮০-র দশকে এখানে এক্সিবিশনের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল যাত্রাপালা অনুষ্ঠান। রথখোলা, স্টেডিয়াম ও পৌর মার্কেটে প্রায় প্রতিবছর মাসব্যাপী এক্সিবিশন হতো। সেই এক্সিবিশনের আকর্ষণ এই যাত্রাপালা দর্শকদের খুবই আনন্দ দিত। তখনকার যাত্রাপালায় বহু দর্শকনন্দিত অভিনেতারা হলেন যশোদলের এম.এ মোতালিব, ইটনার রাখালবন্ধু চক্রবর্তী অন্যতম।

এছাড়া অমলেন্দু বিশ্বাস, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তুষার দাশগুপ্ত, অঞ্জু ঘোষ, আমির সিরাজী, অরুণা বিশ্বাস এক একজন নামকরা যাত্রাশিল্পী ছিলেন। সে সময়কার যাত্রা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- নিউ গণেশ অপেরা, বীণাপাণি অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, সবুজ অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, নবযুগ অপেরা, কোহিনূর অপেরা, বুলবুল অপেরা ও বলাকা অপেরা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কিশোরগঞ্জে সংস্কৃতিচর্চায় নতুনধারার সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে তৎকালীন আর্টস কাউন্সিল (বর্তমান শিল্পকলা একাডেমি) ব্যাপক দায়িত্ব পালন করে। নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান, বাউল গানের আসর ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। আয়োজনের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জে একটি সংস্কৃতিচর্চার অনুকূল আবহ গড়ে উঠে। এসময় মাসাধিককাল একাধারে নাটক মঞ্চায়ন করা হতো। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পরিবর্তনজনিত কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গন ঝিমিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালে আর্টস কাউন্সিলকে ঘিরে আবার সংস্কৃতিকর্মীরা সক্রিয় হয়ে উঠেন। তখন সিরাজুল হক আঙ্গুর, অধ্যক্ষ জালাল আহমদ, সুধেন্দু বিশ্বাস, নীলোৎপল কর, মোঃ শামছুল হক চুনু, কাজল লোহ, মৃণাল দত্ত, মু আ লতিফ, কাজী শহিদুল হক মিলনসহ অনেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ওই বছর আর্টস কাউন্সিল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় আব্দুল্লাহ আল মামুনের নাটক 'এখন দুঃসময়'। একই বছর শৈলেশ গুহ নিয়োগী'র প্রহসনধর্মী নাটক 'ফাঁস' মঞ্চস্থ হয়। এসময় কিশোরগঞ্জে 'বৃহস্পতি নাট্য গোষ্ঠী' নামে একটি শক্তিশালী নাট্য সংগঠন জন্ম নেয়। এ সংগঠনের উদ্যোগে মঞ্চস্থ নাটকেই প্রথমবারের মতো কিশোরগঞ্জে অপেশাদার শৌখিন নারী নাট্যশিল্পীরা অভিনয় করেন। এদের মধ্যে নাসরিন সুলতানা ও ন্যান্সি অন্যতম। এরা ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট আবদুল জলিলের দুই কন্যা। এ সংগঠনটি যারা তৈরি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শহিদুল ইসলাম মতি, সিরাজুল হক আঙ্গুর, মুক্তি চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, বিভাস চৌধুরী, রুহুল আমিন প্রমুখ। এছাড়া ডা. সাহেব আলী পাঠান ও এডভোকেট এম.এ আফজাল সংগঠনটির শক্তি সঞ্চয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[২৯]

আশির দশকে কিশোরগঞ্জে নাটক ও সংস্কৃতিচর্চায় ব্যাপক জাগরণ তৈরি হয়। তখন বহু নাট্যকর্মীর আবির্ভাব ঘটে এবং বেশকিছু শক্তিশালী নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় গুরুদয়াল কলেজ ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় নাট্য সংগঠন গড়ে উঠে।

খড়মপট্টিতে তরুণ সংঘ ও কিশোর কাফেলা, হয়বতনগরে যুবক কল্যাণ সমিতি ও সেবক সংঘ নামে বেশক'টি সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এসময় বহু পেশাদার নারী নাট্যকর্মী সক্রিয় হন। এদের মধ্যে সবিতা, স্বপ্না, দীপালি, নুরজাহান, শুক্লা, রত্না, গীতা, মমতা, হেনা, চম্পা, সুরভী অন্যতম। তখন মঞ্চাভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সাইদুর রহমান মানিক, আলজুস ভূঞা, সফিউদ্দিন ভূঞা, উপল হাসান, মুক্তি চৌধুরীসহ অনেকে।

১৯৯৩ সালে গঠন করা হয় 'স্বরবর্ণ নাট্য মঞ্চ' (স্বনাম)। এর সভাপতি ছিলেন মৃণাল দত্ত, সম্পাদক ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম জাহান। নাটক মঞ্চায়নে এ সংগঠনটির যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। এরা আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'শাহজাদীর কালো নেকাব' ও 'তোমরাই', 'এখনো ক্রীতদাস', 'এখন দুঃসময়'; শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ফাঁস', কল্যাণ মিত্রের 'সাগর সেচা মানিক', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ'সহ বেশকিছু নাটক সফল মঞ্চায়ন করে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এ সংগঠনের অভিনেতারা হলেন এডভোকেট মোজাম্মেল হক খান রতন, মৃণাল দত্ত, গিয়াস উদ্দিন খান, দেবাশীষ ভৌমিক, নিখিল রঞ্জন নাথ টুক্কু, হারুন আল রশিদ, মোজাম্মেল হক মাখন, দিলীপ ধর, সেলিনা ইয়াসমিন কাকলি, ইয়াসমিন সুলতানা মিঠু, পূরবী দাস, আফরোজা সুলতানা সোমা, খুজিস্থা বেগম জোনাকী প্রমুখ। এ সংগঠনটি এককভাবে পাঁচ দিনব্যাপী নাট্যোৎসব করে তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল।[৩০]

তাছাড়া ২০০২ সালে জেলার একুশটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক মঞ্চ'। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'কিশোরগঞ্জ শিল্পী সমিতি', 'কিশোরগঞ্জ নাট্য পরিষদ', 'কমিউনিটি থিয়েটার' ও 'টিএন্ডটি নাট্য পরিষদ' নামের সংগঠনগুলোকে নিয়ে এরা স্থানীয় টেনিস গ্রাউন্ডে পাঁচ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে।

'কিশোরগঞ্জ শিল্পী সমিতি', 'কিশোরগঞ্জ নাট্য পরিষদ', 'কমিউনিটি থিয়েটার', 'টি এণ্ড টি নাট্য পরিষদ' এ জেলায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। টিএন্ডটি নাট্য পরিষদের মোঃ মোমতাজ উদ্দিন নিজে নাটক রচনা করে তা সংগঠনের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করেন। একই সংগঠনের মোঃ রফিকুল ইসলাম একজন কুশলী অভিনেতা হিসেবে পরিচিত। কমিউনিটি থিয়েটারের মোঃ সফিউদ্দিন ভূঞা, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, সৈয়দ আবদুর রশিদ, মোঃ শহিদুল্লাহ বাহার, মোঃখায়রুল ইসলাম ও মোঃ নুরুল ইসলাম সবাই নিয়মিত শিল্পী। একসময় কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন নাটকে কল্লোল ও হিল্লোল নামে দুই বোন শৌখিন শিল্পী হিসেবে নিয়মিত অভিনয় করতেন। এ সময় ফাতেমা আক্তার রত্নার নেতৃত্বে 'পিয়াস যাত্রা ইউনিট' জেলা প্রশাসনের অনুমোদন নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় যাত্রাপালা শুরু করে। এ যাত্রাদলের অন্য সদস্যরা হলেন এমএ কদুস, মোনায়েম হোসেন রতন, চম্মা হাসান, এমএ ফরহাদ, হাবিবুর রহমান, বাবুল চৌধুরী, ছেনু মিয়া, মহিউদ্দিন, সাধনা, হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

মানবাধিকার নাট্য পরিষদ গড়ে উঠেছে উদ্যমী সংগঠক হারুন আল-রশীদের তত্ত্বাবধানে। এরা কাজ করেন সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার-সংস্কৃতি চালু করার জন্য। নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা, যৌতুক বিরোধিতা ও নারীশিক্ষার প্রসার এবং জনগণকে মানবিক অধিকার-সচেতন করা তাদের সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। তাদের মঞ্চায়িত নাটকগুলোর মধ্যে-'নবাবের বঙ্গে আছি কত রঙ্গে', 'অন্ধের দ্বন্ধ', এবং 'বাঁধবেনীয়া' অন্যতম। এর সাথে আরো কাজ করছেন এএফএম আহাদ, হাফছা আফরিন বৃষ্টি, কবির উদ্দিন সোহেল, উম্মে আছমা নীপা,

আসাদুজ্জামান আসাদ, ফজলে এলাহী রকি, সায়রা বানু উমাইয়াসহ অনেকে।[৩১]মূলত কিশোরগঞ্জে রয়েছে এক সমৃদ্ধ নাট্যাঙ্গন। যা এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ এবং মানুষের মননকে করেছে উন্নত। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি চলমান এসব নাটক, নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্য সংগঠন এ অঞ্চলের মানুষকে করেছে উদার ও বন্ধুবৎসল এবং তৈরি করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন।

৬.৬ সঙ্গীত

ষোড়শ শতকের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হয়ে থাকে কিশোরগঞ্জকে। মূলত লোকজ কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যের সূচক ও শেকড়ের উৎস। কিশোরগঞ্জের পালাগান, পুঁথিপাঠ ও লোকসঙ্গীত সাধারণ মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। এখানকার জারিগান ও এর বিচিত্র পরিবেশনা শ্রোতামণ্ডলীর কাছে খুবই উপভোগ্য। এখানকার প্রতিটি গীতি ও নৃত্যনাট্য দৃষ্টিনন্দন ও অনন্যসাধারণ। বাংলা সাহিত্যের আদি নারী কবি কিশোরগঞ্জের গর্ব কবি চন্দ্রাবতী ও তাঁর পিতা দ্বিজবংশী দাস যেসব পালাগান ও সাহিত্য রচনা করেছেন, এসব আমাদের জেলার লোক সংগীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া এ জেলার অন্যান্য লোকজ সঙ্গীত, পালা, কীর্তন, কিসসা, জারি, প্রবাদ, প্রবচন, কবিগান, বাউল সঙ্গীত, পুঁথি, নৌকা বাইচের গান, ধাঁধা কিশোরগঞ্জের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্যতা ও স্বকীয়তারই প্রতীক।

কিশোরগঞ্জে সংস্কৃতির ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল হলেও এর চর্চার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। একসময় চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও তার পিতা দ্বিজ বংশীদাসের রচিত মনসামঙ্গল পালা এ অঞ্চলে গীত হতো। তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলিসহ পালাগান, মহানবীর জীবনী, হযরত আলী,হয়রত হামজার বীরত্বগাঁথা নিয়ে কাহিনীকাব্যের প্রচলন ছিল। এখানে মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা পালাগান, কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনী নিয়ে জারিগান, কবিগান, পুঁথিপাঠ, বিয়ের গান এবং গান ছাড়াও যাত্রাপালা, নাটক, ঝুমুর দলের নাট্যপালা মঞ্চায়ন হতো।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এ অঞ্চলের ব্যবসাকেন্দ্র ও বাণিজ্যিক বন্দরকে ঘিরে গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। ব্রহ্মপুত্রের তীরসংলগ্ন হোসেনপুর বাজার, মেঘনাতীরের ভৈরব নৌবন্দরসহ পাটের বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত হাওরের নিকলী ও তাড়াইল বাজারের ব্যবসায়ীদের বিনোদনকে কেন্দ্র করে নাচ-গানের অনুষ্ঠান এবং নাটক ও পালার আয়োজন হতো।

পাটের বাণিজ্যকেন্দ্র নিকলীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে বিদেশী বণিকরা বিনোদনের জন্য প্রথমে সেখানে নাটক মঞ্চায়ন ও নাচ-গানের আয়োজন, ক্রীড়া ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা করতেন। তাছাড়া হোসেনপুরের গাঙ্গাটিয়ার জমিদার পরিবারের সংস্কৃতির চর্চা ছিল। জমিদার ভূপতিনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী ছিলেন একজন সঙ্গীতসাধক।

ষাটের দশকে আর্টস কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শিল্পী সৃষ্টি ও সঙ্গীতানুরাগীর আবির্ভাব ঘটে। এসময় রবীন্দ্র সঙ্গীতে তপন চক্রবর্তী চৌধুরী ছাড়াও সঙ্গীতাঙ্গনে বিজন দাশ, সজল দেব, নারায়ণ সরকার, মানসুরা বেগম মনি, জয়া রায়, রুবি রায়, গৌরী রায়, মিনা পাল, শক্তি পাল সাহা বিপুল ভট্টাচার্য, খেলা বর্মন, আলপনা রায়, অসিত রায়, মৃণাল দত্ত ও আরো বেশকিছু শিল্পীর আবির্ভাব হয়। আরো পরে কাজল দেব, সীমা ভৌমিক, নিখিল রঞ্জন নাথ টুক্কু, শীলা মজুমদার, মাহমুদা আক্তার, রীমা নাথ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

কিশোরগঞ্জে ১৯৬০ সালে এবং এর কয়েক বছরের মধ্যে কিশোরগঞ্জে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠে। এরমধ্যে কল্লোল সমিতি, ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, ফাল্গুনী শিল্পী গোষ্ঠী অন্যতম।[৩২] এসব সংগঠন সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিশেষভাবে আলোড়িত করে তোলে এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এসব সংগঠন গণজাগরণের সৃষ্টি করে। ওই সময় তরুণ ও উদীয়মান শিল্পী মৃণাল কান্তি দত্ত একাধারে গান রচনা, সুরারোপ ও পরিবেশন করে মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন। ওই সময় কল্লোল সমিতির সাথে জড়িত ছিলেন এমএ আজিজ, এটিএম সহিদ, আনোয়ার হোসেন, গিয়াস উদ্দিন খান, সুধেন্দু বিশ্বাস, জহিরুল হক মজু, হেকমত সোলায়মান বিবেক, অনিল রায়, ডা. অমর চন্দ্র দে, কাজল লোহ, এসএ করিম কুসু, অনন্তলাল সাহা, মু আ লতিফসহ অনেকে। এদিকে ঝংকার-এর সাথে আরো ছিলেন সুশান্ত সাহা, বিপুল ভট্টাচার্য, রাখাল পণ্ডিত, মনসুরা বেগম মনি, ভবানী বিশ্বাস, মায়া বিশ্বাস, নারায়ণ দেব, কমল সরকার, বদিউল ইসলাম মতি, আবদুল হাই, শেখ সাকি রহমান ফ্লোরা, শামীম আরা নীপা, শুক্লা সরকার, উম্মে কুলসুম এলভিন প্রমুখ। এ সংগঠনটির সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন নাসির উদ্দিন ফারুকী, লিয়াকত হোসেন মানিক ও বিকাশ মজুমদার।

কার্টুনী শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল অধ্যাপক নরেন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। ১৯৬৭ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা বর্ষবরণ, বসন্ত উৎসব ও বিভিন্ন মৌসুমী অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বেশ সফলতা অর্জন করে। এ সংগঠনটি ১৯৬৮-৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় উদ্দীপক ও গণজাগরণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তখন এ সংগঠনটির সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে- তপন চক্রবর্তী চৌধুরী, বিজন কান্তি দাস, আরমান চৌধুরী, সজল দেব, কাজল দেব, প্রদীপ রায়, সবিতা বেগম, জাহিদুল হাসান মণি, সৈয়দ সবুর, সগীর আহমেদ, আবদুল হাই ও মনোজ গোস্বামী অন্যতম।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কিশোরগঞ্জে নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান, বাউল গানের আসর ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জে একটি সংস্কৃতিচর্চার অনুকূল আবহ গড়ে উঠে।তাছাড়া আশির দশকে কিশোরগঞ্জে নাটক ও সংস্কৃতিচর্চায় ব্যাপক জাগরণ তৈরি হয়।

খড়মপট্টিতে তরুণ সংঘ ও কিশোর কাফেলা, হয়বতনগরে যুবক কল্যাণ সমিতি ও সেবক সংঘ নামে বেশকটি সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করে। ডা. সাহেব আলী পাঠান ও এডভোকেট নবী হোসেনের নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জে লোকজ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'আউল বাউল শিল্পী গোষ্ঠী' গঠিত হয়। তারা কিশোরগঞ্জ স্টেডিয়ামে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাউল মেলার আয়োজন করে। এতে সারাদেশ থেকে শতাধিক বাউল শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। মেলার আয়োজকরা সেরা চারজন বাউল শিল্পীকে খেতাব প্রদান করেন। খেতাবপ্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন মোঃ আলাউদ্দিন (করিমগঞ্জ), সুধীর দাস (পূর্বধলা), মোঃ ইদ্রিস মিয়া (পূর্বধলা) ও শাহ গিয়াস উদ্দিন ফকির (কিশোরগঞ্জ)। উদয় শংকর বসাক ও লুৎফুর রহমানের উদ্যোগে তখন গড়ে উঠে 'হাক্কানী শিল্পী গোষ্ঠী'। এদিকে প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী বিজন দাসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ'। এ সংগঠন 'চন্দ্রাবতী' গীতি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। ১৯৯৯ সালে নির্মল চক্রবর্তী ও আরমান চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'লোকসঙ্গীত কেন্দ্র'। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুমন আহমেদ রঞ্জন গড়ে তোলেন 'লোকজ শিল্পী সংস্থা' (লোসাস) এবং কৃষি উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ সঙ্গীত রচনা ও গান পরিবেশনায় অবদান রাখায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সৈয়দ নুরুল আউয়াল তারা মিঞা তৈরি করেন 'উজিয়াল শিল্পী গোষ্ঠী'।

২০০২ সালে জেলা প্রশাসন ও শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ স্টেডিয়ামে তিন দিনব্যাপী লোকজ সাংস্কৃতিক জলসার আয়োজন করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ২২-২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠানমালায় কিশোরগঞ্জের হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন লোকজ উপাদান ও অবহেলিত গ্রামীণ সংস্কৃতি পরিবেশনা ও শিল্পীদের জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। এসব অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জের বিশিষ্ট পালাকার ইসলাম উদ্দিন ও তার দলের পালাগান, চারণ লোকশিল্পী আবদুর রহিম (খেলু পাগল), অন্ধ শিল্পী স্বপন মিয়া ও প্রতিবন্ধী শিল্পী মোঃ জসিম উদ্দিনের সঙ্গীত দর্শকদের বিমোহিত করে।

কিশোরগঞ্জে বহু সংগঠন ও শিল্পীর সুরের মাধুর্য গণমানুষের বোধ ও মননকে বিকশিত ও শাণিত করেছে। দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এখানকার সাংস্কৃতিক কর্মীরা একাত্ম থেকেছেন এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন এ জেলার বহু শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উদ্দীপকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রয়াস ও নিরলস সাধনা এখানকার সংস্কৃতিকে শীর্ষদেশে পৌঁছে দিয়েছে এবং কিশোরগঞ্জকেও গৌরবান্বিত করেছে। কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি অঙ্গনকে আরো যারা বিভিন্নভাবে মুখরিত ও আলোকিত করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দিলশাদ বেগম পুষ্প, বিনয় কর, মোঃ জসিম উদ্দিন হিরু, মাসুদুর রহমান আকিল, মোঃ মিজানুর রহমান, চন্দন দেবনাথ প্রমুখ। করিমগঞ্জের সঙ্গীতশিল্পী আবুল হাশেম বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের 'এ' গ্রেড শিল্পী।কুলিয়ারচরের তারেক-জুবায়ের দু'ভাই, জঙ্গলবাড়ীর রিজিয়া পারভীন আজ সারা দেশে পরিচিত। খ্যাতিমান রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী দেব্রত বিশ্বাস কিশোরগঞ্জের গর্ব। তবলে প্রসিদ্ধ ভবেশ ভট্টাচার্য, তপন বসাক, প্রমোদ চক্রবর্তী নলু, বাপ্পি ভট্টাচার্য, কুশল কিশোর বিশ্বাস, শংকর সরকার, দিলীপ কুমার দাস প্রমুখ।

পালাগান

কিশোরগঞ্জ অঞ্চল পালাগানে সমৃদ্ধ অঞ্চল। ১৯১৬ সালে ময়মনসিংহের কবি চন্দ্রকুমার দে প্রথম সেই এলাকার প্রচলিত পালাগান বা গাঁথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহে তা পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত পালা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামেই পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬৬ নাগাদ ক্ষিতীশ মৌলিক (প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা) এই ময়মনসিংহের পালাগুলির আরও একটি সম্পাদিত রূপ প্রকাশ করেন। আর এ পালাগানগুলোর মূল ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ অঞ্চল। প্রকাশিত হবার পরেই এই গাঁথাগুলি রসিক সমাজে প্রভূত সমাদর লাভ করে। কাব্যগুণ, সরলতা, বাংলার পল্লীজগতের সুর, রস, ও ঘ্রাণে সমৃদ্ধ এই সকল পালা, বাংলার লোক সাহিত্যের এক নতুন দিক খুলে দেয়। এর প্রাচীনতা নিয়ে পণ্ডিতেরা এখনও সহমত পোষণ করতে পারেননি। লোক সাহিত্য বলা হলেও এই পালাগুলির বিশেষ বিশেষ কবিদের লিখিত রচনা। তাই এগুলি কোন সমাজের সাধারণ সম্পত্তি নয়। লোকমুখে ফিরে ফিরে, সংগ্রাহক, সম্পাদক এবং প্রকাশকদের হাত পড়ে যে এগুলি নিজের প্রাচীনতা ও স্বকীয় বিশিষ্টতা অনেকটাই হারিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলোতেও হিন্দু ও মুসলমানদু'টি সংস্কৃতিই দেখতে পাওয়া যায়। এদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রধানত ধর্মাশ্রিত হলেও এদের উপর ধর্মের প্রভাব খুবই অল্প। এগুলো অধিকাংশই প্রণয়মূলক। এদের মধ্যে ফুটে উঠেছে পূর্ববঙ্গের পল্লী-জীবনের অপূর্ব আলেখ্য। এই পল্লী-জীবনের পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে নায়ক-নায়িকাদের প্রেম-ভালবাসা। এ জেলায় পালাগানগুলো স্থানীয় ভাষায় 'কিসসা' বা 'কিচ্ছা' নামে পরিচিত।[৩৩] ষোড়শ শতকের প্রথম বাঙালী মহিলা কবি চন্দ্রাবতীকে যাঁর নিজের জীবনই কিংবদন্তী হয়ে 'চন্দ্রাবতী' পালায় পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর লেখা 'রামায়ণ কথা' একটি এমন রচনা যেখানে রামের গুণগানের বদলে সীতাদেবীর দুঃখ দুর্দশাই তিনি বর্ণনা করেছেন। মৈমনসিংহ গীতিকার কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ রচিত 'চন্দ্রাবতীর পালা' এর বিস্তারিত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

চন্দ্রাবতীর পালা

ষোড়শ শতকের প্রথম বাঙালী মহিলা কবি চন্দ্রাবতীকে নিয়ে রচিত পালা গানই 'চন্দ্রাবতী' পালা। গীতিকাব্যটি রচনা করেছেন নয়ানচাঁদ ঘোষ, আনুমানিক ২৫০ বছর আগে। নেয়া হয়েছে দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে। মোট ৩৫৪টি ছত্র আছে এতে, দীনেশচন্দ্র সেন এগুলোকে ১২টি অঙ্কে ভাগ করেছেন। মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী একদিন পূজার জন্য ফুল তুলতে গেলে সুন্ধ্যা গ্রামের জয়ানন্দের সাথে দেখা হয়। প্রথমদর্শনেই জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর প্রেমে পড়ে যান এবং প্রেম নিবেদন করে একটি পত্র লেখেন। তাদের বাবা-মায়ের সম্মতিতে তাদের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়। এরইমধ্যে তাদের মাঝে এক মুসলমান তরুণীর আর্ভিভাব ঘটলে আসন্ন প্রণয়কাব্য করুণ উপাখ্যানে পরিণত হয়।[৩৪]

চন্দ্রাবতীর পালার কিছু অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ:

বাল্যকালে চন্দ্রাবতীর বন্ধু ও খেলার সাথী ছিলেন সুন্ধ্যা গ্রামের এক অনাথ বালক জয়ানন্দ। সে তার মাতুলালয়ে থাকতেন। পুষ্পবনে শিবপূজার ফুল তুলতে গিয়ে জয়ানন্দের সাথে তার পরিচয় ও সখ্যতা ঘটে।

চাইরকোনা পুষ্কুনির পারে চম্পা নাগেশ্বর।
ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তুল কে তুমি নাগর ॥
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐ না নদীর পার।
কি কারণে তুল কন্যা মালতীর হার ॥
প্রভাতকালে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে।
বাপেত করিব পূজা শিবের মন্দিরে ॥
বাছ্যা বাছ্যা ফুল তুলে রক্তজবা সারি।
জয়ানন্দ তুলে ফুল ঐ না সাজি ভরি ॥

জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর প্রেমে পড়ে যায় এবং চন্দ্রাবতীকে পত্র লিখেন-

পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে।
পুষ্পপাতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে ॥
পত্র লেখে জয়ানন্দ মনের যত কথা।
নিতি নিতি তোলা ফুলে তোমার মালা গাঁথা ॥

ক্রমে দু'জন প্রেমে পড়ে যায়। কৈশোরে অবতীর্ণ হলে দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন বলে স্থির করেন। বিবাহের দিনও স্থির হয়।

সম্বদ্ধ হইল ঠিক করি লগ্ন স্থির।
ভাল দিন হইল ঠিক পরে বিবাহের ॥
.....
পাড়ার যতেক নারী পান খিলায়।
যতেক নারীতে মিলি তাঁর গান গায় ॥
.....
বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন।
যতেক দেবতাগণের করিল পূজন ॥

ইতোমধ্যে জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়ে যায়। স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তা বা কাজীর মেয়ে আসমানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে জয়ানন্দ আসমানীকে একাধিক পত্র লিখেন। জয়ানন্দের সাথে চন্দ্রাবতীর প্রেমের কথা জেনেও আসমানী তার পিতাকে জানান তিনি জয়ানন্দকে বিবাহ করতে চান। কাজী জয়ানন্দকে ইসলাম

ধর্মে ধর্মান্তরিত করে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দেন। ঘটনাটি সেদিনই ঘটে যেদিন জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর বিবাহ স্থির হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা বিবাহের সাজে সজ্জিত চন্দ্রাবতী এই দুঃসংবাদ পায় এবং ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ভ হয়ে যায়-

কি কর লো চন্দ্রাবতী ঘরেতে বসিয়া।
সখিগণ কয় কথা নিকটে আসিয়া।।
শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে কান্দন।
শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন ॥
না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী ॥
মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুনে।

শোকবিহ্বল চন্দ্রা বিরহের জীবন অতিবাহিত করতে বেছে নেয় শিব সাধনাকে। আর এতে সমর্থন দেয় তার পিতা। তিনি ফুলেশ্বরী নদীর তীরে চন্দ্রাকে একটি শিব মন্দির স্থাপন করে দেন। ছোটবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকায় এ সময় চন্দ্রাবতী সাহিত্য সাধনায় ও শিব উপাস্যনায় আত্ম নিয়োগ করেন।

নির্ম্মাইয়া পাষাণশিলা বানাইলা মন্দির।
শিবপূজা করে কন্যা মন কর স্থির ॥
অবসরকালে কন্যা লেখে রামায়ণ।

ইতোমধ্যে বেশ কিছুকাল পরে জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারে আসমানীর প্রতি তার কেবল ছিল মোহ। আসলে সে চন্দ্রাবতীকেই ভালবাসে। অনুতপ্ত জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে তার মনের কথা বলতে পত্র লিখে পাঠান।

শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই ॥
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল ॥
.....
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমার পায় ॥
একবার দেখিব তোমায় জন্মশেষ দেখা।
একবার দেখিব তোমার নয়নভঙ্গি বাঁকা ॥
একবার শুনিব কন্যা মধুরসবাণী।
নয়নজলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দুইখানি ॥

না ছুঁইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া ।
পুণ্যমুখ দেখ্যা আমি জুড়াইব অন্তরা ॥
শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের মালা ।
তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতালা ॥
.....
ভাল নাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ঠ জনে ।
জন্মের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে ॥
এই দেখা চক্ষের দেখা এই দেখা শেষ ।
সংসারে নাহিক আমার সুখশান্তির লেশ ॥
একবার দেখিয়া তোমার ছাড়িব সংসার ।
কপালে লেখ্যাছে বিধি মরণ আমার ॥

জয়ানন্দের পত্রে চন্দ্রার সংকল্পিত ব্রহ্মচর্য, অবিচল সংযম ও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল । সে তার পিতার কাছে এর বিধান চাইলেন । পিতা কন্যাকে নিম্নরূপ সান্তনা দিলেন-

শুন গো প্রাণের কন্যা আমার কথা ধর ।
একমনে পূজ তুমি দেও বিশ্বেশ্বর ॥
অন্য কথা স্থান কন্যা নাহি দিও মনে ।
জীবন মরণ হইল যাহার কারণে ॥
নষ্ট হইল পুজার ফুল ছুঁইল যবনে ।
না লাগে উচ্ছিষ্ট ফল দেবের কারণে ॥
আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল ।
বিধাতা সাধিছে বাদ সব নষ্ট হইল ॥
তুমি যা লইছ মাগো সেই কাজ কর ।

পিতার কথায় কন্যা মনস্থির করলেন । জয়ানন্দকে পত্র দ্বারা নিষেধ করে পুনরায় সাধনা শুরু করলেন । তবুও জয়ানন্দ দেখা হলে বিচ্ছেদ মুছে মিলন হবে এই আশায় এক সন্ধ্যায় চন্দ্রাবতীর গ্রামে আসেন । চন্দ্রাবতীর বাড়িতে এসে তাকে ডাকাডাকি করেন । কিন্তু চন্দ্রাবতী তখন শিব মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় সেই শব্দ শুনতে পাননি । জয়ানন্দ তখন ব্যর্থ মনে লাল বর্ণের সন্ধ্যামালতী ফুল দিয়ে মন্দিরের দ্বারে চারছত্রের একটি পদে চন্দ্রাবতী ও ধরাধামকে চির বিদায় জানিয়ে চলে যান:

শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী ।

অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী ॥

পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত ।

বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত ॥

অনেক পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে চন্দ্রাবতী বুঝতে পারেন যে দেবালয় কলুষিত হয়েছে । দ্বার পরিষ্কার করার জন্য সে কলসী কাঁখে জল আনতে ফুলেশ্বরী নদীতে যান । গিয়ে দেখেন সব শেষ । নদীতে ভাসছে জয়ানন্দের দেহ । এই অবস্থায় তিনিও আবেগ ধরে রাখতে না পেরে ফুলেশ্বরীর জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করেন ।

একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ ।

জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ ॥

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান ।

ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান ॥

আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী ।

পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী ॥

কবিগান

কিশোরগঞ্জের লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে এ অঞ্চলের কবিগান । বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলের মানুষের বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম । যা বিস্তৃতি ছিল এ জেলার অন্যান্য অঞ্চলের । তবে বর্তমানে এর প্রচলন খুবই কম । আধুনিক জীবনধারায় এ ধরনের সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা খুব একটা দেখা যায় না । ক্রমান্বয়ে শহরাঞ্চলের দিকে ধাবিত জীবনে এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে ।

কবিগান একটি দীর্ঘতম সঙ্গীতানুষ্ঠান । কবিগানের মালসী, ভবানী, সখী সংবাদ, ভোর ইত্যাদি উপাঙ্গগীত আট প্রকারের সুরে চোদ্দটি স্তবকে বিন্যস্ত একটি অন্যতম প্রাচীন সঙ্গীত । প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মধ্যযুগে যে সকল কবির সন্ধান পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মনসামঙ্গলের কবি নারায়ন দেব (পনের শতক) এবং দ্বিজবংশী দাস (ষোড়শ শতক) । তবে কিশোরগঞ্জ জেলায় কবিগান যে প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পদ্মপুরাণ বা ভাসানগান রচনার গায়ক কবি নারায়ণ দেবের গ্রন্থে ।

কবিগানের উল্লেখযোগ্য অংশের বিষয়বস্তু দেব-দেবীর লীলা, বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণের লীলার বিভিন্ন পর্যায় থেকে গৃহীত । যেমন পূর্ব রাগ-অনুরাগ, রুপোল্লাস, অভিসার, মান, কালহান্তরন, বংশী শিক্ষা, প্রেম বৈচিত্র্য, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোল্লাস, মিলন দূতী সংবাদ, সুবল সংবাদ, উদ্ভব সংবাদ, প্রভাসযজ্ঞ ছাড়াও বৃন্দাদ্যুতি, কূটবুড়ি, ললিতা, বিশাখা, রঙ্গদেবী, সুচিত্রাদি, অষ্টসখী সেইসাথে সুবল সখা অন্যদিকে প্রেমের প্রতিবাদী-আয়ান ঘোষ জটিলা-কূটিলা, চন্দাবলী ও কুব্জা প্রমূখ চরিত্রের বিষয়াবলী নিয়েই কবিগানের বিষয়বস্তু

নির্ধারিত। কিশোরগঞ্জের কবিয়ালরা তাদের রচিত গানে ঐ সকল চিত্র নানা আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে কোন আসরে চৌদ্দ আনা অংশই থাকতো ঐ সকল গান। গান ও জবাব এর মধ্যেই কবিয়ালের কবিত্ব ও কৃতিত্ব নির্ধারিত হতো।

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের পনের শতকের কবি নারায়ণ দেব একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন পুরাণ ঘেঁষা কবি। তার লেখায় পৌরাণিক দেব-দেবীর লীলা বিষয়ক বর্ণনা আধিক্য লক্ষ্য করার মতো। ফলে প্রাক চৈতন্য যুগ থেকেই এই অঞ্চলের কবিরা দেব-দেবীর লীলা বর্ণনায় যেভাব তৈরী করেছিলেন তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য দেবের আগমনের ফলে।পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জের কবিয়ালরা কৃষ্ণ প্রেমের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন করেই তার গানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কবিয়ালদের আসর পরিচালনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছড়া পাঁচালী পরিবেশনের রীতিটা ছিল চমৎকার। তারা ছড়া ও পাঁচালী পরিবেশনায় ছিলেন খুবই পারদর্শী। টপ্পা পরিবেশনা ছিল কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কবিয়ালদের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই শতক থেকে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কবিয়ালদের রচিত গানে দেবদেবী ও পৌরাণিক নায়ক-নায়িকাদের কীর্তিকলাপ আলোচনার পাশাপাশি লোকজীবনের সুখ-দুঃখ,দুর্দশাও সমসায়িক ঘটনাবলীর বিবরণ উপস্থাপন করে কবিগানের বিষয়বস্তুতে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন। তাদের রচিত গানের বিষয়বস্তুতে দেশাচার, লোকাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্থিক অনটন প্রভৃতি সন্নিবেশিত করেছেন যুগের প্রয়োজনে। নীতিশিক্ষা এবং সমাজ শিক্ষার জন্য গাওয়া গান গুলোতে এই নিরক্ষর কবিরা সমাজের অভিজাত শ্রেণির মানুষের জন্য উপদেশ বিষয়ক কাব্য নির্মাণে প্রখর মেধাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। উপস্থিত রচনার জবাব, টপ্পা, ছড়া, পাঁচালী ছিল কবিগানের এক ধরনের প্রাণ। বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে ফেলেই জবাব, টপ্পা, ছড়া, পাঁচালী পরিবেশন করা হতো। কারণ কবিগানের আসরে বিষয়বস্তুহীন কোন রচনাই শ্রোতারা গ্রহণ করতোনা। কিশোরগঞ্জের কবিয়ালরা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে কাঠামোতে বেঁধে গান রচনা করতেন। তাদের কবিত্ব শক্তি এতবেশী ছিল যে, আসরে উঠে তৎক্ষণাৎ আসর উপযোগী কবিতা বা গীত রচনা করার অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তাঁরা। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কবিয়াল বেশীর ভাগ ছিলেন খুবই কম শিক্ষিত।

কিন্তু তারপরেও শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিদের মতই রামায়ণ মহাভারতের অধ্যায় তারা মন্থন করতেন। তাই ধর্ম সাহিত্য বা ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিয়াল সরকারদের গীত অথবা কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্য সমৃদ্ধি হয়েছে। কবিয়ালদের গীত অথবা কবিতায় শব্দচয়নে বাক্য নির্মাণে, কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোকজ পরিমন্ডলের শব্দ সংযোজনে, বিশেষ করে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের রসমিশ্রিত আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগে কবিগানের

কবিত্ব ছিল কাব্যোত্তীর্ণ। বিষয়টি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কবিগানের সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের লৌকিক চেতনা থেকে। কারণ কবিগানের মূল বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। বিরহ পর্যায়ের গানগুলোতে কবিয়ালদের কবিত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই কাব্যোত্তীর্ণ হয়েছে। যেমন: নিম্নের বিরহ গানের অংশ থেকে অনুধাবন করা যাবে-

সখি যে বনে আমায় নিয়ে করত ভ্রমন
অনুক্ষন ভুলে তথায় করি অন্বেষন
যেন তারে দেখি দেখি
ও ভুলের দেশে ভাল থাকি
ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখি আগুনে আবৃত বৃন্দাবন।[৩৫]

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে কবিয়ালরা বন্দনা ছাড়ায় আসর শুরু করতেন না। ঐ সকল বন্দনা ছড়ার রচনা নৈপূণ্য এবং কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিগান মূলত সঙ্গীত, কিন্তু গ্রাম্যগীতি। গানের আসরে পরিবেশন করার জন্য রচিত হয় কবিগান। কবিয়াল সরকার গান রচনা করে সুর ও তাল তিনিই নির্দেশ করে থাকেন।

ঘাটু গান

'ঘাটু গান' কোথাও কোথাও ঘাঁটু, ঘেটু, ঘেঁটু, গেন্টু, ঘাড়ু, গাড়ু, গাঁটু বা গাড়ু ইত্যাদি বহুনামে অঞ্চলভেদে পরিচিত। তবে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে এটি 'ঘাটু' এবং 'গাড়ু' নামেই বহুল প্রচলিত। কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলা তথা গোটা হাওর অঞ্চল ছিল এই গানের আবাসভূমি।

কিশোরগঞ্জের সবচেয়ে প্রাচীন সঙ্গীতের ধারা কবিগান, ভাসানগান, ঘাটুগান। ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কৃতির রাজধানী বলে পরিচিত এই কিশোরগঞ্জের মাটি ও মানসে আজ থেকে পাঁচশত বছর আগেও এতদঞ্চলে কবিগান গীত হতো বলে লোককাব্য পদ্মপুরাণে এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে। কবিগান-ঘাটুগানও সেই আমলেরই একটি প্রাচীন সঙ্গীত ধারা। যা আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে।[৩৬]

ঘাটু গানে প্রধান আকর্ষণ ঘাটু চরিত্র। একজন সুন্দর কিশোর মেয়ের সাজে সজ্জিত হয়ে নৃত্য করত। ঘাটু ছেলেদের মাথায় লম্বাচুল রাখা ছিল বাধ্যতামূলক। ঘাটু গানের মূলবিষয়বস্তু ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা। চিরায়ত এ প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করেই রচিত হতো ঘাটু দলের গান। আসরে উঠে ঘাটু প্রথমে বন্দনা গাইতেন। এরপর প্রেম, প্রেমতত্ত্ব, মান, অভিমান, বিচ্ছেদ, মিলন, সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে প্রবাহিত হতো তার গীতধারা। শ্রী কৃষ্ণের মথুরা গমণের পর অথবা তার সান্নিধ্য না পেয়ে রাধার বিরহ উপলক্ষ করে রচিত বিচ্ছেদ গানগুলোতে পরিলক্ষিত হতো চিরন্তন বেদনার সুর।

যেমন:

আমার মনের বেদন
সে বিনে কেউ জানে না
কালা যখন বাঁজায় বাঁশি
তখন আমি রান্তে বসি
বাঁশির সুরে মন উদাসী
ঘরে থাকতে পারি না
আমার মনের... ।

হিন্দুধর্মের রাঁধা-কৃষ্ণ কাহিনীই ঘাটু গানের মূল প্রতিপাদ্য হলেও এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্মের নানা বিষয়সহ নর-নারীর সাধারণ প্রেম-বিরহ এবং সমসাময়িক বিষয়বস্তুও উঠে আসে ঘাটু গানে। কারণ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই ছিল ঘাটু গানের দর্শক-শ্রোতা। ইসলাম ধর্মের নানা কাহিনী নিয়ে রচিত গানগুলো কোথাও কোথাও লেটো গান নামে পরিচিত।[৩৭] যেমন-

দয়াল আল্লা ডাকি কাতরে
দয়ার সাগর তুমি দয়া কর আমারে।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মূলাধার
তুমি বিনেকে তড়াইবে ভব পারাবার।
রহিম-রহমান তুমি আল্লা তোমার মেহেরবানী
তুমি দরিয়া শুকাইতে পার পাহাড়ে নেও পানি।।

ঘাটু গানে ধীরে ধীরে কদর্যতা ঢুকে যায়। হাওর অঞ্চলের সৌখিনদার লোকের ঘাটুদের ভাড়া করে বাসায় আনা শুরু করলো। আর এ কারণে শৌখিনদারের স্ত্রীরা চোখের জল ফেলতেন। অনেকে আবার ঘেঁটুপুত্রকে দেখতেন তার সতীন হিসেবে। এই নিয়ে গান আছে-

"আইছে সতিন ঘেঁটুপুলা
তোরা আমারে বাইন্ধা ফেল
পুব হাওরে নিয়া..."

ব্রিটিশ শাসন আমলে এবং ব্রিটিশরা চলে যাবার পরেও ঘেঁটু গানের আসর হতো। তবে এই গান আজ বিলুপ্ত।

৬.৭ বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারবৃন্দ

মধ্যযুগীয় কিশোরগঞ্জের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী তাঁর কাব্য-সাহিত্যে বলেছেন- "গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গান" ছিল সেকালে কিশোরগঞ্জের লোক-ঐতিহ্য। কবি-সাহিত্যিক, গ্রামীণ লোককবি, চারণকবি

আর চারণ বৈরাগীর লীলাক্ষেত্র কিশোরগঞ্জ। লোককবি, চারণকবি ও চারণ বৈরাগীদের পাশাপাশি আর এক শ্রেণির বাউল সাধক সংগীত গায়ক কবি রয়েছেন, যারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে একতারা-দুতারা বাজিয়ে কথায় কথায় মুখে মুখে গান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সুর দিয়ে গাইত। আমাদের মাঝে অনেক সংগীত শিল্পী ও তাদের গান আজও অমর হয়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে মামুদজান ফকিরের গান, ফকির চান্দের গান, আলাউদ্দিনের গান, মকবুলের গান, অখিল ঠাকুরের গান, অমর শীলের গান, যামিনী কুমার দেবনাথের গান, মোহাম্মদ মাতু মিয়ার গান, তাহের উদ্দিন খানের গান, আবদুল জলিলের গান, ইয়াকুব আলীর গান, আব্বাস উদ্দিনের গান, কানা বাছিরের গান, কানা স্বপনের গান, আঃ রহিম ওরফে খেলু পাগলার গান, শারীরিক প্রতিবন্ধী মোঃ জামিরের গান, লাই বক্স এর গান, লাল চান্দের গান, পানু মাস্টারের গান, হারিছ মোহাম্মদের গান, সফর আলী ফকিরের গান, ইন্তাজ ফকিরের গান, খলিল ফকিরের গান, নূর হোসেনের গান, নূরে খান শাহর গান, ছাত্তার মিয়ার গান ও আনোল শাহ-এর গান উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ঐতিহ্যবাহী কিশোরগঞ্জ জেলার বিখ্যাত শিল্পী ও কবিয়ালদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

গণসঙ্গীত শিল্পী নিবারণ পন্ডিত

গণসঙ্গীত শিল্পী নিবারণ পন্ডিতের জন্ম ১৯১৫ সালে কিশোরগঞ্জ সদর থানার সগড়া গ্রামে। পিতা ভগবান পন্ডিত আর মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী। রশিদাবাদ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা তারপর কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে তিনি অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কঠোর দারিদ্রে পতিত হয়ে নানা পেশায় তার জীবন ও জীবিকা পরিচালনা করেছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৮]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে টংক, হাজং ও তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শুরু করেন গণসঙ্গীত ও গণকবিতা রচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত চর্চা। তার টংক কথা, হাজং আন্দোলনের গান, জনযুদ্ধের গান ইত্যাদি গণসঙ্গীত বৃহত্তর ময়মনসিংহের কৃষক আন্দোলনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তি পেয়ে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫০সালে তিনি সপরিবারে ভারতে চলে যান। প্রতিভাবান গায়ক কবি নিবারণ পন্ডিত প্রায় তিন শতাধিক গণসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। কঙ্কন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় তার গানের সংকলন 'নিবারণ পন্ডিতের গান'(১৯৮৬) নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজও শিল্পীদের মুখে নিবারণ পন্ডিতের নাম উচ্চারিত হয়। পাকিস্তান সরকার নিবারণ পন্ডিতকে বাংলাদেশ থেকে বিতারিত করলেও পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় সরকার ১৯৮১ সালে ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে তাদের রাজ্য সরকার গণসঙ্গীতে এই বিখ্যাত গায়ক কবি ও শিল্পীকে 'সম্মাননা' প্রদান করেছিলেন।

বাউল অখিল গোস্বামী

বাউল অখিল গোস্বামীর জন্ম তাড়াইল উপজেলার সুলতানপুর গ্রামে। কিশোরগঞ্জ তথা পূর্ব ময়মনসিংহের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। বাংলা ১৩২০ সনের বৈশাখ মাসে তার

জন্ম। বালক অখিল স্কুল থেকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বাউলের বৈঠকখানার গানের আসরের প্রতি। সে থেকে স্কুলের নাম করে সারাদিন বাউলের বৈঠকখানায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। তার নিজের কথায় তিনি এর উত্তরও দিয়েছেন-

'যারে ধরে পাগল চান্দে।
কী করে তারে ফাঁদে-বান্ধে'॥[৩৯]

তিনি পাচঁশ'র বেশি গান রচনা করেছেন, তার মধ্যে চারটি পাণ্ডুলিপি আকারে সাজিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা প্রকাশিত হয়নি। 'সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী'-এ গানের কথা, সুর ও শিল্পী তিনি নিজেই। এই বাউল ও চারণকবি অখিল গৌস্বামী কিশোরগঞ্জের গৌরব।

দেশ বিভাগের সময় ঢাকায় নাজিমউদ্দিন রোডে প্রথম রেডিও অফিস স্থাপিত হলে তিনি নিয়মিত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। কিন্তু অফিসের কর্মকর্তার সাথে বনিবনা না হওয়ায় রেডিওর চাকরি ছেড়ে দেন। কিশোরগঞ্জের আর্টস কাউন্সিল (শিল্পকলা একাডেমি) মঞ্চে বিভিন্ন সময় তিনি নিজের লেখা অনেক গান গেয়ে শ্রোতা-দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁকে কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনা দিয়েছিল। কিন্তু অভাব অনটন ঘুচেনি। অখিল গোস্বামীর রচিত একটি গানের পঙক্তি নিম্নরূপ:

আমার মন তো বসে না গৃহকাজে সজনী গো
অন্তরে বৈরাগীর লাউয়্যা বাজে।
সজনী গো কী করিব কোথায় যাব
এই দুঃখ কাহারে জানাব
মন মিলে তো মানুষ মিলে না।[৪০]

ভাটকবি ছফিরউদ্দিন

ভাটকবি ছফিরউদ্দিনের জন্ম বাংলা ১৩০৭ সনে সদর উপজেলার লতিফাবাদ ইউনিয়নের কাটাবাড়িয়ার ডাউকিয়া গ্রামে। বাবার নাম আদম খান। স্কুলজীবন থেকেই তিনি গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে, সভা-সমিতিতে স্বদেশে জমিদারদের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের জন্য প্রেরণামূলক গান গেয়ে বেড়াতেন তিনি। ১৯২৯ সালে কিশোরগঞ্জ রামানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় শিক্ষাজীবন ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গের কৃষক দুর্দশার চিত্রসহ মুক্তির পথনির্দেশক *'মুক্তিমন্ত্র'* নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। জানা যায়, কবি ছফিরউদ্দিন প্রায় পাঁচশ গান ও কবিতা লিখেছিলেন, পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু দারিদ্রের কারণে পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে পারেননি।[৪১] ১৯৩৭ সালে সংসার নির্বাহের জন্য কবি ছফিরউদ্দিন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এই পেশা থেকেই অবসর নেন। ১৯৭১ সালে তিনি পরলোকগমণ করেন।

রামু সরকার

কিশোরগঞ্জের ঊনবিংশ শতকের কবিয়ালদের মধ্যে রামু সরকার ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাধর কবি। রামু সরকার জাতিতে ভূঁইমালী ছিলেন। তিনি ১২৭৪ সনের বাংলা চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল রামপ্রসাদ এবং মাতার নাম ছিল রায়মনি। কবিয়াল বিজয় আচার্য ১৩২১ সনের *'সৌরভ'* পত্রিকায় মাঘ মাসের সংখ্যায় রামু সরকারের উপর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন। কবিয়াল রামু সরকার বিখ্যাত হবার পিছনে রামুর জন্মস্থান আউটপাড়ার বহুদর্শী পণ্ডিত সাধু ব্যক্তি অমরচন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদান ছিল ব্যাপক। অমর চন্দ্র ছিলেন রামু সরকারের শিক্ষাগুরু।

রামু ছিলেন স্বভাব কবি। তাই বাল্যকাল থেকে তার কাব্য প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। রামুর কবি প্রতিভা লক্ষ্য করে অমরচন্দ্র সাথে সাথেই তাকে শিষ্য করে নিয়েছিলেন। তবে রামু ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তার স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। বিজয় নারায়ণ আচার্য বলেছেন-"রামুর স্মরণশক্তি ছিল সংসার ছাড়া। একবার যা শুনতেন আর ভুলতেন না"।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভগবত, চণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণপ্রভৃতি বহুগ্রন্থ মুখে মুখে শুনে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ১৪ বছর বয়সে রামু সরকার কবির দলে প্রবেশ করে ২০ বছর বয়সের মধ্যেই কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। রামু সরকার চৌপদী ছড়া ছাড়াও পাঁচালীতেও তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অনেক সময় তিনি পাঁচালী বলতে বলতে ভারাক্রান্ত হয়ে কেঁদে আকুল হয়ে পড়তেন বলে বিজয় আচার্য তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। বিজয় আচার্য তিনিও একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। অনেক সময় তার সাথেও কবিগানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন রামু সরকার।[৪২]

রাম কানাই

কিশোরগঞ্জের ত্রিরাম কবিয়ালের অন্যতম রাম কানাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহরের গাইটালে যুগীপাড়া গ্রামে। রামকানাই ছিলেন যুগী সম্প্রদায়ের লোক। বর্তমানে ঐ যুগীদের কোন বাসস্থান ঐ স্থানটিতে আর নেই। বিগত শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত রাম কানাইয়ের পরিত্যক্ত ভিটাটি দেখা যেত। রাম কানাইয়ের এক শিষ্য ছিল সদর থানার কাতিয়ারচর গ্রামের কাসু ঠাকুর। কাসু ঠাকুর রাম কানাই সম্পর্কে অনেক কথাই মুখে মুখে বলেছেন কিন্তু সেগুলো লিখিত হয়নি। তাছাড়া কবিয়াল বিজয় আচার্য রাম কানাই সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছিলেন তা থেকে গবেষক যতীন সরকার তার প্রবন্ধে কিছু উপস্থাপন করেছেন। যেমন- রামুমালী, রামগতি এবং রাম কানাই প্রায় সময় একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে কবিগানের আসরে অংশগ্রহণ করতেন। একটি আসরে রাম গতিশীল রামুকে যুগী বলে বিদ্রুপ করে গাইলেন-

যুগী কখনও হিন্দু নয়

তার সন্দেহ কি আছে

মহারানির আমলে

মিলে সবে যুগীর দলে

দরখাস্ত লেখে কোম্পানির ।[৪৩]

ঈসান নাথ

কিশোরগঞ্জের কবিগানের ধারাবাহিকতায় বিগত শতাব্দীর কবিয়ালদের মধ্যে ঈসান নাথ উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানার ভাটগাঁও ছিল কবিয়াল ঈসান নাথের জন্মস্থান। তবে সংরক্ষণের অভাবে প্রতিভাধর এই কবি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। যতদূর সম্ভব কিশোরগঞ্জের ত্রিরাম কবিয়ালদের মৃত্যুরপর ঈসান নাথ খ্যাতিমান হয়েছিলেন।শুধু ভাষা-ছন্দেই নয়, কবিয়ালরা তাদের তাৎক্ষণিক রচিত কবিতায় উপাদান হিসেবে শ্রোতাদের মানসিক প্রবণতার চাহিদা অনুভব করে ভাব আহরণের বিষয়টি ছিল খুবই চমৎকার। ঈসান নাথ ছিলেন তেমনই একজন কবিয়াল।

মামুদজান ফকির

মামুদজান ছিলেন সংসার ত্যাগী আধ্যাত্মিক সাধক ও সংগীতপ্রিয় গায়ক, লোককবি। শিশু বয়সে তার পিতা-মাতার মৃত্যু ঘটে। নিকলী উপজেলার গোবিন্দপুর নামক গ্রামে অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ির পাশে ছিল বিখ্যাত চন্দ্রনাথ ও আদুরীনাথ গোঁসাই'র দু'টি আখড়া। শৈশবেই তার গানের প্রতি ঝোঁক ছিল। ফলে একটি তার গ্রাম গোবিন্দপুর অন্যটি পাশের গ্রামে ষাইটধার, এই দু'টি আখড়ায় নাথ ধর্মীয় সংগীতের সুন্দর পরিমণ্ডল ছিল। গানের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ দেখে তৎকালীন নাথ ধর্মীয় অন্যতম সাধক পুরুষ আদুরীনাথ তাকে সংগীতে দীক্ষা দেন এবং তার আখড়ায় কৃষিকাজের জন্য রাখাল হিসেবে আশ্রয় দেন। পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করে মামুদজান চলে যান নিকলী উপজেলার মজলিশপুর নামক গ্রামের পাশে উন্মুক্ত হাওর এলাকার ফকির ভিটায়। গুরু আদুরীনাথের ন্যায় মামুদজান ফকির অসংখ্য গান রচনা করেন। তিনি মূলত মুর্শিদী, মারফতি ও আধ্যাত্মিক গানের সাধক ছিলেন। এখনও তার গান শিষ্যদের কণ্ঠে গীত হয়।[৪৪]

তৎকালীন ফকির সমাজে মামুদজান ফকিরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার গুরু ভক্তি ও সংগীত রচনা শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে আদুরীনাথের জীবদ্দশায় তিনি জনগণের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। মামুদজান ফকির নিরক্ষর ছিলেন। অথচ ফকিরিমতে দীক্ষিত হওয়ার পর অসাধারণ মেধা শক্তিতে তিনি মুখে মুখে গান রচনা করে তাতে তিনি নিজে সুর দিয়ে নিজেই গান গাইতেন। মামুদজান ফকিরের নাম ভণিতাযুক্ত অসংখ্য সাধন সংগীত, নিগম সংগীত, তত্ত্ব সংগীত, ভাব সংগীত, দেহতত্ত্ব সংগীত ও সৃষ্টিতত্ত্ব সংগীত রয়েছে। শুধু খোদা ও রাসুল প্রশান্তি নয়, সনাতন হিন্দু-বৌদ্ধ-নাথ ও চৈতন্যের বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ক গানও তিনি রচনা করেছেন।

মামুদজান ফকিরের জন্মসাল জানা যায়নি। তবে তার কবরের গায়ে লিখা বাংলা ১২০৫ সালের পৌষ মাসের শেষ রবিবার দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন (১৭৯৮ খ্রি.) বলে জানা যায়। কবর গাত্রে লেখা এ তথ্য নির্ভর করে প্রতি বছর ঐ দিন তার ওরস পালন করা হয়ে থাকে।

ফকিরচান্দ

ফকিরচান্দ একজন আধ্যাত্মিক সংগীত সাধক ছিলেন। কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার ক্ষুদিরজঙ্গল ও জাফরাবাদ গ্রাম দু'টির মাঝামাঝি জায়গায় একটি পুরনো বটগাছের নিচে সলিম ফকিরের মাজার সংলগ্ন ফকিরচান্দের মাজার রয়েছে। তার জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি সংসার ত্যাগী সাধক পুরুষ ছিলেন। জানা যায়, ফকিরচান্দ যৌবনেই পরমার্থের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। তবে তার জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও তার মাজারে প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষ সোমবার দিন তার মৃত্যু দিবসে ওরস পালন করা হয়ে থাকে বলে জানা যায়।

ফকিরচান্দ মরমিয়া ও আধ্যাত্মবাদের উপর অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার অধিকাংশই আজ স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। ফকিরচান্দ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মুর্শিদি-মারফতি গানে পারদর্শী ছিলেন। কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ তাড়াইল উপজেলার গ্রামাঞ্চলে বাউল বৈরাগীদের কণ্ঠে আজও ফকিরচান্দের নাম ভণিতাযুক্ত গান শোনা যায়।[৪৫]

অমর চন্দ্র শীল

অমর চন্দ্র শীল কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যশোদল গ্রামে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বহু গান বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের অনেক শিল্পীরা গেয়ে থাকেন। তিনি নিজেও বাংলাদেশ বেতারের একজন তালিকাভুক্ত কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। অভাব-অনটন এবং ছোটবেলা থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। ওস্তাদ প্রাণেশ ভৌমিকের কাছে সংগীতের পাঠ শুরু করে পরবর্তীতে তিনি প্রখ্যাত বাউল সাধক অখিল ঠাকুরের কাছে লোকসংগীতের দীক্ষা নেন। তাছাড়া তিনি অসংখ্য গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। তাঁর একটি গানে বই প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি এক সময় কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষক ছিলেন। অমর চন্দ্র শীলের কৃতীছাত্রদের মধ্যে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী বিপুল ভট্টাচার্য অন্যতম। তিনি মূলত পল্লীগীতি, লোকগীতি, আধ্যাত্মিকতা ও বিচার বিচ্ছেদ গানের গীতিকার গায়ক ও সুরকার। তিনি একসময় কবিগানও গেয়েছেন। তার গানের কথা গুলো বেশ সুন্দর, অপূর্ব ও অসাধারণ।[৪৬]

বাউল তাহের উদ্দিন খাঁ

বাউল কবি তাহের উদ্দিন খাঁ কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার সাড়ং নামক গ্রামে বাংলা ১৩২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। একজন বিশিষ্ট বাউল কবি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। তার অসংখ্য লোকসংগীত রয়েছে। লোক কবি হিসেবে তার লোকসংগীতগুলো খুবই জনপ্রিয়। ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি আসক্ত ছিলেন।

বাউল গান বিষয়ক তাহের উদ্দিন খাঁ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গ্রন্থের নাম *'বাউল গীতিকা'*। অন্যটি তার ভণিতাযুক্ত গান নিয়ে রচনা করেছেন *'তাহের গীতিকা'* নামক আরও একটি গানের বই। গ্রন্থ দু'টি ইতোমধ্যে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে বাংলা ১৩৮৮ সনে নিজ গ্রামের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। কিশোরগঞ্জ জেলার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও বাউল তাহেরের গাওয়া বাউল গানের অডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি নিজে গান রচনা করে নিজেই দোতারা বাজিয়ে গান গাইতেন।

কিশোর বয়সেই বাউল সম্রাট জালাল খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছে বাউল সংগীতে দীক্ষা লাভ করেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ-সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অনেক জেলায় একজন বিখ্যাত বাউল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিশোরগঞ্জ জেলার বাউলদের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। যারফলে তার জীবদ্দশায় যারা বাউল গানের জগতে প্রবেশ করেছেন তারা অনেকেই ছিলেন তার শিষ্য। বাউল তাহের উদ্দিনের শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- বাউল আব্বাস উদ্দিন, বাউল আব্দুল জলিল, বাউল গিয়াস উদ্দিন, বাউল জাহেদ উদ্দিন, বাউল হোসেন আলী, বাউল জয়নাল আবেদীন প্রমুখ।[৪৭]

বাউল মকবুল হুসেন

বাউল মকবুল হুসেন কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার দড়িজাহাঙ্গীরপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। আরবী লেখাপড়া ছাড়াও কোরআন-হাদিসে তার বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। পরবর্তীকালে তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় এবং ভাববাদে বাউল ধর্ম মতবাদে আসক্ত হন। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জেলা ভিত্তিক 'আঞ্চলিক বাউল গান রচনা ও গায়ক প্রতিযোগিতা'য় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। কিশোরগঞ্জ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাউল মকবুল হুসেনের গাওয়া অডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়। তবে তার গানের কোন প্রকাশিত গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও গানের অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে জানা যায়। বাউল মকবুল হুসেন ২০০১ মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমে তিনি বাউল তাহের উদ্দিন খানের সান্নিধ্যে বাউল সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার সাথে বিভিন্ন বাউল গানের আসরে যোগদান করে বাউল গানের গুঢ়তত্ত্ব অনুশীলন করার দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নিজেই বাউল গানে বাউল তাহের উদ্দিনের গানের সাথে প্রতিযোগিতামূলক আসরে বাউল গান পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাউল মকবুল গ্রামের এক কৃষক। আধ্যাত্মিকতা ও বাউল ধর্ম তাকে এতই আকর্ষণ করে তুলেছিল যে, তিনি পরবর্তী জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও লোকসংগীত গায়ক হিসেবে কিশোরগঞ্জ জেলায় সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

বাউল আলাউদ্দিন

বাউল আলাউদ্দিন কিশোরগঞ্জে করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গল গ্রামে ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আছমত বেপারি। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। ছেলেবেলা থেকেই আলাউদ্দিনের কণ্ঠ ছিল জোরালো ও মিষ্টি। প্রথম জীবনে গ্রামের মক্তবে আরবী শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। সে সময় আলাউদ্দিনের

কোরআন তিলাওয়াত ও গজল শুনার জন্য গ্রামের মানুষ ভিড় জমাত। তার গ্রামের মাওলানা আহাম্মদ সাহেব তাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য সিলেটের বানিয়াচং এলাকার এক মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলেন। সেখান থেকে একসময় আলাউদ্দিনের জীবনে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। তিনি সরাজ বাজিয়ে হঠাৎ গান গাইতে শুরু করেন। পরে সরাজ রেখে বেহালা ধরেন। মৃত্যু অবধি বাকীজীবন একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও বাউল সংগীত শিল্পী ছিলেন, বেহালা বাজিয়ে গান গাইতেন। বাউল আলাউদ্দিন এতোই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাকে এলাকার লোকজন পীর বলে মনে করতো।

একসময় খুদিরজঙ্গল গ্রামের পাশে নরসুন্দা নদীর জলে নৌকায় চড়ে বঁড়শীতে মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে এক পর্যায়ে বৈঠা দ্বারা আঘাত করায় লোকটি পানিতে পড়ে গিয়ে পরবর্তীকালে মারা যায়। হত্যা মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

আলাউদ্দিন মারফতি-মুর্শিদী-বাউল-বিচ্ছেদী গান গেয়ে জেলখানা মাতিয়ে তোলে। পরবর্তীতে তার গান শুনে বিচারক আলাউদ্দিন যে একজন বড় মাপের বাউল সাধক ও লোকসংগীত শিল্পী তা বুঝতে পেরে তাকে বেকসুর খালাস করে দেন। ৭০ বৎসর বয়সে লোককবি বাউল আলাউদ্দিন ১৯৮৭ সনে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। বাউল, গায়ক হিসেবে এতো জনপ্রিয় ছিলেন যে, সিলেট অঞ্চলের মানুষ তাকে সিলেটের বলে জানতেন।

আব্দুল জলিল

বাউল কবি আব্দুল জলিল কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার বোরো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে তার পিতা মারা যান। সংসারের অভাব-অনটনের ফলে প্রাইমারি পাশ করে মায়ের সংসার চালানোর কাজে ফিরে আসেন। মাঠে গরু চড়াতেন, আর বটগাছের তলায় বসে মধুর রাগে বাশের বাঁশি বাজাতেন। তার এ বাঁশির সুরের মুর্ছনায় পথিকগণ আত্মভোলা হয়ে গাছ তলায় বসে বাঁশির সুর শুনতেন। ছোটকাল থেকেই তার সুরেলা কণ্ঠের গান শ্রোতাদের বিমোহিত করত। বাউল সংগীত চর্চায় তার প্রথম ওস্তাদ ছিলেন কিশোরগঞ্জের প্রাচীন কবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণের অন্যতম ভক্ত বোরো গ্রামের সংগীত সাধক যোগেন্দ্রসুত্রধর। আবদুল জলিলের কণ্ঠে বাউল সংগীতের আগ্রহ ও প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে শিল্পী যোগেন্দ্র সূত্রধর তাকে একটি বেহালা তার নিজ হাতে বানিয়ে দেন এবং বেহালা বাজানো শেখান। পরবর্তী পর্যায়ে মূলত মুর্শিদি-মারফতি বাউল ধর্মতত্ত্ব লাভ করার জন্য তৎসময়ে তাড়াইলের বিখ্যাত বাউল কবি তাহের উদ্দিন খানের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংগীতের উপর দীক্ষা নেন। বাউল তাহের উদ্দিন খানের সঙ্গে সে সময়ে বিভিন্ন বাউল গানের আসরে যুক্তিতর্ক বা পাল্টাপাল্টি অর্থ্যাৎ প্রশ্ন-উত্তরমূলক বাউল গানে সুনাম অর্জন করেন।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক লোকসংগীতের গায়ক ও গীতিকার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি দেহতত্ত্ব ও মুর্শিদী-মারফতিসহ অসংখ্য ভক্তিমূলক লোকসংগীতের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। কিশোরগঞ্জ ছাড়াও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সিলেট-কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি জেলাসমূহে তার গানের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইন্তেকাল করেন। কিশোরগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তার অডিও ক্যাসেটের গান শোনা যায়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে লোকগীতি গান পরিবেশন করতেন বলে অনেকে তাকে চট্টগ্রামের বাউল কবি বলে মনে করেন। বাউল কবি আবদুল জলিল কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান। কিশোরগঞ্জের মানুষের কণ্ঠে তার গান এখনও ধ্বনিত হয়।

গিয়াস উদ্দিন ফকির

গিয়াস উদ্দিন ফকির বাংলা ১৩৫৩ সালের ২৭শে বৈশাখ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কিশোরগঞ্জ জেলা সদর উপজেলার লতিবাবাদ ইউনিয়নের গাইটাল নামাপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাহমুদ হোসেন আর মাতার নাম হাজেরা খাতুন। বাড়ির নিকটস্থ রাকুয়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। পরবর্তী সময়ে আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। পৈতৃক কৃষিকাজে জড়িত হন। কিছুদিন নানান ব্যবসাও করেন। এতসব কাজের মধ্যেও স্কুলজীবন থেকেই তিনি ছড়া-কবিতা-গান ইত্যাদি লেখালেখি শুরু করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি গীতিবাদ্য প্রিয় হয়ে উঠেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে গানের আসরেই তার বেশির ভাগ সময় কেটে যেত। কৈশোরে পদার্পণ করতেই কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার সাড়ংগ্রামের প্রখ্যাত বাউল সাধক তাহের উদ্দিন খানের কাছে সঙ্গীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি বাউল ধর্মমতে বিশ্বাসী হন। গিয়াস উদ্দিন ফকিরের গান রচনার প্রতিভা অসাধারণ। ফকিরিতত্ত্বে দীক্ষিত হবার পর থেকে গিয়াস উদ্দিন ফকির মুর্শিদী-মারফতি-শরিয়তি এবং বাউল তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি অসংখ্য লোকগীতি রচনা করেছেন। বাউল কবি গিয়াস উদ্দিন ফকির কিশোরগঞ্জ হাক্কানী বাউল সংঘ ও কিশোরগঞ্জ জেলা বাউল সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বাউল গানই তার এখন নেশা-পেশা। গিয়াস উদ্দিন ফকিরের গানের ভাব-ভাষা, ছন্দ, ইত্যাদি ছিল অপূর্ব। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে জেলা তথ্য অফিসের গণসংযোগ বিভাগে বাউল গান পরিবেশন করে সরকারের বিভিন্ন প্রচার কাজে কাজ করে থাকেন। মধুর ব্যবহার, মার্জিত রুচিবোধ, ভদ্রোচিত চালচলন তার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মোহাম্মদ মাতু মিয়া

বাউল কবি মোহাম্মদ মাতু মিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার ভাগলপুর নামক গ্রামে ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল মমিন ভূইয়া। কবি বাল্যকালেই পিতাকে হারিয়ে চাচা আবদুল হেলিম ভুইয়ার স্নেহে লালিত-পালিত হন। সে সময়ে সাম্প্রদায়িক বৈরী দৃষ্টির শিকার হয়ে কবি

তৃতীয় শ্রেণির বেশি লেখাপড়ার সুযোগ না পেয়ে একদিন স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি কথায় কথায় গীত রচনা করতেন। কৈশোরে তিনি পীরের মুরিদ হয়ে সাধনা শুরু করেন। তিনি আরবী, ফারসি, উর্দু, হিন্দি ভাষা তিনি বেশ ভালই জানতেন। হিন্দি ভাষায় তার বেশ কিছু গান-গজল রয়েছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে গানের আসরেই তার বেশিরভাগ সময় কেটে যেত। বিভিন্ন আসরে তিনি বাদ্য যন্ত্র ছাড়া স্বরচিত গান গাইতেন আর স্বরচিত কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করতেন। তার গান রচনার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। সুফি সাধনার সকল দিকই তার গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। চারণকবি মোহাম্মদ মাতু মিয়া ভারত-বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল ঘুরে গান ও কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন অগণিত বাংলার মানুষকে। ৬০-এর দশকে কবি তার স্ত্রী-কন্যা আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে চলে যান ঢাকার পুরাতন শহর দয়াগঞ্জে।

সেখানে পরিচয় হলো ওস্তাদ আমান উল্লাহ খান সাহেবের সঙ্গে। তৎকালীন পত্রিকা দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পাক জমহুরিয়াত ইত্যাদি পত্রিকায় তার সাক্ষাৎকার ও সংক্ষিপ্ত জীবন তথ্য প্রকাশিত হয়। পরিচয় হয় রেডিও পাকিস্তানের পরিচালক আশফাকুর রহমান, টেলিভিশনের জনাব মোস্তফা মনোয়ার এবং বি.এন.আর এর পরিচালক ড. হাসান জামানের সঙ্গে। তার বেশ কয়েকটি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে।[৪৮]

সৈয়দ নুরুল আউয়াল তারা মিয়া

সৈয়দ নুরুল আউয়াল তারা মিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার চাঁনপুর গ্রামে ১৯৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ আকবর আলী। মাতার সৈয়দা মালেকা খাতুন। তিনি একাধারে লোককবি, ছড়াকার, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। দোতরা, ঢোল, বাঁশি আর দেশী যন্ত্র দিয়ে সুমধুর সুরের মুর্ছনায় দর্শক শ্রোতাদের মূহুর্তের মাঝে বিমোহিত করে তুলতেন।

আপন বড় ভাই সৈয়দ মর্তুজুল হোসেন ও সৈয়দ আব্দুল আউয়াল চান মিয়া তারা দু'জনেই সংগীত সাধক। কৃষিভিত্তিক গান রচনায় 'বঙ্গবন্ধু পদক' ছাড়াও এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও পদকসহ অসংখ্য পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সৈয়দ নুরুল আউয়াল তারা মিয়া বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত নিয়মিত শিল্পী ও গীতিকার। সাহিত্য রচনায় কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক 'সীরাতুন্নবী (সা.) পদক' ও সংগীতে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পদক, পুরস্কার ও সনদপত্র লাভ করেছেন। ১৯৭৯ সালের ২০ মার্চ থেকে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি জেলা সদর কিশোরগঞ্জে চাকুরিতে কর্মরত আছেন।

শাহ আইয়ুব বিন হায়দার

শাহ আইয়ুব বিন হায়দার ১৯৫১ সলের ২২শে সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার তেলীখাই নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হায়দার আলী ভূইয়া ও মাতার নাম দুধমেহের বিবি। তার প্রকৃত

নাম মোঃ আইয়ুব আলী। তিনি একাধারে কবি-গীতিকার ও সুরকার। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬১টি। তার মধ্যে গানের বই ৩টি- *'দেহঘরী'*, *'শানে কামলিওয়ালা (র.)'* ও *'বাঁশি কেন কাঁদে'* উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএ, এলএলবি। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি অনেক ভাব-গান রচনা করেছেন। শাহ্ আইয়ুব বিন হায়দারকে একজন সুরের সাধকও বলা যায়। কিশোরগঞ্জ জেলার লোককবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম ও শিক্ষিত। শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক- সমাজসেবক-আইনজীবী প্রভৃতি পরিচয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ।

ছাত্তার মাস্টার

মোঃ আবদুছ ছাত্তার ভূঞা সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে ছাত্তার মাস্টার নামে পরিচিত। পেশায় ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। তিনি ১৯৪৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিন্নাটি ইউনিয়নের পাটাবুকা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুছ ছাত্তার মাস্টার একজন কবি ও গীতিকার। তিনি বেশকিছু লোকসংগীত রচনা করেছেন। এছাড়া বাউল, মুর্শিদী, মারফতি, বিহার, বিচ্ছেদ গানও রয়েছে। ছড়াকার হিসেবেও ছাত্তার মাস্টারের বেশ সুনাম ও খ্যাতি রয়েছে। তার লেখা নাটক 'একটু অবহেলা' ও 'ভুল যখন ভাঙ্গলো' মঞ্চস্থ হয়ে প্রশংসিত হয়েছে। তার একটি ছড়ার বই রয়েছে নাম *'ছড়ার বাঁশি'*।

লোকসংস্কৃতির বিখ্যাত সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানে আবদুছ ছাত্তার মাষ্টারের স্বরচিত গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশন করা হয়েছে। শৈশবকালেই সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সংগীত রচনার প্রতি ঝোঁক ছিল তার। বাড়ির পাশে পাটাবুকা গ্রামে পীর-ফকিদের মাজার কেন্দ্রীক তখন বেশ সংগীত চর্চার সুন্দর পরিসর ছিল। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা শহরস্থ নগুয়া নামক এলাকায় নিজ বাসাবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করেন।

পানু মাস্টার

পানু মাস্টারের প্রকৃত নাম মোঃ গোলাম রাব্বানী পানু। তিনি ১৯৫৫ সালের ২০ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার খুদিরজঙ্গল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফাজেল উদ্দিন আহমদ। মাতার নাম মোছাম্মৎ আক্তারুন্নেছা। পানু মাস্টার বর্তমানে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ১৯৭১-৭২-এ স্বাধীনতা উত্তর তিনি সংগীত রচনা শুরু করেন। এ পর্যন্ত তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। মোস্তফা জামান আব্বাসীর পরিচালনায় 'ভরা নদীর বাঁকে' অনুষ্ঠানে তার গান পরিবেশন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী আবুল হাশেমের গাওয়া 'মুর্শিদ পদে সরলমতি আমার হইল না'-এ গানটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রভাত কানা

প্রখ্যাত বাউল প্রভাত কানার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জে। ১৯৭১ সনে পাক সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নৃশংসভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার রচিত *'বৃহত্তর ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি'* নামক গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করেছেন।

শামসুল ইসলাম হায়দার

শামসুল ইসলাম হায়দার কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার ষাইটকাহন গ্রামে বাংলা ১৩৩৭ সনের ২১শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষা আন্দোলনে ঢাকার ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে তিনি আওয়ামী মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদান করেন। আন্দোলন চলাকালে তিনি নিউটাউনস্থ এক আত্মীয়ের বাসায় থাকতেন। সেখান থেকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মিছিল-মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন। গুরুদয়াল কলেজে পড়ার সময় থেকে তিনি কবিতা লিখতেন। যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন শুরু হলে তিনি প্রেরণাদায়ক গান ও কবিতা লিখতেন এবং গণসংগীত গেয়ে বেড়াতেন। মূলত তিনি একজন গণসংগীত শিল্পী ও স্বভাব কবি ছিলেন।

প্রমোদ রঞ্জন রায়চক্রবর্তী

প্রমোদ রঞ্জন রায়চক্রবর্তী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার গোপদীঘি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। তার অধিকাংশ কবিতার নাম ভাট কবিতা। কিন্তু তার নামের পূর্বে কিংবা নামের শেষে ভাটকবি বলে উল্লেখ নেই। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে শিলাবৃষ্টির দাপটে ইটনা ও নিকলী উপজেলার এলাকাবাসীদের প্রচণ্ড দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে গোপদীঘির প্রমোদ রঞ্জন রায়চক্রবর্তী *'শিলাবৃষ্টির কবিতা'* শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

গোপাল মোদক

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলা জাফরাবাদ ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা গোপাল মোদক। পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র মোদক ও মাতার নাম হেমলতা। নানান জায়গায় হিন্দু শাস্ত্রীয় রামায়ণ গান গেয়ে জীবন চালান। প্রাইমারী স্কুলে পড়াকালে শিক্ষকরা তাকে গান গাইতে উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রথম জীবনে তিনি শ্যামা সংগীত 'চাইনা মাগো রাজা হতে' ও বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করতেন। ১৫ বছর বয়সে প্রথম গান ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষাগুরু সতীশচন্দ্র বিশ্বাস-এর কাছে ৫ বছর শিক্ষা নেন তিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩ টাকা দিয়ে একটি *'কৃত্তিবাস রামায়ণ'* বই সংগ্রহ করে গান শিখেন এবং কিশোরগঞ্জ বিন্নাগাওয়ে রামায়ণ গান করেন। সেই থেকে শুরু হয় বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গান গাওয়া। গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি গান লিখতেন ও সুর করতেন।

ইসলাম উদ্দিন বয়াতি

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার নোয়াবাদ ইউনিয়নের নোয়াবদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এই পালাকার ও পালাগানের জগতে লোকজ সংস্কৃতির এক আলোচিত নাম ইসলাম উদ্দিন। পিতার নাম রবীউল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা বেগম। মক্তবে সামান্য লেখাপড়া জানা ইসলাম উদ্দিন পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের

অনুশাসনে লেখাপড়া ছেড়ে কৃষিকাজে জড়িয়ে পরেন। মক্তবে পড়া অবস্থায় আবু সিদ্দিক নামে হারমোনিয়াম মাস্টার তার গানের সুর শুনে গ্রামের ঝুমুর যাত্রা পালা 'কাসেম মালা' পালাগানে কাসেম চরিত্রে সর্বপ্রথম অভিনয় করার সুযোগ করে দেন। তখনকার সময়ে পুরুষ দিয়ে মেয়ে বা নারী চরিত্রে অভিনয় করানো হতো। ঝুমুর যাত্রা পালা যেহেতু গান নির্ভর তাই হারমোনিয়াম মাস্টার ঠিক করল যে ইসলাম উদ্দিনকে দিয়েই এই যাত্রা পালাগান করানো সম্ভব। তাই তার বড় ভাইকে অনেক অনুরোধ করেই তাকে এই গানে আনতে হলো। এই পালাগানটি নিজ গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মঞ্চায়ন করেন। অনেক প্রসংশার পর 'জীবন্ত কবর' নামে আরও একটি যাত্রাপালা গান নিজ দলের সহযোগিতায় মঞ্চায়ন করেন। সম্ভবত ১৯৮৯ সালের কথা, নেত্রকোণার কুদ্দুস বয়াতী একবার তার গ্রামে কিসসা বা পালাগান গাইতে আসে। তখন থেকেই তার চিন্তা ঝুমুর যাত্রা ছেড়ে কীভাবে কিসসা পালাগান শেখা যায়। সে নেত্রকোণার কুদ্দুস বয়াতীর বাড়িতে গিয়ে তার নিজ খরচে গান শেখানোর জন্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। বাড়ি ফিরে তার সাইকেল ও অন্যান্য জিনিস বিক্রয় করে নেত্রকোণার কেন্দুয়ায় কুদ্দুস বয়াতীর বাড়িতে এক বৎসর যাবৎ প্রশিক্ষণ নিলেও পরে পালাগানের উত্তর দেওয়া 'ডাইনা' বলে পরিচিত গায়েন বা দোহারী হাশেমের মাধ্যমে তার মূলশিক্ষায় কিসসা বা পালাগান মুখস্থ করে পরবর্তীকালে বয়াতী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন।

নেত্রকোণার কেন্দুয়া এলাকার কদমশ্রী গ্রামে প্রথম পালা বা কিসসা পরিবেশনের কপাল খুলে গেল নতুন বয়াতী ইসলাম উদ্দিনের। শ্রম, সাধনা, মেধা দিয়ে তিনি কিশোরগঞ্জের লোকসংস্কৃতিকে যারা পরিচিত করে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইসলাম উদ্দীন।[৪৯]

লোকগীতিকার মুক্তি চৌধুরী

পারিবারিক নাম মুক্তার উদ্দিন খান চৌধুরী হলেও মুক্তি চৌধুরী নামেই কিশোরগঞ্জ শহরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি সমধিক জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে কবি-ছড়াকার, আবৃত্তিকার, সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা ও নাট্যকার। বহুবিধ গুণের অধিকারী এই বরেণ্য শিল্পী ১৯৫৭ সালের ৯ই জুলাই কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার কিরাটন গ্রামের চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিরাজ উদ্দিন খান চৌধুরী ও মায়ের নাম হাজেরা খাতুন। ছোটবেলা থেকেই স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিসরের সাথে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত হন।

তার গানের গুরু একসময়ের কিশোরগঞ্জ জেলার গুণী সংগীতজ্ঞ ও নাট্যকার মৃণাল কান্তি দত্ত। স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার চাইতেও তিনি ব্যস্ত থাকতেন এখানকার নানাবিধ সাংস্কৃতিক-কর্মকাণ্ডে। তার অজস্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই অঞ্চলের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত লোকগীতিকা-পালা রচনা আর মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব রয়েছে তার।

বিজন কান্তি দাশ

বিজন কান্তি দাশ কিশোরগঞ্জ শহরের শোলাকিয়া পাড়ায় জন্মেছেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার ও লোকপালাকার হিসেবে কিশোরগঞ্জ শহরে বেশ পরিচিত। ছোটবেলা থেকেই এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন। তার লিখিত চন্দ্রাবতী পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই লোকনাট্য পালাটি ১৯৯০ সালে কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক প্রথমে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়। এরপর কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে এটি মোট ঊনত্রিশবার মঞ্চস্থ হয়। ২০০০ সালে তিনি রচনা করেন অপর একটি লোক-নৃত্যনাট্য 'মলুয়া সুন্দরী'; এটিও মৈময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে রচিত। এই দু'টি পালাই আঞ্চলিক ভাষায়, বিশেষত তিনি কিশোরগঞ্জের স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা এতে প্রয়োগ করেন। ১৯৯৫ সালে 'স্মৃতি অম্লান' নামে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে অপর একটি গীতিকাধর্মী পালা রচনা করেন। এটিও স্থানীয় সাংস্কৃতিক জগতে বেশ সুনাম বয়ে আনে।

ওস্তাদ আব্দুর রশিদ

লোকসংগীত শিল্পী ওস্তাদ মোঃ আব্দুর রশিদ কিশোরগঞ্জ লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনায় ব্যাপক জনপ্রিয়। মূলত পুঁথিপাঠ ও জারিগান পরিবেশন করতেন তিনি। তার গুরু ছিলেন ওস্তাদ খোয়াজ উদ্দীন আহমেদ। চল্লিশ বছর বয়স থেকে এই শিল্পী ও তার দলের পরিবেশনা দিয়ে এ অঞ্চলে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। একসময়ে নিজের বাড়িতে বিপুল লোকসমাগমের মধ্য দিয়ে জমজমাট লোকসংগীতের আসর করতেন। সেখানে আশেপাশের নানা অঞ্চলের লোকশিল্পীরা গান-বাজনা করতে আসতেন। সারারাত ধরে এই অনুষ্ঠান চলত। মূলত আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন মানুষের কাজকর্ম কম থাকত তখন এই আসরগুলো অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন স্থানে। একসময় এই জেলার নানা স্থানে তিনি তার দল নিয়ে গিয়ে জারি গান গেয়ে আসতেন। শুধু কিশোরগঞ্জেই নয় তিনি ঢাকাতেও একসময়ে জাতীয় জাদুঘরে জারিগান ও পুঁথিপাঠের পরিবেশনা উপস্থাপন করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন পাল

ক্ষেত্রমোহন পাল শুধু কিশোরগঞ্জ অঞ্চলেই নয় এদেশের নানা স্থানেই কীর্তন ও রামায়ণপালা পরিবেশন করে আসছেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিশোরগঞ্জ জেলায় অসংখ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। বৈষ্ণবদের রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে বা বৈষ্ণব-ভক্ত-শিষ্যের বাড়িতে তাদের বাৎসরিক-আয়োজনে নানা কীর্তনের আসর বসে। এইসমস্ত আসরে কখনো দুদিন কখনো তিনদিন ধরে নাম-সংকীর্তন ও লীলা-কীর্তনের জমজমাট অনুষ্ঠান চলে। এইসমস্ত অনুষ্ঠানগুলোতে কীর্তনীয় ক্ষেত্রমোহন পাল তার দল নিয়ে হাজির হয়ে কীর্তন করেন; রামায়ণ-ভগবত পাঠ করেন। তিনি টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে পালা-গান পরিবেশন করেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যেকোনো নিম্নবর্গীয় মানুষজনই সম্মানের সাথে অবস্থান করতে পারেন, দীক্ষিত হতে পারেন। এমনকি, হিন্দু ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাইরেও কোনো মানুষ এই বৈষ্ণব ধর্মের ধারায় জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কীর্তনীয় ক্ষেত্রমোহন পাল প্রয়াত বৈষ্ণব-গুরু মন্টু গোঁসাইয়ের শিষ্য। তার কীর্তনের শিক্ষাগুরু হলেন ক্ষিতিশ চন্দ্র পাল। ক্ষেত্রমোহন পাল রামায়ণের 'পিতাপুত্রের পরিচয়', 'সীতার বনবাস', 'পিতা-পুত্রের যুদ্ধ', 'রামের বনবাস', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'সীতাহরণ' প্রভৃতি পালাগুলোই বেশি পরিবেশন করেন। রামায়ণের এই সমস্ত পালাগুলোই সাধারণ মানুষেরা বেশি পছন্দ করে। সারারাত ব্যাপী এই পালাগুলো পরিবেশিত হয়। এগুলো শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নয়, হিন্দু-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষেরা এইসমস্ত পালা-কীর্তনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নানা বিষয়ে লোকশিক্ষাও লাভ করেন।

মোঃ রওশন আলী রুশো

রওশন আলী রুশো একাধারে মানুষ গড়ার কারিগর, বীর-মুক্তিযোদ্ধা, দক্ষ সংগঠক এবং ইটনায় ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ তথা ভাটির ইতিহাসের কাণ্ডারী। তার অসাধ্য সাধনের মতো দৃঢ়চেতা মনোভাব, অধ্যাবসায় ও মেধা তাকে ভাটির চলমান ইতিহাসের কালপুরুষ-এর অনন্য মর্যাদা দান করেছে। প্রাবন্ধিক ও ইতিহাস গবেষক রওশন আলী রুশো ১৯৫৪ সালের ২ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার ছিলনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আব্দুল জলিল এবং মাতার নাম উমরাজ বানু। নিজগ্রামের পাঠশালা চুকিয়ে ইটনা মহেশচন্দ্র শিক্ষা নিকেতন থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হন কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে। ১৯৭১ সালে গুরুদয়াল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ১৭ বছরের কিশোর রওশন আলী রুশো মাতৃভূমির পবিত্র আহ্বানকে সহযোদ্ধা শহীদ সিরাজুল ইসলাম বীরবিক্রম এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পাড়ি জমান যুদ্ধক্ষেত্রের অনিশ্চিত আঙিনায়।

চেহারায় ছোটোখাটো হলেও রওশন আলী রুশো'র অসীম সাহস আর আত্মবিশ্বাস অনেকের নিকটই অবিশ্বাস্য। ৫নং সেক্টরের ৫নং ব্যাচের হয়ে দেশকে পাকহানাদার মুক্ত করতে যুদ্ধ করেছেন বৃহত্তর সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকে রওশন আলী রুশো'র লেখায় হাতেখড়ি। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ করা নানা ঘটনাপ্রবাহ তার লেখায় নতুনমাত্রা যোগ করে। মুক্তিকামী জনতার দেশাত্ববোধ ও সমৃদ্ধ চেতনা তার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখার মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে। হাওরের প্রত্যন্ত পল্লী থেকে নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও তিনি অসংখ্য সংকলন সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন। এগুলোর মধ্যে *'রক্তবীজ'* (১৯৮৯), *'প্রতিশ্রুতি'* (১৯৯০), *'ধনু নদীর বাঁকে'* (১৯৯২), *'রক্তরেখা'* (১৯৯৪), *'নবদিগন্ত'* (১৯৯৫), *'অশান্ত ঢেউ'* (১৯৯৫), *'ঠিকানা ভাটি'* (১৯৯৬), 'বজ্রকণ্ঠ' (১৯৯৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জ জেলার ৪ কৃতীপুরুষের জীবনী নিয়ে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ *'উন্মোচন'* এর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। এছাড়া দ্বিমাসিক ছোট কাগজ *'দৃশ্যপট ৭১'* এবং ত্রৈমাসিক *'আলোকিত কিশোরগঞ্জ'*-এর গবেষণা প্রবন্ধের নিয়মিত লেখক হিসাবে তিনি স্বতন্ত্র একটি অবস্থান তৈরি করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রবন্ধগুলো হচ্ছে *'ভাটিয়াল মুল্লুক'*, *'ভাটি এলাকার মাটি ও মানুষ'*, *'ইটনা উপজেলার কথা'*, *'দিল্লীগড়ের উপাখ্যান'*, *'ধনু নদীর ইতিকথা'*,

'বাংলার প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু', *'ব্যারিষ্টার ভূপেশ চন্দ্র গুপ্ত এবং মহেশচন্দ্র শিক্ষা নিকেতনের গোড়ার কথা'*, *'বাংলা সনের ইতিকথা'* এবং *'চরমপত্র ও এমআর আখতার মুকুল'*।

রওশন আলী রুশো ২০০৪ সালে কিশোরগঞ্জের প্রথম ইতিহাস সম্মেলনে প্রাবন্ধিক ও গবেষক হিসেবে সম্মাননা লাভ করেন। ২০০৫ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ কর্তৃক 'বাংলাপিডিয়ার সাংস্কৃতিক জরীপের আঞ্চলিক গবেষক' হিসেবে নিয়োগ পান। ২০০৮ সালে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মানীভাতা তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে রওশন আলী রুশো বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রেখেছেন। বর্তমানে তিনি ইটনা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডের নির্বাচিত সহ-কমাণ্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইটনা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং কিশোরগঞ্জ সাহিত্য পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এছাড়াও তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন স্মৃতি সংসদের সহ-সভাপতি এবং কিশোরগঞ্জ ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা পরিষদের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

দেবব্রত বিশ্বাস

দেবব্রত বিশ্বাস এক স্বনামধন্য ভারতীয় বাঙালি রবীন্দ্রসংগীত গায়ক ও শিক্ষক। তার জন্ম কিশোরগঞ্জের ইটনা থানার নন্দীহাটিতে। শিশুবয়সেই মা অবলা দেবীর মাধ্যমে ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পরিচিত হন। মহেন্দ্র রায়ের কাছে দেশাত্মবোধক গান শেখেন এবং কিশোরগঞ্জের স্বদেশী সভায় অল্পবয়স থেকেই গান গাইতেন দেবব্রত বিশ্বাস। তিনি ভারতের গণনাট্য আন্দোলনেরও অন্যতম পুরোধাপুরুষ ও একজন বিখ্যাত গণসংগীত গায়ক ছিলেন।

১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। এইসময় ব্রাহ্মসমাজ ও পরে শান্তিনিকেতনে গান গাইবার আমন্ত্রণ পান। ১৯২৮ সালের ব্রাহ্ম ভাদ্রোৎসবে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন দেবব্রত। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন এবং ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে বিনা মাইনের চাকরিতে যোগদান করেন। এই চাকরিসূত্রে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র সুবীর ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয় দেবব্রতের। মূলত এঁদেরই সূত্রে রবীন্দ্রসংগীত জগতে পদার্পণ করেন দেবব্রত। ১৯৩৮ সালে কনক দাশের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে প্রথম তাঁর রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড। এই সময় থেকে হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও অন্যান্য রেকর্ড সংস্থা তাঁর গান রেকর্ড করতে শুরু করে। রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি গণসংগীত ও অন্যান্য গানও গাইতেন।[৫০] তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, এসময় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল এবং নজরুল তাঁর গান শুনে তাঁকে দু'টি শিখিয়ে সেগুলি রেকর্ড করিয়েছিলেন। একটি গান "মোর ভুলিবার সাধনায় কেন

সাধো বাদ" অপরটি আত্মজীবনীতে তিনি স্মরণ করতে পারেননি। যদিও এই রেকর্ড দু'টি প্রকাশিত হয়নি। এই সময় গণনাট্য সংঘ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ট হয়। তবে দেশভাগের সময় পার্টি কংগ্রেসকে সমর্থন করলে তিনি পার্টির প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। ১৯৪০-এর দশকের শেষভাগে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তিনি গোপনে পার্টির জন্য অর্থসংগ্রহও করেন। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পুনরায় চীন যান এবং সেই বছরই ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মিয়ানমার) বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে সংগীতানুষ্ঠান করেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি সংগীতানুষ্ঠান করেছিলেন। ২০০১ সালে ভারতে রবীন্দ্ররচনার কপিরাইট বিলুপ্ত হলে তাঁর বহু অপ্রকাশিত ও অননুমোদিত গান প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতাতেই নিজ বাসভবনে দেবব্রত বিশ্বাসের মৃত্যু হয়। তাঁর আত্মজীবনী ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত থেকে তাঁর জীবন ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর মতভেদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মৃত্যুর প্রায় তিনদশক পরেও তিনি রবীন্দ্রসংগীত জগতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পীরূপে পরিচিত।

দেবব্রত বিশ্বাস প্রায় ৩০০ রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেন। তাঁর অন্যান্য রেকর্ডের মধ্যে আছে 'ত্বমাদিদেব' ও 'ত্বমীশ্বরাণাং' বেদগান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'তুমি দেবাদিদেব' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে" ও "প্রণমামি অনাদি অনন্ত" ব্রহ্মসংগীত, কবি বিষ্ণু দে রচিত কবিতার সুরারোপ "কোথায় যাবে তুমি" এবং বেশ কয়েকটি আধুনিক গান। তবে রবীন্দ্রসংগীতই তাঁর প্রধান সংগীতক্ষেত্র ছিল। তাঁর রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রায়ণ করেন ঋত্বিক ঘটক। মেঘে ঢাকা তারা ছবিতে গীতা ঘটকের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি"; কোমলগান্ধার ছবিতে আকাশভরা সূর্যতারা এবং যুক্তি-তর্ক ও গল্প ছবিতে স্বয়ং ঋত্বিক ঘটকের "ওষ্ঠদানে কেন চেয়ে আছ গো মা" গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। এছাড়া ঋত্বিক ঘটকের "কোমল গান্ধার" ছবির একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে তিনি অভিনয়ও করেন।

৬.৮ খেলাধুলা

খেলাধুলা ও বিনোদন শব্দ দু'টি একে অপরের পরিপূরক। খেলাধুলা যেমন মানুষের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে তেমনি এটি সুস্থ বিনোদনেরও অন্যতম মাধ্যম। 'প্রাচীনকালে মানুষের একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম ছিল এই খেলাধুলা' কথাটি কিশোরগঞ্জের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই প্রাচীনকাল থেকেই কিশোরগঞ্জে নানা ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ জেলা খেলাধুলার ঐতিহ্যগত ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রেখে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে কিশোরগঞ্জ উজান ও ভাটি অঞ্চলে বিভক্ত। এর ফলে এখানকার আদিবাসীরাও পরিবেশগত কারণে ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ায় অভ্যস্থ ও আগ্রহী। এছাড়াও কৃষি প্রধান অঞ্চল ও বাণিজ্য নির্ভর এলাকায় ক্রীড়ার ভিন্নতা লক্ষণীয়। তবে পরিবেশগত ভিন্নতা থাকা স্বত্ত্বেও আদিকাল থেকেই ফুটবল, হা-ডু-ডু, কাবাডিসহ বেশকিছু খেলার প্রতি এ জেলাবাসীর আগ্রহ ও অকৃত্রিম ভালবাসা চিরন্তন।[৫১] তবে বিয়ে কিংবা সুন্নাতে খাৎনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জমজমাট লাঠিখেলার আয়োজনের রীতি এখনও এ অঞ্চলের মানুষকে আমোদিত করে। একদল লোক পায়ে ঘুঙুর পরে বিচিত্র পোশাকে ঢোল বাদ্যযন্ত্রের তালে একজন দু'টি লাঠি হাতে পরস্পরের সাথে লাঠালাঠি করতো। এছাড়াও এ জেলায় অঞ্চলভিত্তিক বেশকিছু জনপ্রিয় খেলাধুলা ছিল। তারমধ্যে তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার এলাকার ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়া দৌড়, সদর উপজেলার বৌলাই ও বিন্নাটি গ্রামের লাঠিখেলা। একসময় কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর অঞ্চলে 'একচইল্ল্যা' বা 'হুমলি' খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া রাখাল ছেলেদের মাঝে জনপ্রিয় খেলা ছিল 'ভাইয়া ডুকু' বা 'গোল্লাছুট' খেলা, 'মনগুডা' খেলা। এছাড়া লাটিম, ডাংগুটি, হাড়াইয়া ইত্যাদি খেলা। মেয়েদের খেলাধূলার মধ্যে ছিল পলাপলি, কানামাছি, গুটি লুকানো, তোপাভাতি ইত্যাদি।

পাকিস্তান আমল থেকেই এ অঞ্চলে ফুটবল ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এ জেলার অনেক কৃতী ফুটবলার জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম বয়ে আনেন। কিশোরগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গনের বর্তমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা অনবদ্য। এ ক্রীড়া সংস্থাকে ঘিরেই এখানকার ক্রীড়াঙ্গনের নান্দনিক ও উজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হয়েছে। এখানকার পুরাতন স্টেডিয়ামটিই একসময় খেলার মাঠ হিসেবে পরিচিত ছিল। এই মাঠ ঘিরেই জেলার গৌরবময় ক্রীড়াসৌধ নির্মিত হয়েছে, তৈরি হয়েছেন খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদ। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে কিশোরগঞ্জের ফুটবল তারকা ছিলেন নিখিল, আবু তাহের, হিনা, নীরা, অরুণাংশু, গিয়াস উদ্দিন খান, জহিরুল হক মঞ্জু, মেন্ডিজ, সিরাজুল সির, মোস্তাফা প্রমুখ। এছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ফুটবলার চুনী গোস্বামীসহ অনেকেই এ মাঠের পরশ পেয়ে ফুটবলার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান চান মিয়া, শামছুদ্দিন আহমদ মঞ্জিল, মীর্জা আলী মিয়া, আব্দুল মোতালেব, ফুল মাহমুদ, আব্দুল মান্নান, গিয়াস উদ্দিন, নিখিল চক্রবর্তী, রইস মোহাম্মদ, বদিউজ্জামান খালেদ, জামিলুল হুদা মিন্টু, সিরাজুল হক হাবিব, আবদুর রহিম, সাইফুদ্দিন আহমদ, গোলাম, এমদাদুল হক পিটু, লুৎফুর রহমান, আবদুল কাইয়ুম সেন্টু, সুলাইমান, মুখলেছ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান যুগের ফুটবলারদের মধ্যে মাজহারুল ইসলাম হিমেল, মোঃ রবিন, মোনায়েম খান রাজু, আতিকুর রহমান মিশু, মহিউদ্দিন খান বাচ্চু, গেনেশ পাল, আব্দুল বারীক, আবদুল জলিল, রাস বিহারি, আবদুল মালেক, এসএম আবদুল মান্নান, সিরাজ উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী রিজভি, জোনাব আলী, শামসুজ্জমান তালুকদার (চান মিয়া), জলিলুর রহমান ধলাই, মোঃ আমিনুল ইসলাম খান বিল্লাল, মোঃ আলাল উদ্দিন লালু, হারুন-অর রশিদ, লাক্কু নন্দী, মোঃ খলিলুর রহমান, জিএম ইয়াহহিয়া, লায়েক আলী, আমিনুল ইসলাম

আশফাক, শফিকুল ইসলাম কাজল, হাবিবুর রহমান সজল-এঁরা সবাই ফুটবলে যথেষ্ঠ নাম করেছেন। আব্দুস সালাম ও শেখ নুরুল ইসলাম মাঠের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও জাতীয় যুবদলের হয়ে খেলেছেন কিশোরগঞ্জের এমদাদুল হক পিটু, শেখ নুরুল ইসলাম ও মোঃমুকসুদুল হক। ফুটবল পরিচালনার (রেফারি) যারা গুরুদায়িত্ব পালন করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন প্রসূন কান্তি রায়, তোতা মিয়া, মাজহারুল ইসলাম, আজিজুল ওয়াহাব, শৈলেন্দ্র সরকার, মহিউদ্দিন আহমদ, ফায়জুল হক, মাহবুবুল হক, তারা মিয়া, গনেশ পাল, মাহতাব উদ্দিন, জগদীশ চন্দ্র পণ্ডিত, মোঃ নূরুজ্জামান, মোঃ আবদুস ছোবহান চাম্পা মিয়া প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী কুটিগির্দী ক্লাব ১৯৩৯ সালে আইএফএ শিল্ডে অংশগ্রহণ করে কালীঘাটকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উঠেছিল। ১৯৩৩ সালে শহরের আখড়া বাজারসহ কুটিগি এলাকায় কিছু ক্রিড়ামোদী ও খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন ফজলুল করিম খান (তোতা মিয়া)। কুটিগির্দী স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে ১৯৩৯ সালে কোলকাতা মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব ও ইস্ট বেঙ্গল কালীঘাটের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ মাঠে ইংল্যান্ডের ইসলিংটন কোরিন্থিয়ানস দলের অনুপম খেলাও এখানকার ক্রীড়ামোদী দর্শকরা উপভোগ করেছেন। এছাড়াও ফুটবলের উন্নয়নে এখানে আরও বেশকিছু ক্লাব নিরলসভাবে কাজ করে গেছে। এগুলোর মধ্যে ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, ওয়াইএমসি স্পোর্টিং ক্লাব, হোয়াইট সার্টস ক্লাব, টাউন ক্লাব, উষা বিড়ি, ফ্রেণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব, অ্যাথলেটিক ক্লাব, তারাপাশা স্পোর্টিং ক্লাব, চাঁদতারা ফুটবল ক্লাব, যুবক সমিতি, ন্যাশনাল সুগার মিল, পূর্বাশা ক্লাব, মংক্রু ক্লাব, গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি অন্যতম।[৫২]

ফুটবলের মত কিশোরগঞ্জের ক্রিকেটাঙ্গন অতটা সমৃদ্ধ না হলেও এদেশে ক্রিকেটের সূচনা করেছিলেন কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার মসুয়া রায় পরিবারের সদস্য সারদা রঞ্জন রায়। কিশোরগঞ্জ শহরে সম্ভবত বিশ শতকের ষাটের শেষ ও সত্তর দশক থেকে ক্রিকেটের প্রচলন হয়। শুরুর দিকে শহরের কলেজ ও স্কুলগুলোতে এর প্রচলন ছিল। পরে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিশোরগঞ্জে ক্রিকেটের প্রচলন করেন সফিকুল ইসলাম খান (অ্যাডভোকেট)। তাঁর সাথে ছিলেন নুরুল ইসলাম হিরু, রব্বানী, মাহবুব, জিন্নত আলী, বাচ্চু, এমএ কাইয়ুম, অধ্যক্ষ জালাল আহমদ, ফজলুল কবির (অ্যাডভোকেট), জুবায়ের, লুৎফুল হুদা প্রমুখ। রব্বানীসে সময় ক্রিকেটে দ্রুততম বোলার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭০ এর আগে কিশোরগঞ্জে ক্রিকেট লীগ হতো না। এরপরে ক্রিকেটের জন্য কাজ শুরু করেন লাকু নন্দী।

তৎকালীন মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ন-সম্পাদক লৎফুল হুদা পন্টুর সহায়তায় লাকু নন্দী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রিকেট দল গঠন করেন। সুরভি ক্রিকেট ক্লাব ও পুরানথানা ক্রিকেট দল নামে দু'টি দল ওইসময় প্রাধান্য লাভ করে। পরবর্তীকালে স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় ক্রিকেটে গতি আসে।

কিশোরগঞ্জের ক্রিকেটাঙ্গনে কৃতী ক্রিকেটাররা হলেন বিকাশ রঞ্জন দাস, দেবব্রত পাল, আবদুলাহ আল মাহফুজ রবিন, কমল চন্দ্র গোস্বামী, বিজয় হরিজন, মিজানুর রহমান ফরহাদ, মোশারফ হোসেন রুবেল, ফজলে নাঈম, সুব্রত সরকারসহ অনেকেই।

তাছাড়া এ জেলার বিস্তীর্ন জনপদ হাওর অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রীড়া ইভেন্টের নাম সাঁতার। আর তার প্রমাণ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগীতা সাফ গেমসে সাঁতারে স্বর্ণপদক জয় করে এ জেলাকে গর্বিত করেছেন নিকলী উপজেলার সোনার ছেলে কারার মিজান।

কিশোরগঞ্জ জেলায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২টি স্টেডিয়াম রয়েছে। ১৯৮৭ নতুন স্টেডিয়ামের জমি ক্রয় এবং ২০০৬ সালে এর উদ্বোধন করা হয়। কিশোরগঞ্জের বীরসন্তান মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির স্মরণে বর্তমানে এ স্টেডিয়ামটির নামকরণ করা হয় 'শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়াম' হিসেবে। কিশোরগঞ্জ পুরাতন স্টেডিয়াম মাঠটিই ছিল ক্রীড়াঙ্গনের প্রাণকেন্দ্র। গ্যালারি নির্মাণের পূর্বে এ মাঠটি ছিল উন্মুক্ত। এর দাতা ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কেসি ঘোষ। কিশোরগঞ্জের কাচারি বাজার এলাকার এ পুরাতন খেলার মাঠটি ১৯১৪ সালে স্থাপিত হয়। মহকুমা লীগ শুরু হয় ১৯২৫ সালে এবং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে এ মাঠে গ্যালারি নির্মাণ করা হয়। গ্যালারির ধারণ ক্ষমতা ছিল মোট ৭ হাজার ৫০০। পরবর্তীতে একটি বৃহদাকারের পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণে এর আরো উন্নয়ন সাধন করা হয়। প্রতিবছর এ স্টেডিয়ামে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন-

(ক) জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল
(খ) প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ
(গ) প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ

তাছাড়া প্রতি বৎসর এখানে ভলিবল লীগ, এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা, ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, কাবাডি প্রতিযোগিতা, যুব ও সিনিয়র ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা, জাতীয় বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (অনুর্ধ্ব ১৪, ১৬, ১৮) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া কিশোরগঞ্জ সদরে দু'টি স্টেডিয়ামের পাশাপাশি বিভিন্ন উপজেলাতেও বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী খেলার মাঠ রয়েছে, যেখানে নিয়মিত ক্রীড়াচর্চা হয়ে থাকে। গুরুদয়াল সরকারি কলেজ মাঠ, বাজিতপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ডাকবাংলোর মাঠ, কটিয়াদীর বোয়ালিয়ার মাঠ, ভৈরবের স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য। এসব মাঠে কাবাডি, দাড়িয়াবান্দা, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা নিয়মিত আয়োজন করা হয়।

ফুটবল, ক্রিকেট ছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলার উল্লেখযোগ্য লোকক্রীড়াগুলোর মধ্যে রয়েছে হা-ডু-ডু খেলা, বলাই, তইতই, রস-কস খেলা, লাঠিখেলা, গুটি খেলা ইত্যাদি। নিম্নে এ খেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

হা-ডু-ডু খেলা

হা-ডু-ডু বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত খেলা। জনপ্রিয়তার জন্য এটি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। তেমনি এটি কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। হা-ডু-ডু শক্তির খেলা। সেজন্য তরুণ ও যুবকেরা এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। অল্পবয়সের বালকেরাও হা-ডু-ডু খেলতে পারে। হা-ডু-ডু দু'টি নিয়মে খেলা হয়, মাটির উপর দাগ কেটে সীমানা বেঁধে এবং সীমানা ছাড়া। প্রথমটি 'কোটবন্দী' ও দ্বিতীয়টি 'ছাড়াকপাটি'।

খেলা শুরু হওয়ার পর এক পক্ষের যে কোনো একজন মাঝরেখা থেকে নিশ্বাস বন্ধ করে অপর পক্ষের দলের কাছে গিয়ে কাউকে স্পর্শ করে মেরে আসতে হয়। সে যে দম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে "হা-ডু-ডু" বা 'টিক্-টিক্' বা 'কপাটি-কপাটি' প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি অথবা দু'চার চরণের ছড়া আবৃত্তি করতে হয়। সম্পূর্ণ নিশ্বাস রেখে ডুগ দেওয়ার সময় বিপরীত পক্ষের যেকোন একজনকে ছুঁয়ে দাগ পার হতে পারলে যাকে ছুঁয়েছে, সে মারা যাবে অর্থ্যাৎ সে খেলার অধিকার হারাবে। আর যদি নিজেই আটকা পড়ে যায় এবং দম ছেড়ে দেয় তবে সেই মারা পড়বে। দ্বিতীয়বার ডুগ দিতে আসবে অপর পক্ষের যে কোনো একজন খেলোয়াড়। একে পাল্টা ডুগ বলা হয়। ছোঁয়াছুঁয়ি বা ধরা পড়ার ফলাফল একই রকম। না ছুঁয়ে বা ধরা না পড়ে নিজ ঘরে ফিরে এলে ফল অমীমাংসিত ও অপরিবর্তিত থাকে। হা-ডু-ডু খেলার লক্ষণীয় একটা দিক হলো- বিপক্ষের খেলোয়াড়কে মেরে স্বপক্ষের মরা খেলোয়াড়কে পর্যায়ক্রমে জীবিত করতে পারে। কোনো এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় মারা পড়লে একটা 'গেম' হয়। সকল ও সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেলাটি পুনরায় আরম্ভ হয় এবং পূর্ববৎ চলতে থাকে।

এ জেলার এক গ্রামের সাথে আরেক গ্রামের মানুষের শক্তির পরীক্ষা বা উৎকৃষ্টতার প্রমাণ ছিল এই খেলা।

বউছি খেলা

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে কিশোর-কিশোরীদের নিকট একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা বউছি। গ্রামাঞ্চলে বেড়ে উঠা ছেলে-মেয়েরা বউছি খেলেনি এমন খুব কমই পাওয়া যাবে। বউছি খেলার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য হা-ডু-ডু খেলায় আছে। নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ও স্পর্শ করে ফিরে আসা ইত্যাদি বিষয়ে মিল আছে। দৌড়ের এবং শ্রমের খেলা হলেও বউছি হা-ডু-ডুর মত শক্তির খেলা নয়। এতে আক্রমণটা একপক্ষীয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা প্রতিরোধ করে না, পালিয়ে স্পর্শ বাঁচায়। গায়ের জোরের চেয়ে পায়ের দৌড়ের উপর খেলাটি অধিক নির্ভরশীল। বয়স্ক পুরুষেও বউছি খেলতে পারে। দল নির্বাচনে ও সংগঠনে সমান বয়স্ক খেলোয়াড় না হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে না।

নৌকা বাইচ

নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা হাওর বেষ্টিত কিশোরগঞ্জের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও নিছক আমোদপ্রমোদের উৎসবে নৌকাবাইচ হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে মনসা ভাসানের অনুষ্ঠানে (১লা ভাদ্র)

নৌকাবাইচ হয়, কিন্তু মনসাপূজার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। কারণ নৌকাবাইচ না হলেও মনসা পূজার অঙ্গহানি হয়না। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন খালবিল, নদীনালা ভরাট ও শান্ত থাকে তখন কোন লোকোৎসব অথবা জাতীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে নৌকাবাইচের খেলা আয়োজন হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলায় এখনও 'আড়ং' মেলা হয় তার মূল অঙ্গই হলো নৌকাবাইচ। এ খেলায় নৌকার দু'পাশে জোড়ে জোড়ে বসে বাইচালদাররা বৈঠা টানে, পাটাতনে দাঁড়িয়ে সারিদাররা গান করে। চল্লিশ-পঞ্চাশ থেকে একশত জন বাইচালদার ও সারিদার থাকতে পারে। প্রতিযোগিতার নৌকার কোন পাল-মাস্তুল থাকেনা। বাইচের দিন নৌকাকে সুসজ্জিত করা হয়-চালের গুঁড়া ও সিঁন্দুর দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় নৌকায় গায়েও গুলুই-এ। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার আগের মূহুর্ত পর্যন্ত প্রতিযোগিরা নাচ-গানসহ ফুর্তি করে। বৈঠার টানে নৌকা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলে আর বৈঠার তালে তালে সমানে গান চলে। যেমন-

ওই চলে চলে চলে নাও হেঁউও
চল্ চল্ চল্ উড়াল দিয়া চলও
বদর বদর রবে চল্ হেইও হেইও
হো হো দ্যাখ দেখি কেবা যায় আগেও ॥
বদর বদর বলে তারে ধরিও
আরে চল্ চল্ চল্ ওরে চলিও ॥[৫৩]

লাঠিখেলা

লাঠিখেলা প্রাচীন বাঙালির ঐতিহ্যময় খেলা। বাঙালির শৌর্য-বীর্যের পরিচায়ক লাঠিখেলা। এককালে যখন এদেশে জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল তখন 'পুণ্যাহ'র দিনে জমিদারদের পোষ্য লাঠিয়ালরা লাঠিখেলার নানান কসরৎ দেখিয়ে পেত প্রচুর বখশিস। কখনো কখনো চরদখল, জমি দখল, জমিদার-জমিদারদের ঝগড়া বিবাদ আক্রমণে লাঠিয়ালরা অংশগ্রহণ করত। তাছাড়া যে কোন ধনী শ্রেণির বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠানে লাঠি খেলার বায়না ছিল। এ খেলা না থাকলে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যেন আনন্দ ফুর্তি জমে উঠত না। কিশোরগঞ্জের বিয়ে বাড়ি থেকে শুরু করে মহরমের আয়োজন অনুষ্ঠানে লাঠিখেলা ছিল গ্রাম বাংলার অন্যতম আনন্দ আর আকর্ষণীয় বিষয়। এখনো পহেলা বৈশাখ ছাড়াও কোন কোন বিয়ে বাড়ি কিংবা নির্বাচন উপলক্ষে কিংবা কোন বিশেষ আনন্দ উৎসবে লাঠিখেলার আয়োজন হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে এর প্রচলন খুব একটা দেখা যায়না।

ষাঁড়ের লড়াই

গ্রামাঞ্চলে ষাঁড়ের লড়াই অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে কৃষক পরিবারের সদস্যরা এ খেলায় অংশগ্রহণ করে বেশি। কোন কোন কৃষক তার গৃহপালিত ষাঁড়কে অনেক যত্ন করে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করানোর জন্য। তাতে টাকা পয়সাও খরচ করা হয় অনেক। প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের ষাঁড়ের লড়াই ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়ে থাকে। লড়াইয়ের ষাঁড় রাখা ও পোষার জন্য অনেক গ্রামবাসী

গর্ববোধ করেন। বিজয়ী ষাঁড় তার শক্তি দিয়ে মালিকের নাম প্রচারিত করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এটাকে অনেকে তাদের প্রিয় সখ বলেও মনে করেন।

দাড়িয়াবান্ধা খেলা

হা-ডু-ডু'র মত দাড়িয়াবান্ধা বাংলার সর্বাঞ্চলীয় জনপ্রিয় গ্রাম্যখেলা। খোলা জায়গায় নির্দিষ্ট ঘর কেটে দাড়িয়াবান্ধা খেলা হয়। বালক-বালিকা এমনকি বয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ খেলায় ঘরের সীমানার বাধ্যবাধকতা আছে। ফলে দ্রুত দৌড়ের চেয়ে কৌশল প্যাচের উপযোগিতা অধিক। সংযত দৌড়ের এ খেলাটিও শরীরচর্চার প্রকৃষ্ট উপায়। সাধারণত ৪/৫ থেকে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়। এ খেলায় ছক বাঁধা ঘর থাকে এবং মাটির উপর দাগ কেটে ঘরের সীমানা নির্দেশ করা হয়।[৫৪]

গোল্লাছুট খেলা

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় কিশোরগঞ্জেও এ খেলার চল আছে। পরিমিত সীমানার দৌড়ের দ্রুততার উপরেই খেলাটি সাফল্য নির্ভর করে। হা-ডু-ডু বা বউছির মত দৌড়ানোর সময় নিশ্বাস রুদ্ধ করতে হয় না। তবে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে। সমান সংখ্যক দুই দলের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪/৬ থেকে ৮/১০ জন পর্যন্ত হতে পারে। খোলা মাঠ বা বাগান খেলার প্রশস্ত স্থান। একটা ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা ৪০/৫০ হাত দূরে ইট-পাথর অথবা কোন গাছ বহিঃসীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়। গর্তে একটা কাঠি থাকে, তাকে 'গো' বলে। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছটিকে ছোঁয়াই হলো এ খেলার মূললক্ষ্য। আর এ থেকেই এর নাম গোল্লাছুট হয়েছে।

দলের একজন প্রধান থাকে। অন্যান্যরা 'গোদা' নামে পরিচিত। যে পক্ষ প্রথম দান পায় তারা গর্তের গোল্লা ছুঁয়ে দাঁড়ায়, গোদারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে প্রধান ব্যক্তিকে ঘিরে ঘুরতে থাকে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা সুবিধামত যে যার স্থান গিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের বেষ্টন থেকে যার বা যাদের হাত ছুটে যাবে তারা দ্রুত দৌড়ে যাবে দূরের সীমা স্পর্শ করতে। বিপক্ষ দলের লক্ষ্য এদের ছুয়েঁ বাধা দেওয়া। দৌড়ের কোন নির্দিষ্ট দিক নেই, এলোমেলোভাবে ছুটে লক্ষ্যস্থলে এসে পৌঁছতে পারলেই হলো। বিপক্ষেরা ছুঁলেই খেলোয়াড় মারা পড়ে। যতক্ষণ গর্ত ছুঁয়ে আছে ততক্ষণ নিরাপদ। গর্ত ছেড়ে শেষ পর্যন্ত প্রধান ব্যক্তিকেও ছুটতে হয়। যারা সফলকাম হয় তারা গোল্লা থেকে জোড় পায়ে একটা করে লাফ দেয় বহিঃসীমার দিকে।[৫৫]

সব লাফ মিলিয়ে উক্ত সীমানায় পৌঁছতে পারলে এক 'পাটি' হয়। না পারলে সবাই স্পর্শ দোষে মারা পড়লে বিপক্ষরা দান পাবে, এ পক্ষের কোন 'পাটি' গণ্য হবেনা। পর্যায়ক্রমে গোল্লা পাওয়া এবং প্রতিরোধ করার ভেতর দিয়ে খেলাটি চলতে থাকে। পাটির সংখ্যানুযায়ী জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

বলাই

কোন কোন অঞ্চলে বলাই খেলাকে মলাই খেলা বলে। কিশোরগঞ্জে এটি বলাই খেলা নামে পরিচিত। বলাই খেলা পানির খেলা। পানিতে নেমে এ খেলা খেলতে হয়। বিশেষ করে এ খেলায় ডুব সাঁতার জানা থাকতে হবে। নইলে এ খেলা করা যাবেনা। বলাই ছড়া যুক্ত খেলা। এ খেলায় ছেলেরা নদী বা পুকুরে ডুব সাঁতার কেটে মুখে মুখে ছড়া বলে খেলাটি শুরু করে।

প্রথমে একজন বলে- তোমরা কে কোথায়? দশ বারোজন খেলোয়াড় সবাই এক সাথে বলে ওঠে- আমি এখানে। তুমি কে? সর্ব প্রথম যে উত্তরে বলবে- আমি বলাই। সাথে সাথে সে তার মুখেই বলে ওঠে- আমি পলাই। অর্থ্যাৎ এ খেলায় যে 'বলাই' হবে সে তাৎক্ষণিক পানিতে ডুব সাঁতার কেটে কেটে পলানোর চেষ্টা করে। আর অন্যেরা তাকে ছুঁয়ে মারতে পারলে সে হয়ে যাবে 'বলাই'। আবার সে বলবে- আমি বলাই, ডুব সাঁতার দিয়ে পলাই।

আবার অন্যেরা তাকে ধরে ছুঁতে যাবে এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই বলাই হবে আর চক্রাকারে বা পালাক্রমে সবাই বলাই সেজে খেলাটি দীর্ঘক্ষণ পানিতে হৈ-চৈ করে সময় কাটিয়ে দেয়। কখনো কখনো গভীর পানিতে কিংবা অল্প পানিতে ডুব দিতে গিয়ে অন্য দশ-বারো জন ছেলে একত্রে এসে কাউকে ছুঁতে গিয়ে এমনভাবে সজোরে জাপটে ধরে যে, কোন কোন ছেলের নিশ্বাস বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে এতে কখনো কখনো আনন্দের সাথে মৃত্যুজণিত দুর্ঘটনার আশংকা দেখা দেয়। যে জন্য এ খেলাটি খুবই সাবধানতা বা সতর্কতার সহিত খেলতে হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো দুর্বল খেলোয়াড় ডুব সাঁতারে এ খেলা খেলতে গিয়ে পেটভর্তি পানি খেয়ে ভেসে উঠতে দেখা যায়। কিশোরগঞ্জের ভাটি বা হাওর জনপদের নদী-নালা, খাল-বিল পুকুর-দিঘিতে এ খেলার প্রচলন রয়েছে।

তই-তই

কিশোরগঞ্জের গ্রামের বালক-বালিকারা 'তই-তই' খেলা খেলে থাকে। তই-তই খেলায় ডুব অথবা সাঁতার জানা অত্যাবশ্যক নয়। সাধারণত কোমর পানিতে নেমে সকলে গোল হয়ে দাঁড়ায়। খেলার নিয়ম অনুযায়ী একজনের হাতে থাকে একটা ভাসন্ত ফল, আজকালকার যুগে থাকে বল।

উপর থেকে ঐ ফল বা বলটি একজন লিডার ছুঁড়ে দিলে সঙ্গীয় অন্যান্যরা এটিকে ধরার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে। কে কার আগে ঐ ফল বা বলটিকে ধরে নিয়ে তার দখলে নেবে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। লাফালাফি আর পানিতে হৈ-হুলোড় করে ফল অথবা বলটা কারও হস্তগত করতে পারলেই তাদের দলীয় খেলার আনন্দ। কখনো কখনো দলবেঁধে ছেলেরা কোমর পানি দুই হাতে টেনে ঘোলাটে করে মাতামাতি আর মুখে মুখে উচ্চস্বরে ছড়া বলে-

তই তই তই

বগা মাইরা ডুলাত থই

তই তই তই

বগা অইল কুইয়্যা

ভূইয়্যা খায় চুইয়্যা ।

তই তই তই

খুলাত ভঁজে মুড়ি খই

তই তই তই ।[৫৬]

রস-কস খেলা

১০-১২ জন পর্যন্ত এ খেলা খেলতে পারে কিন্তু ৫ জনে খেলাই উত্তম । সবাই গোল হয়ে বসে প্রথমে মাটিতে বাঁ হাতের তালু উপুড় করে মুখামুখি রাখে । আঙুলগুলো সব ছড়ানো থাকে কিন্তু কোনো ফাঁক থাকে না । রস, কষ, শিঙ্গাড়া, বুলবুলি, মস্তক- এই পাঁচটি নামের যেকোনো একটি নাম একে একে পছন্দ করে নেয় । যে রস বেছে নেয় সে বলে 'আমি রস' । একজন চোর সেজে অন্য হাতের তর্জনি দিয়ে অন্যদের ছড়ানো আঙুলগুলোর উপর টিপ দিয়ে দিয়ে বলতে থাকে "রস কষ শিঙ্গাড়া বুলবুলি মস্তক" । যার নাম যা, তার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে গণনার সময় তার যে আঙুলে চোরের আঙুল পড়ে তখনি সে সেই আঙুলটি করতলের ভেতরের দিকে ভাঁজ করে লুকিয়ে ফেলে । চোর তার গণনা চালিয়ে যেতে থাকে ।

এভাবে রস বললে রসের আঙুল, কষ বললে কষের আঙুল, শিঙ্গাড়া বললে শিঙ্গাড়ার আঙ্গুল ভাজ হয়ে লুকিয়ে পড়ে । অন্যদিকে গণনা চলতে থাকে ঘুরে ঘুরে । গণনা করতে করতে যার হাতের পাঁচটি আঙুলই বাজ হয়ে যায় সে ওঠে যায় । শেষে যে উঠতে পারে না, সে হয় চোর । চোর ডান হাতের তালু প্রশস্ত করে খাড়া ও উপুড় করে মাটির উপর ধরে, বাকিরা ঝুলন্ত তালুতে জোড়ে চড়-থাপ্পড় মারার চেষ্টা করে । এসময় চোর চড়-থাপ্পড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘনঘন হাতের তালু ওপরে ওঠানোর চেষ্টা করে । কেউ চড়-থাপ্পড় মারতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে চোর তার হাত থেকে বেঁচে যায় । এভাবে একে একে সবাইকে ফাকিঁ দিয়ে চোর যদি নিজের হাত বাঁচাতে পারে, তাহলে সে মুক্ত । আর তা না হলে যাদের হাত থেকে সে নিজের হাত বাঁচাতে পারল না, তারা তার পিঠে কিল দেয় । এভাবে খেলা শেষ হয় ।

হুমগুটি/গুটি খেলা

গুটি বা খুঁটিখেলা পল্লীর মেয়ে মহলে অবসর-বিনোদনের খেলা । পাঁচটি গোলাকার পাথর গুটি খেলার উপকরণ । বিচিত্র ও জটিল পদ্ধতিতে এটি খেলা হয় । হাতের দক্ষতায় ও ক্ষিপ্রতায় খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে । পাঁচটি গুটির একটি হয় 'ডাগ' । কখনো এক হাতে, কখনো দু'হাতে দাগের সাহায্যে অন্য ঘুটি

লোফালুফির ভেতর দিয়ে খেলা চলতে থাকে। লোফালুফির সময় কোন গুটি মাটিতে পড়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। কড়ি খেলার মত চক্রবর্তনে গুটি খেলা চলে। নানা প্রক্রিয়া শেষ করে যে আগে 'পাকে' তার একটি পয়েন্ট হয়। এরূপে সাত কি দশ পয়েন্ট পেলে সে জয়ী হয়। শেষ পর্যন্ত যে হারে তাকে জোড়-বিজোড় ধরে কিল মারার সুযোগ পায়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এ খেলার প্রচলন রয়েছে।

৬.৯ উপসংহারঃ

কিশোরগঞ্জ অঞ্চল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অনন্য অঞ্চল। এ জেলার মাটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে লোক-সংস্কৃতি। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ময়মনসিংহ গীতিকার চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি এ অঞ্চলের। সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় এ জেলার সন্তানদের রয়েছে বিচরণ। এ জেলার পুঁথিপাঠ ও নাট্যচর্চার এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে জন্ম বাংলা সাহিত্যের সুপ্রাচীন কবি দ্বিজবংশী দাস, প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, উপেন্দ্র কিশোর রায়, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, নীরোদ চন্দ্র চৌধুরীসহ আরো অনেক বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকবৃন্দের। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলাকে আলোকিত করেছেন গণসঙ্গীত শিল্পী নিবারণ পণ্ডিত, বাউল অখিল গোস্বামী, রাম কানাই, মামুদজান ফকির, ফকিরচান্দ, বাউল তাহের উদ্দিন খাঁ, মকবুল হুসেন ও ইসলাম উদ্দিন বয়াতিসহ আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার ও সুরকারবৃন্দ। পালাগান, কবিগান, ঘাটুগান, ভাসানগান, বাউল গান এর চারণভূমি এই জেলা। শুধু নাটক বা সাহিত্য নয় লোকজ ছড়া, আচার-অনুষ্ঠান ও খেলাধুলায় এ অঞ্চলের রয়েছে সুখ্যাতি। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ইত্যাদি আন্তর্জাতিক খেলাধূলার সাথে এ মাটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে হা-ডু-ডু, বউচি, গোল্লাছুট, কানামাছি, বলাই, তই-তই, গুটি খেলার মত গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা সমূহ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি যেন এ মাটির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তথ্য-নির্দেশ

১। সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে ড. মোতাহের হোসেন চৌধুরী এই মূল্যবান কথাটি বলেন। আহমদ শরীফ, *বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি* (ঢাকা: মুক্তধারা,১৯৭৪), পৃ.৮৮

২। আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ.২৩

৩। নীহাররঞ্জন রায়, *কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি* (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা-১৯৭৯), পৃ. ১-৮

৪। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এমএ (সংকলিত), *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা:সাহিত্য সঙ্গসদ, তৃতীয় সংস্করণ), পৃ.৮০০

৫। রেজয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি-১৯৯৬), পৃ.১৫

৬। আনিসুজ্জামান, *আমাদের সংস্কৃতি*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশ: *বাঙ্গালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স-১৯৯০), পৃ.৭৩

৭। গোপাল হালদার, *বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫), পৃ.১০

৮। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩৩২

৯। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩০৫

১০। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩০৭

১১। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি-২০১৫), পৃ.৮৮

১২। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩১০

১৩। নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-১৯৯২, পৃ.৪৪৪

১৪। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৪৪৫

১৫। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী (অক্টোবর-২০১৪), পৃ.৬৫-৬৮

১৬। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩১২

১৭। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি-২০১৫),পৃ.১০১-১০২

১৮। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী (অক্টোবর-২০১৪), পৃ.১১৪-১২০

১৯। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি-২০১৫), পৃ.১২১

২০। মু আ. লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩১৩-৩১৪

২১। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি-২০১৫), পৃ.১১৫

২২। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১১৫

২৩। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১১৬

২৪। মু আ. লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩২৬

২৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩২৭

২৬। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী (অক্টোবর-২০১৪), পৃ.৯৯-১০৩

২৭।মু আ. লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩২২-৩২৩

২৮। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি-২০১৫), পৃ.১২

২৯। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৬

৩০। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৭

৩১। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২০

৩২। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৪

৩৩। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৩১৮

৩৪। দীনেশ চন্দ্র সেন রায় বাহাদুর (সংকলন), *মৈমনসিংহ গীতিকা*, প্রকাশক-বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম, ঢাকা- ২য় সংস্করণ, পৃ.১৮৪-২০০

৩৫। www.kishorgonj.com

৩৬। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.২৭৯

৩৭। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.২৮১

৩৮। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি-২০১৫), পৃ.৯৬

৩৯। মু আ. লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩১১

৪০। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.১৪৫

৪১। মু আ. লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ.৩১২

৪২। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.১৩৪-১৩৫

৪৩। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৩৮

৪৪। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৪১

৪৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৪৩

৪৬। মু আ লতিফ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী (জানুয়ারি-২০১৫), পৃ.২৫

৪৭। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.১৪৭-১৪৮

৪৮। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.১৫৪

৪৯। মু আ. লতিফ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৮, পৃ-৩৪৪-৩৪৫

৫০। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৩৯

৫১। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৬২

৫২। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩৬৬

৫৩। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ.৪৬৩

৫৪। এম এ কাইয়ুম, *কিশোরগঞ্জের লোকজ ঐতিহ্য ও চারুকলা*, চন্দ্রাবতী প্রকাশনী, পৃ. ৩১

৫৫। প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ.৩০

৫৬। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, জুন-২০১৪, পৃ. ৪৬৫

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

কিশোরগঞ্জ ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এবং আলোকোজ্জ্বল একটি জনপদ। ভৌগোলিকভাবে এ অঞ্চলটি উপমহাদেশের ভাটি বা হাওর এলাকা বলে বিবেচিত হলেও এখানকার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার ঐশ্বর্য বলে খ্যাত। কিশোরগঞ্জ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে অবস্থিত কিশোরগঞ্জ মহকুমা হিসেবে ১৮৬০ সালে এবং জেলা হিসেবে ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ জেলায় মোট সংসদীয় আসন সংখ্যা ৬টি, উপজেলার সংখ্যা ১৩টি, পৌরসভা ৮টি, ইউনিয়ন ১০৮টি, মৌজা ৯৬৭টি। ১৩টি উপজেলার এ জেলার স্থলভাগ ২.৪৭৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জলভাগ ৮৩ বর্গ কিলোমিটার। সমগ্র বাংলাদেশের তুলনায় শতকরা ১.৭৭ ভাগ এলাকা নিয়ে গঠিত কিশোরগঞ্জ।

একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম জেলা ছিল ময়মনসিংহ । এটি ১৭৮৭ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমলের "ওয়াসিল তুমার জমা" (Rent Roll) বন্দোবস্তের মাধ্যমে ১৫৮২ সালে বাংলাদেশকে ১৯টি সরকার এবং সরকারগুলোকে ৬৮২টি মহালে ভাগ করা হয়। এর একটির নাম 'সরকার বাজুহা'। তখন সরকার বাজুহার মহালের সংখ্যা ছিল ৩২টি। সুলতান হোসেন শাহের সময়ে যে অঞ্চলটি 'নছরত শাহী' প্রদেশে পরিচিত ছিল সেটিই টোডরমলের 'সরকার বাজুহা' নামে পরিচিত। ওই সরকারের আয়তন ছিল পূর্বসীমা বর্তমান সিলেটের কিছু অংশ, পশ্চিমে বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশবিশেষ এবং দক্ষিণে বর্তমান ঢাকা শহরের দক্ষিণে, বুড়িগঙ্গার তীর পর্যন্ত। ইংরেজ আমলেই 'সরকার বাজুহা' হলো বিশাল ময়মনসিংহ জেলা। আজকের কিশোরগঞ্জ তৎকালীন সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীন যুগে কিশোরগঞ্জের অবস্থান কি ছিল, তা স্পষ্ট জানা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে প্রখ্যাত পর্যটক মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমনের অনন্য দলিল "ইন্ডিকা" গ্রন্থের মানচিত্র থেকে অবগত হওয়া যায় যে, কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল ছিল বিশাল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মহাকাব্যের যুগে (রামায়ণ/ মহাভারত) কামরূপ পরিচিত ছিল প্রাগজ্যোতিষ নামে। "যোগিনীতন্ত্র" অনুসারে কামরূপ রাজ্যের এলাকা ছিল দৈর্ঘ্যে ৮০০ মাইল ও প্রশস্তে ২৪০ মাইল। "কালিকাপুরাণ" থেকে জানা যায় যে, কামরূপের রাজা ছিলেন নরক, যিনি 'রামায়ণ'এ বর্ণিত মহান নরপতি রামের সমসাময়িক। নরকের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র ভগদত্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্ভবত ১২০০ - ১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব এর কোন এক সময়ে রাজা ছিলেন এবং কামাক্ষা দেবীর উপাসক ছিলেন। চতুর্থ শতকে উত্তর বঙ্গেও মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের (৩৪৬-৩৮০) এলাহাবাদ শিলালিপিতে কামরূপ (বর্তমান আসাম) গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত করদ রাজ্যরূপে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে কামরূপ রাজ্য সপ্তম শতকে মুক্ত হয়। কিশোরগঞ্জ সহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীর পুনরায় কামরূপ শাসকের অধীনে চলে আসে। তখন কামরূপের রাজা ছিলেন ভাস্কর বর্মা। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ-এর বিবরণ এরূপ সাক্ষ্য দেয়।

সম্ভবত ৬৫০ খ্রি. পর্যন্ত ভাস্কর বর্মা বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ এ অঞ্চল শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরগণ দশম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিল বলে জানা যায়। মৌলভীবাজার জেলায় প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের (৯৩০-৯৯৫ খ্রি.) তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ চন্দ্রবংশের শাসনাধীন ছিল। উক্ত বংশের রাজা শ্রীচন্দ্র, তাঁর পুত্র কল্যান চন্দ্র (৯৭৫-১০০০ খ্রি.) ও পরবর্তী বংশধরগণসম্ভবত একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই এলাকা শাসন করেন। একাদশ শতাব্দীতেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ পাল রাজাদের অধীনে চলে আসে। অবশ্য একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চল বর্মন বংশীয় রাজাদের অধীনে চলে গিয়েছিল।

পরবর্তী সেন রাজবংশের আমলে বৃহত্তর ময়মনসিংহের উপর তাদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সময়ের আবর্তে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর সেন রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হলেও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীর কামরূপ শাসনমুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল রাজ্যের নেতৃত্বে ছিলেন কোচ, হাজং, গাড়ো, রাজবংশী প্রভৃতি আদিম সম্প্রদায়। আজকের কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ছিল এই স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্যতম পীঠস্থান।

কোচ সর্দার দলিপকে হত্যা করে শেরপুরের গড়দলিপা দখলের ভিতর দিয়ে ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহের সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে মুসলিম রাজত্বের শুরু হলেও কিশোরগঞ্জের মুসলিম শাসনের বিস্তার আরো পরে। ইলিয়াস শাহী বংশ বৃহত্তর ময়মনসিংহে দীর্ঘকাল তাদের শাসন বজায় রাখে। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে রাজা গণেশের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। মূলত সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলেই (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) বৃহত্তর ময়মনসিংহে মুসলিম শাসন সুবিস্তৃত হয়। তবু আদিবাসী অধ্যুষিত স্বাধীন জনপদ গুলোর অস্থিত্ব টিকে ছিল আরো বহুদিন। বিশেষ করে কোচ অধ্যুষিত জঙ্গলবাড়ীসহ সমগ্র কিশোরগঞ্জ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনতায় আসে সম্রাট আকবরের সময়। এই শাসন বিস্তৃতির সূচনা পর্বে যার নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত তিনি হলেন বিখ্যাত বারভূঞার অন্যতম ঈসাখাঁ। মুঘলদের সাথে দেওয়ান ঈসাখাঁর যুদ্ধের আগে জঙ্গলবাড়ী, এগারসিন্দুরসহ অন্যান্য স্থানের কোচ অহমসহ আদিম সম্প্রদায়ের শক্তিশালী নৃপতিদের অস্তিত্বও ছিল। দেওয়ান ঈসাখাঁর সাথে তাদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম শাসন পূর্ব আদিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতিহাসের পাতা থেকে যতটুকু এর সময়কাল জানা যায়, সম্ভবত ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ইসা খাঁর নিকট জঙ্গলবাড়ীর কোচ সর্দারের পরাজয় হয় এবং মুঘল সেনাবাহিনীর নিকট ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে এগারসিন্দুরে অহমরাজের পরাজয় হয়। তবে কিশোরগঞ্জের ইতিহাসের পাতায় যে ঘটনা সবচেয়ে আলোচিত তা হচ্ছে মুঘলদের সাথে দেওয়ান ইসা খাঁ ও ততপুত্র মুসা খাঁর দীর্ঘ সময়ের সশস্ত্র সংগ্রাম। মুঘল আমলের তথা মুসলিম শাসনের সমাপ্তির সাথে সাথে অবসান ঘটেছে মধ্যযুগের ইতিহাসের এবং ইতিহাসেরই গতিধারায় অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ইংরেজ আমল। শুরু হয় আধুনিক যুগের কিশোরগঞ্জের পথ পরিক্রমন।

কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে লিখিত বিবরণ ইংরেজ আমলেই প্রথম পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত "*Principal Head History and Statistics of the Dacca Division*", এরপর হান্টারের ১৮৭৫ সালে রচিত "*A Statistical Account of Bengal*", এফ এ সাকসির '*Bengal District Gazetteers Mymensingh*' এবং '*Final Report on the Survey and Settelment Operation in the district of Mymensingh 1919*' উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কিশোরগঞ্জের কৃতীব্যক্তিত্ব শ্রী কেদারনাথ মজুমদারের *'ময়মনসিংহের বিবরণ'*, *'ময়মনসিংহের ইতিহাস'* এবং জেমস রেনেলের অবিভক্ত বাংলাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে কিশোরগঞ্জের নদী ও প্রাচীন এলাকার বিস্তারিত জানা যায়।

১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় এর থানার সংখ্যা ছিল ৩টি। এগুলো হলো নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ। পরে নিকলী কটিয়াদীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হলেও ১৯১৭ সালে আবার নিকলী থানা পুনঃস্থাপিত হয়।

"Bengal District Administration Committee 1913-1914 Report"-এ উল্লেখ করা হয়েছে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাকে ভেঙ্গে ময়মনসিংহ, গোপালপুর ও কিশোরগঞ্জ নামে ৩টি জেলা করার প্রস্তাব করা হয়। এ সময় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীনে ১০টি থানাকে এ জেলার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ছিল। এদিকে ১৯৬২ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাকে ভেঙ্গে কায়েদাবাদ, নাসিরাবাদ, টাঙাইল ও ইসলামাবাদ করার উদ্যোগও সফল হয়নি। অবশেষে কিশোরগঞ্জ সারা দেশের অন্যান্য মহকুমার মতো জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি।

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি কিশোরগঞ্জ জেলার রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে ১৯৫০ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ করা হলে কিশোরগঞ্জের কৃতীসন্তানেরা বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রেবতী মোহন বর্মন, মহারাজ তৈলক্যনাথ, আনন্দ কিশোর মজুমদার, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, ওয়ালী নেওয়াজ, নরেশ রায়, জান মাহমুদ প্রমুখ।

পরবর্তীতে খেলাফত আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনেই কিশোরগঞ্জের বিপ্লবী সন্তানরা ছিল অগ্রগামী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার নীপিড়নের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনেই কিশোরগঞ্জের সূর্য সন্তানরা ছিল এগিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ জেলার কৃতীসন্তানদের ভূমিকা ছিল মূখ্য।

পুরাতন নথিপত্র থেকে জানা যায়, ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জকে মহকুমা করা হলে এর প্রথম মহকুমা প্রশাসক হন মি. বকসেল (১৮৬০-৬৩)। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হলে এর প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন এ.আর খান, ইপিসিএস (১৯৪৭-৪৯)। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রশাসক ছিলেন এল.এ রহিম ইপিসিএস (১৯৭১)

এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জি. আকবর (১৯৭১-৭২)। কিশোরগঞ্জের সর্বশেষ মহকুমা প্রশাসক ছিলেন মু. আব্দুল মোতালেব মিয়া ১৯৮২ থেকে জেলা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত । এম.এ মান্নান ছিলেন জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক ১৯৮৪-৮৫ । বর্তমান জেলা প্রশাসক হলেন মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী। কিশোরগঞ্জের প্রথম বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন এম.এম রুহুল আমিন (১৯৮৪-৮৭) ও বর্তমান বিজ্ঞ জেলা দায়রা জজ মোহাম্মদ মাহবুব-উল-ইসলাম। প্রথম পুলিশ সুপার ছিলেন মোঃ গোলাম কিবরিয়া (১৯৮৪-৮৫) এবং বর্তমানপুলিশ সুপার হলেন মোঃ মাশরুকুর রহমান খালেদ বিপিএম।

বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক ও ভূ-প্রকৃতিগত গঠন কিশোরগঞ্জের সমাজ ব্যবস্থাকে করেছে বৈচিত্র্যময়। পলি উর্বর ভূমির শস্য ও সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কিশোরগঞ্জবাসী বহির্মূখী নয় বরং সুদূর অণীতকাল থেকেই স্ব-ভূমি ও স্বগোত্র বা জাতির প্রতি থেকেছে আন্তরিক একনিষ্ঠ ও স্থিতিবান। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে যারা বাস করতো তাদের সঙ্গে বাইরে পৃথিবীর যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তাদের জীবনে একটা ইনসুলারিটি নির্মিত হয়েছিল যাকে বাংলায় বলা হয় একাত্মতা। বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা নিজেদের অঙ্গনে একটা বিশেষ ধরনের সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সার্বিক পর্যালোচনায় কিশোরগঞ্জের সমাজ জীবন নির্ভেজাল গ্রামীণ জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদের অভাবে এখানে তেমন কোন শিল্পকারখানা গড়ে উঠেনি এবং উর্বর কৃষি ভূমির প্রাচুর্যে এখানে কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয়। আর যেসব শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলিত রয়েছে তাও মূলত কৃষিভিত্তিক। উদাহরণস্বরূপ: এখানে প্রাচীনকাল থেকেই ধান ও পাটের ব্যবসা ছিল রমরমা। এমনকি চরাঞ্চলের আখের উৎপাদন ভালো হওয়ায় এখানে গড়ে উঠেছিল দেশের বৃহত্তম চিনি উৎপাদন কারখানা। তবে হাওর অঞ্চলে মৎসজীবী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায়।

কিশোরগঞ্জের বোরো ধান প্রধান ফসল। তবে অগ্রাহায়ণ মাসে নবান্নে নতুন ধান উঠানো ও পিঠা পার্বণে মেতে থাকে সমগ্র অঞ্চল। উৎসবে পার্বণে সমাজে এক অন্যরূপ দেখা যায়। অতিথি পরায়ন এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে তাই উৎসব, পূজা, পার্বণ মিলনমেলায় পরিণত হয়। এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে পারিবারিক বন্ধন অনেক দৃঢ়। সমাজে প্রবাদ প্রবচন, গীত ও গানের প্রচলন রয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে তাই হলদে গীতের প্রচলন দেখা যায়। তবে হাওর অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জীবন প্রণালীতে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। হাওর অঞ্চলের মানুষেরা লড়াকু, উদার, সহজ সরল ও চিরাচরিত জীবন প্রণালীতে বিশ্বাসী। প্রকারান্তরে চরাঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের সাথে যোগাযোগ থাকায় মানুষের জীবন প্রণালীতে আসছে নিত্য নতুন পরিবর্তন। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় হাওর অঞ্চলের নারীরা অলংকার প্রিয়। তবে সখিনা,

মহুয়া, মালুয়া, মাধবী কন্যার দেশ ও কিশোরগঞ্জে প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা স্বাধীন। এ অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থায় তাদের অবদান রয়েছে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এর মতে-সীতা সাবিত্রীর চেয়ে এই পূর্ব ময়মনসিংহ অর্থ্যাৎ বর্তমান কিশোরগঞ্জের কৃতি নারী মহুয়া, মালুয়া, মদিনা, চন্দ্রাবতী ও কমলার জীবন গাঁথা বাংলা ও বাঙ্গালীর অধিকতর গৌরবের বিষয়।

জ্যোতিষী খনার প্রভাব এ অঞ্চলের মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। কারণ এ অঞ্চল কৃষি প্রধান, আর এ কারণে দেখা যায় কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার একটি জনপদের নাম খনারচর। মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, মহুয়া পালার মদিনা ও আধুনিক যুগের ক্যাপ্টেন সেতারা এ অঞ্চলের নারীদের উজ্জ্বল প্রতিনিধি। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ ও এর পরবর্তী বঙ্গ-ভঙ্গ রদ এ অঞ্চলের মানুষের সম্প্রীতিতে তেমন প্রভাব ফেলেনি। এমনকি আজ অবধি এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উগ্রতাও পরিলক্ষিত হয়নি। আবহাওয়া ও প্রকৃতিগত কারণে এ অঞ্চলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সকল ধর্মের লোকই বসবাস করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাই তো কিশোরগঞ্জের মধ্যযুগের কবি দ্বীজ বংশীদাস লিখেছিলেন-

একই ঈশ্বর দেখ, হিন্দু মুসলমানে
যার যার কর্ম যার যার ধর্ম জ্ঞানে।

তাছাড়া নাথ, যোগী, বৈষ্ণব ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে এ অঞ্চলে। সমগ্র কিশোরগঞ্জের ভাষার একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে কথা বলতে গিয়ে অতীতকালের শব্দ বর্তমানকালে ব্যবহার করা হয়। যেমন খাইতাম না (খাবো না)। এমনকি কিশোরগঞ্জের এক অঞ্চলে এমন ভাষা রয়েছে যা অন্য অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারেনা। যেমন অষ্টগ্রামে প্রচলিত ছহুম ভাষা। উদা: 'সাইর যারে টাইআ বেড়অ' অর্থ্যাৎ আমাকে একটা সিগারেট দাও।

সখিনা, মলুয়া, মাধবী, মালঞ্চী কইন্যার অঞ্চল কিশোরগঞ্জ। ড. দীনেশচন্দ্র সেন যে হারানো গীতিকা সম্পদকে উদ্ধার করে ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমাদেরকে বিশ্বের কাছে বরেণ্য করে তুলেছেন তার চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি আমাদের পূর্ব ময়মনসিংহের। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ীর কোচ রাজা লক্ষণ হাজরা, সুশংরাজ রঘুপতি আর এগারসিন্দুর বেবুদ রাজার কাহিনী কিংবদন্তী। বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা দ্বিজবংশী দাসের পূণ্যভূমি এ কিশোরগঞ্জ। তাঁরই কন্যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। তিনিই রামায়ণের সার্থক অনুবাদকারী ফোকলোর কাব্যের নায়িকা। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিগর্ভা কিশোরগঞ্জের বীরত্বগাঁথা আর বীরসন্তানদের নাম ইতিহাসের বিশাল অধ্যায়। এ অধ্যায়ের ভূবন কাপানো নাম-মহারাজ তৈলোক্যনাথ, ব্যারিষ্টার ভূপেশগুপ্ত, নগেনসরকার, বিবরেন চক্রবর্তী,

জমিয়াত আলী, গঙ্গেশ সরকার, ওয়ালীনেওয়াজ খান, রেবতী বর্মনসহ অসংখ্য খ্যাতিমান স্বাধীনতা সংগ্রামী এ জনপদের বীরসন্তান। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সবসময় এ অঞ্চলের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। কিশোরগঞ্জে রয়েছে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ঈদগাহ মাঠ শোলাকিয়া, রয়েছে ঐতিহাসিক জঙ্গলবাড়ী, এগারসিন্দু দুর্গ ইত্যাদি।

ষোড়শ শতকের সাংস্কৃতিক রাজধানী খ্যাত কিশোরগঞ্জের তৎকালীন সাহসী ও আধুনিক চেতনাসম্পন্ন লোককবি ও বয়াতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজো অব্যাহত রয়েছে এখানকার শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা। মূলতঃ লোকজ কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যের সূচক ও শেকড়ের উৎস। এখানকার অলংকার, মৃৎশিল্প, বাঁশ-কাঠ নির্মিত সামগ্রী অথবা লোকমুখে প্রচলিত ও ব্যবহৃত গীত, গাঁথা, তত্ত্বসঙ্গীত, দেহতত্ত্ব, ছড়া, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার, খেলা, জারি ইত্যাদি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যরই মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। কিশোরগঞ্জের পালাগান, পুঁথিপাঠ ও লোকসঙ্গীত সাধারণ মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। এখানকার জারিগান ও এর বিচিত্র পরিবেশনা শ্রোতামণ্ডলীর কাছে খুবই উপভোগ্য। এখানকার প্রতিটি গীতি ও নৃত্যনাট্য দৃষ্টিনন্দন ও অনন্য সাধারণ। কিশোরগঞ্জের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন, কবি অনন্ত দত্ত, নারায়নদেব, দ্বিজ বংশীদাস, চন্দ্রাবতী, নিত্যনন্দ দাস, গঙ্গা নারায়ণ, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়, নীরোদচন্দ্র চৌধুরী, মুন্সি আজিম উদ্দিন, খালেদ বাঙ্গালী প্রমুখ।

শব্দকোষ

(কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার শব্দকোষ)

অ

অহ্কা/অহন-এখন

অজ-হজ্জ্ব

অরতহি-হরিতকি

অস্তে-নিঃশব্দে, ধীরে

অস্তস্তে-ধীরে ধীরে

অলংগা-বর্শা, বাঁশ বা কাঠের সুঁচালো ফালি

অলবইন্যা-আজগুবি

অইল - হলো

আ

আইয়েকাল-আগামীকাল

আইরল-হ্যারিকেন

আইলনা-আলুনি, লবণবিহীন

আইল্যা-আগুনের মালসা, তুষ-কয়লাদি জ্বালিয়েরাখার মাটির পাত্র ।

আইশনা-আশ্বিনে, আশ্বিন মাসে উৎপাদনশীল সবজি বা শস্য

আইক্কা-বাঁশের কঞ্চি

আইডা-এটো, ঝুটা

আউলা-এলোমেলো, বিশৃঙ্খল

আকাম-খারাপ কাজ, অকাজ

আজগা/আইজগা/আজ্জোয়া-আজ

আৎকা - হঠাৎ

আজাইরা-অহেতুক, অনর্থক, কর্মহীনতা

আজ্জের-আধাসের

আঞ্জা-জাপটে ধরা

আঞ্জাআঞ্জি-ঝাপ্টাঝাপ্টি

আতারে পাতারে-যেখানে সেখানে, যত্রতত্র

আতাআতি-হাতাহাতি

আতাভোতা-সহজ-সরল

আন্তাজি-অনুমানে, অনুমাননির্ভর

আন্ধাইর-আঁধার, অন্ধকার

আন্ধাগিরা-কঠিন গিঠ

আন্ধাগুন্ধা-অনুমান নির্ভর

আন্দেশা-চাল-গুড়বা চিনি মিশ্রিত তেলে ভাজা পিঠা

আফইট্ট্যা-ফটকাবাজ

আবাল-নাবালক

আমিলদার-গর্ভবতী, সন্তানসম্ভবা

আল্না-কাড়পড়চোপড়রাখার দণ্ডায়মান কাঠের ফ্রেম

আরগাজা-অপরিচ্ছন্ন

আলাবালা-বাহানা

আঁচ্চি-হাঁচি ।

আঁৎ-অন্ত্র, খাদ্যনালী

আংডা-আংটা

ই

ইক্কার-একসাথে চেঁচিয়েউঠা

ইতর-ফাজিল ব্যক্তি

ইহর-ছন জাতীয়বড়আকারের তৃণ

ইলইচ্চ্যা-হিলচিয়া (বাজিতপুরের একটি স্থাননাম)

ইস্তারি-ইফতার, ইস্ত্রী ।

ইডা-ঢিল ছোড়া

ইঁচা- চিংড়ি ।

উ

উইজ্জ্যা-গায়েপড়া

উইড়্যা-পাল্কিবাহী বেহারা

উইল্লা-হুলোবেড়াল

উজর-আপত্তি

উজবক-বোকা

উড়ি - শিম

উদাম-নগ্ন, আবরণহীন

উদাউরি-বোকা, কম বুদ্ধিসম্পন্ন নারী

উপুত/উপুইত-উপুর

উমালি-গোলমাল করা, ছোটখাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, বিরক্ত করা

উরা-মাটি বা গোবর ফেলার বাঁশের তৈরি ঝাকা

উরাত-উরু

উসারা-বারান্দা

উক্যায়া-উঁকি দিয়ে, কোন কারণে পায়ের কিয়দংশ উপরে উঁচিয়ে হাটা

উহুইন-উকুন

উগার - ঘরের ভিতরে বাঁশ বা কাঠের তৈরী মাচা

ঊ

ঊইন্যা-বাঁশ, বেত বা তালের আঁশ সহযোগে তৈরি মাছ ধরার খাঁচা

ঊক্-আখ, ইক্ষু

ঊনা-খালি

ঊনানি-গলানো, গলে যাওয়া

ঊজুরি-নাড়িভূঁড়ি

ঊলুল ঝুলুল-এলোমেলো চুল, উস্কোখুস্কো চুল

ঊলুশ- ছাড়পোকা

এ

এইদাঙ্কে-এবারে, এ বছর

এংকার- অবহেলা, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা

এঁটকি-হেঁচকি উঠা

এম্মই- এমনিতে

এল্লাগি- এর লাগি, এর জন্য

এম্বায়- এভাবে

ও

ওঁয়ারহা-বাঁশের ফালির তৈরি দরজার নিচে সংযোজিত বাঁশের টুকরো

ওঁয়াশ-নিঃশ্বাস, শ্বাস

ক

কওয়া-বলা

কডা- শীর্ণকায়

কডরা-বাটি

কলেবলে-কোনোরকমে, ছলেবলে

কাইল-কালকে, কাহিল, পরিশ্রম, পরিশ্রান্ত

কাইঞ্জা-পণ্ড, বাতিল, পঁচা, নষ্ট

কাইক-কদম, পদক্ষেপ

কাঁইচলি-দুধের শিশু, একেবারে নাবালক, কোলের শিশু

কাইশটা-কচি, অপুষ্ট, কৃপণ

কাউছালি-কষ্ট কসরৎ

কাউয়া-কাক

কাউয়াকাডি-মাকাল ফল

কাউড়া-জট, পাঁচ লাগা, আঁকে যাওয়া, আড়াআড়ি

কানপড়া-কুমন্ত্রণা

কাডল-কাঁঠাল

কুনহানকার-কোথাকার

কুনহানে-কোথায়

কুশ-কাঁঠালের কোয়া

কুডা-চূর্ণ করা, গুড়াকরণ

কুমানি-চীৎকার

কুতকুতি-কাতুকুতু, সুড়সুড়ি

কেওয়াট-কপাট, কবাট

কেটকেডি-অনবরত বক্ কারী

কেচি-কাঁচি

খ

খাছতেল- সরিষার তৈল

খড়ি- লাকড়ি, জ্বালানি কাঠ

খবিশ- খারাপ

খাঁড়- গুড়

খাতির- বন্ধুত্ব

খাম খাম- খাই খাই

খামছা- নখের আচঁড়

খাটকুড়াইল্যা- কাঠঠোঁকরা

খাচরামি- রুচিহীন

খন্নাছ- জেদি

খারিস্তা- নোংরা

খেশ- আত্নীয়

খেড়- খড়

খ্যাঁতা- কাঁথা

খোয়া- কুয়াশা

খোঁড়ল-গাছের কোটর

গ

গতর-শরীর

গতি-উপায়

গঞ্জি-গেঞ্জি

গাইল- গালি, বকা

গাইড়ল-গাড়িয়াল

গাউক-গ্রাহক, ক্রেতা

গাতক-গায়ক, বাউলশিল্পী

গাও-গতর, শরীর

গাঁও/গেরাম-গ্রাম

গাঙ-নদী

গান্ধা-বাসি, পঁচা

গাতা-গর্ত

গাতি- খুঁটা পোঁতার গর্ত

গাঞ্জা- গাঁজা

গাবর- অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোক

গিধর-অপরিচ্ছন্ন, অরুচিশীল

গিরঅ-গিঠ

গিরস্ত-গৃহস্থ, কৃষক

গিরতাইন-গৃহিনী

গোপাট- হালট

গুড্ডি- ঘুড়ি

ঘ

ঘইন্যা-বেশি কাঁটাযুক্ত রুই জাতীয় মাছ

ঘাউড়া-একরোখা, জেদী, গোঁয়ার

ঘরঅ-ঘরে

ঘাড়ালি-গলাধাক্কা

ঘাঁড়া-ঘাঁটাঘাঁটি, অনুসন্ধান, খতিয়ে দেখা

ঘাঁড়া দেওয়া- নাড়া দেওয়া

ঘিন-ঘৃণা

ঘুড়ুন্ডিবায়ূ-ঘূর্ণিবাত, ঘূর্ণিবায়ূ

চ

চহম-মই

চঁইর-লগি

চলবইল্ল্যা-চঞ্চল প্রকৃতির, চটুল, চটপটে, অতি চঞ্চল

চডা-চাউল বা খুদের তৈরি এক ধরনের পিঠা

চডি-স্যাণ্ডেল, কাঠের চটি বা চেপ্টা পাদুকা

চহি-চৌকি, রেলিংবিহীন খাট

চদর-বদর- কোনোরকমে দায় সারা, যেনতেন প্রকারে

চল-খেলার সহযোগী, প্রচলন

চাইল-চাউল

চাক্-মৌমাছির চাক, কুয়ার চাক্

চাক্ চাক্-ফালি ফালি করে কাটা

চাক্কা-গাড়ির চাকা, মাটির ঢেলা

চাং-ঘরের ভেতরকার সিলিং

চাকি-দলা, চাই

চান্দা-চাঁদা, চান্দা মাছ

চাড়াল-চণ্ডাল, কর্কশ

চাহা-চাক্কা, দলা

চাডি-চাটাই

চান্নি- জ্যোৎস্না

চান্দি-মাথার তালু, ঘরের চালার শীর্ষভাগ

চাঙ্গারি-খাটিয়া

চাপা-চোয়াল, বাজে বাকোয়াস

চিমডি-চিমটি

চিমচুর-ক্ষীণ স্বাস্থ্য, শীর্ণদেহ

চিপুরা-কৃপণ

চিরিঙ্গা-চিচিঙ্গা

চুতরা-বিছুটি

চেতান/চেতানি-ক্ষ্যাপানো

চেলি-কাঠের লাকড়ি

চৌডমুডানি-নিশপিশ, উসখুস করা

ছ

ছই- নৌকার ছাউনি

ছইট-ছটফট করা

ছরতা-সুপারি কাটার যাতি

ছলম-সাপের খোলস, চর্মরোগ বিশেষ

ছডি-প্রসব

ছডিঘর-আঁতুরঘর, প্রসবঘর

ছালুন-তরকারি

ছাপ্পর/ছাফর-ঘরের চালা

ছাডুনি-পাঁজর

ছাবু-সাগু

ছারু-প্লিহা, পিলে রোগ

ছালায়্যা/ছড়ায়্যা-তাড়াতাড়ি

ছিক্ক্যাই-শিকা

ছিটকারি-ছিটকিনি

ছিনাই-ঝিনুক

ছিপি-চামচ

ছিমুইট্টা-সামলানো

ছুছি-অপবিত্র, নাপাক

ছেড়া-ছেড়ি- ছেলে-মেয়ে

জ

জইল্- দাল দেওয়া, দুলুনি

জংলা-জঙ্গল, ঝোঁপ

জবঅ-জবাই

জলহই-জলপাই

জলডুগি-আনারসের একটি প্রজাতি

জবর-খুব, সাংঘাতিক

জঁড়-শেকড়

জাই-ঘরের খুঁটা বা বেড়া দেওয়ার এক প্রকার ফাপা বাঁশ

জাউ-নরম ভাত, অর্ধ তরল ভাত ।

জাড়-শীত, ঠাণ্ডা

জাঁক-কাঁচা পাট পঁচানোর জাগ

জাঁতা- চেপে ধরা

জাঁতাজাঁতি-চাপাচাপি

জানিস্তর-প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী

জাবার-ধান রাখার জন্য বাঁশের তৈরি বড়আধার

জালা-ধানের কচি চারা

জালানি-বিরক্তি, প্রজ্জ্বলন

জ্বালা-কষ্ট, বড়মটকা বিশেষ

জিগানি/জিঙানি-জিজ্ঞেস করা

জিতুরা-জিদ্দি, একরোখা

জিলহি-গরু-ছাগলের নাড়িভুড়ি

জিরান/জিরানি-বিশ্রাম

জিলিঙ্গা-বিবশ, হাত-পা ছেড়ে বেঁহুশ হয়ে পড়া

জিন্ত-জিনিস, বস্তু

জ্যাঁতা-জীবিত, জ্যান্ত

জুড়ানো-শীতলকরণ, ঠাণ্ডা হওয়া

ঝ

ঝনঝনা- পরিণত

ঝি-কন্যা

ঝ্যাঙার-ঝাড়ি মারা

ঝুনা-পাকা, শুকনা

ঝাঁপ- ঘরের ভিতরের বিভাজন বেড়া

ঝিনঝি-শরীরে ঝিঁ ঝিঁ ধরা

ট

টনটনা- পোক্ত

টসকা- পানসে

টাডি- শক্ত

টাট্টি- পায়খানা

টার- টের পাওয়া

টাল- স্তুপ

টেটনা- চতুর

টেডন- অতি চালাক

টেহা- টাকা

টুণ্ডা- বিকলাঙ্গ

টুডা- ছেঁড়া

টেঁহুনি-চালনি

টুহান- কুড়ানো

ঠ

ঠগ- প্রতারক

ঠার- ইশারা

ঠাডা- বজ্র

ঠানামানা- তালবাহানা

ঠারেঠুরে- ইশারা-ইঙ্গিতে

ঠাহুর- ঠাকুর

ঠিশি- ঠাট্টা

ঠিহানা- ঠিকানা

ঠ্যাং- পা

ঠেহা- ঠেকা

ঠেমান- লুকানো

ঠেঁডি- খাট

ঠেঁডা- একরোখা

ঠাঁই-থই

ড

ডহি- পাতিল

ডলক- প্রবল বর্ষণ

ডণ্ড-দণ্ড

ডাট- শক্ত

ডাইয়া- ঠাণ্ডা

ডাবা-হুক্কা

ডুগা-ডগা

ডেগ- রান্নার পাত্র

ডুলি- ধান রাখার আধার

ডিব্বা- কৌটা

ডাঙর-বড়

ডেঙ্গা-ডাঁটা

ডেনা-হাত

ডেঁডা- বোঁটা

ডুমা- টুকরো কাপড়

ঢ

ঢক-সৌন্দর্য

ঢলঢল-ঢিলেঢালা

ঢাহুইন- ঢাকনা

ঢেঁহি-ঢেঁকি

ঢেঁহুরা-অকর্মণ্য

ঢ্যাঙ্গা পোলা-বাড়ন্ত কিশোর

ঢুড়ল-ভেতরে ফাঁকা

ত

তবন- লুঙ্গি

তাতা-উত্তপ্ত

তবদা- অবশ

তাইন- তিনি

তাগাম্বরি-হম্বিতম্বি

তাতানো-গরম

তাফালিং- মাস্তানি

তাল্লোয়া- তালু

তাড়ি- দেশজ মদ

তালই-ভাই/বোনের শ্বশুর

তামুক- তামাক

তেইরা-ঘাড় ত্যাড়া

তেরিবেরি-তালবাহানা

তেলচুরা-তেলাপোকা

থ

থইন- রাখুন

থতমত-দ্বিধাগ্রস্ততা

থাতাবাড়ি-ধমক দেওয়া

থাপা-ছোঁ মারা

থাবরা-থাপ্পড়

থেনহা-আছাড় মারা

থুতা-থুতনি

দ

দনহে-দক্ষিণে

দলা-টুকরো

দম্বাজ-ঠগবাজ

দাও-দা

দাফরানি-ছটফটানো

দান্দাল-টাউট

দিরং-দেরী

দীঘালে- দৈর্ঘে

দুইলা-অল্প

দুছ-বন্ধু

দুফর-মধ্যাহ্ন

দুনামুনা-দ্বিধাগ্রস্থ

দেইড়্যা- বাঁকা

দেও-দানিব

ধ

ধইল্ল্যা-সাদা

ধনি-দাই,ধাত্রী

ধনী-বিত্তশালী

ধলি-সাদা

ধাইর-ঘরের ভিটির বহিরাংশ

ধাতানি-ধমক

ধান্ধা-সুযোগের সন্ধান

ধুন্ধা-কালা, বধির

ন

নাই-নাভী

নাইরল-নারিকেল

নাহঅ- নাকে

নাডা-কৃপণ

নাডাই- নাটের গুরু

নানাবানা-টালবাহানা

নাতিগুতি-বাহানা

নেওরা-অনুরোধ

নোক-নখ

নিমিঝিমি-টিমটিমে

নামা-নিচুস্থান

প

পইক-পাখি

পলা-কুচিকুচি করে কাটা

পলামুঞ্জি-কানামাছি

পশর-ফর্সা

পশশু-পরশু

পঁতরি-সেহরি

পাইন্ন্যা-পানসে

পাইলা-হাঁড়ি

পাগার-গর্ত

পাডি-পাটি

পাড়া-ছোট গ্রাম

পালা-ঘরের খুঁটি

পাঁড়া-পায়ের চাপ

পাহাল-তেজ

পাতার-প্রস্থ

পাডিবলা-পাটিসাপটা

পাড়-তীর

পিঞ্জিরা-খাঁচা

পুত-পুত্র

পুস্কুনি-পুকুর

পুন্নি-পূর্ণিমা

পেজগি-প্যাঁচ

ফ

ফাল-লাফ

ফুরুঙ্গি-আগুনের ফুলকি

ফেকশা-ফ্যাকাসে

ফেঁফরা-ফুসফুস

ফেদা-গায়ের ময়লা

ফেঁউরি-গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি

ব

বইদা-ডিম

বইন-বোন

বউল- আমের মুকুল

বন্দ-শস্যের মাঠ

বউওনি-প্রথম বিক্রি

বডি-বটি

বরহি-ছাগল

বড়ি-বড়শি

বাঅই-বাবুই পাখি

বাইত-বাড়িতে

বাইট্যা-পিষে

বাইল-মিথ্যা

বাও-প্রস্তুত

বাঞ্জা-বাঁজা

বাডা-পেষা

বান-বাঁধা

বান্দা- বাঁধা

বাসুন-থালা

বাহল-বাকল

বাঁইত-বমি

বিচুইন-পাখা

বিজগী-ভেংচি কাটা

বারাত-নিকটে

বিলানি-বিতরণ করা

বিলাই-বিড়াল

বুইত্যা-বড়

বুর-ডুব দেয়া

বুরা-মন্দ

বুবি-লটকন

বুবাই-বোন

বিরিংকিলি-জটিল

বেডা-পুরুষ

বেডি-মহিলা

বেয়ান-প্রসব

বেউঁশ-বেহুঁশ

বেক্কানি- সবটুকু

বেডক-অসুন্দর

বেত্তমিজ-বেয়াদব

বেবুঝ-অবুঝ

বেহুদা-অনর্থক

ব্যাকতা-সব

ভ

ভঁইষ-মহিষ

ভাইট্টা-ভাটি অঞ্চলের

ভাইট্ট্যানি- পিছু হটা

ভাউর-ভাসুর

ভাদাইম্যা-অলস

ভাজিবুজি-হাবিজাবি

ভুক-ক্ষুধা

ভেঙানি-ভ্যাংচানো

ভেশকি-ভান করা

ভেলহি-ভেলকি

ভ্যাদা-লাথি

ভোদাই-বকা

ম

মগা-বোকা

ময়াল-এলাকা

মাগনা-বিনামূল্যে

মাচ্চোয়া-জেলে

মাডা-দুধের ঘোল

মাদানী-মধ্যাহ্ন

মাহর-মাকড়শা

মিছা-মিথ্যা

মুইঠ-মুঠো

মুতা-প্রশ্রাব করা

মুনি-কামলা

মেমান-মেহমান

মেরা-ভেড়া

মেল-সমাজ

মেন্দি-মেহেদী

য

যবর-খুব

যাস্তি-ভারী

যোগাল-দল

র

রউওন-রসুন

রউ-রুইমাছ

রাও-কথা

রাবর-ঘটক

রান্দা-রান্না

রাজাই-লেপ

রুম্বা-লোম

ল

লগে-সাথে

লংকা-লোকমা

লটকি-ঝুলে থাকা

লড়াই-কড়াই

লাই দেওয়া-প্রশ্রয় দেওয়া

লাগাত-পর্যন্ত

লাছ-লাশ

লাডি-লাঠি

লাডুম-লাটিম

লুল-লালা

লুয়া-লোহা

লেমু-লেবু

শ

শইল-শরীর

শওরা-তরকারির ঝোল

শাহারা-আসল

স

সই-সখী

সই করা-স্বাক্ষর করা

সগন-স্বজন

সালুন- তরকারি

সেয়ান-বড়

সিলবর-অ্যালুমিনিয়াম

হ

হওর-শ্বশুর

হওর-শ্বাশুড়ি

হগলে-সকালে

হমান-সমান

হলা-শলা

হয়তান-শয়তান

হলহে-তাড়াতাড়ি

হতাই মা-সৎ মা

হস্তা-সস্তা

হতিন-সতীন

হাইঞ্জ্যা-সন্ধ্যা

হাগ-শাক

হাজ-মেঘ

হান্দানি-ঢুকানো

হুতা-শোয়া

হালুক-শালুক

হিরাবার-আবার

হের-ফাঁক

পরিশিষ্ট "খ"

ঐতিহাসিক স্থান

ভাটি অঞ্চলের জেলা কিশোরগঞ্জ। মসনদ-ই-আলা বীর সেনানী ঈসা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত, নরসুন্দা নদী বিধৌত, হাওর অধ্যুষিত এবং গ্রাম বাংলার শাশ্বত রূপ বৈচিত্র্য ও সোনালী ঐতিহ্যের ধারক কিশোরগঞ্জের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ পুরাণ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। আবহমান কাল ধরে গ্রাম বাংলার পল্লী মায়ের পীযুষধারায় স্নাত এবং স্নেহসিক্ত মাতৃক্রোড়ে লালিত এ সমৃদ্ধ জনপদ অনেকাংশেই বিস্মৃতির পথে। লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত সমৃদ্ধ কিশোরগঞ্জের পর্যটন ও ঐতিহ্যবাহী এসব স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জঙ্গলবাড়ী দুর্গ

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ী গ্রামে এই বিখ্যাত দুর্গটি অবস্থিত। নরসুন্দা নদীর তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর জঙ্গলবাড়ী ছিল ঈসা খাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। জনশ্রুতি অনুযায়ী এগারো সিন্ধুর যুদ্ধে মানসিংহের কাছে পরাজিত হওয়ার পর লক্ষণ সিং হাজরার কাছ থেকে ঈসা খাঁ দুর্গটি দখল করেন। তবে দুর্গের বাইরের ধ্বংসাবশেষ এর ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ থেকে অনুমেয় যে লক্ষন হাজরা ঈসা খাঁ কেউই দুর্গটির মূল নির্মাতা নন। প্রাপ্ত নির্দেশনাবলি সম্ভবত প্রাক-মুসলিম আমলের এবং এটি ছিল একটি সমৃদ্ধশালী জনবসতির কেন্দ্র। তবে দুর্গের অভ্যন্তরে বেশ কিছু স্থাপনা ঈসা খাঁ'র। ১৫৮১ থেকে ঈসা খাঁ জঙ্গলবাড়ীতে অবস্থান করে শাসন করতেন তার ২২টি পরগনা। জঙ্গলবাড়ী অবস্থান করেই তিনি সোনারগাঁও দখল করে সেখানে স্থাপন করেন নতুন রাজধানী। আর তখন থেকেই জৌলুস হারাতে থাকে জঙ্গলবাড়ী। মুসা খান মুঘল আধিপত্য স্বীকার করে নেবার পর ঈসা খাঁ'র বংশধরগণ সোনারগাঁও থেকে জঙ্গলবাড়ী দুর্গে তাদের পরিবারবর্গকে স্থানান্তর করেন। কালক্রমে তারা এ অঞ্চলের জমিদারে পরিণত হন। মুসা খানের দৌহিত্র হয়বত খান 'হয়বতনগর' নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে থেকেই তিনি সাতটি পরগনা শাসন করতেন। ঈসা খাঁ'র বংশধররা এখনও জঙ্গলবাড়ী গ্রামে বসবাস করেন। দুর্গটি ছিল বৃত্তাকার আকৃতির। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে গভীর পরিখা খনন করা এবং পূর্বদিকে নরসুন্ধা নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়। দুর্গ স্থলটিকে এখনও একটি দ্বীপ বলে মনে হয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ইটের টুকরা, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং কয়েকটি নিচু ঢিবি ছাড়া দুর্গটির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে ঈসা খাঁ'র জঙ্গলবাড়ী দুর্গের একটি দরবার হল সংস্কার করে 'ঈসা খাঁ স্মৃতি জাদুঘর' করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কয়েকটি ফটোগ্রাফ, ঈসা খাঁ'র বংশ তালিকা ছাড়া ঈসা খাঁ'র স্মৃতি বিজড়িত তেমন কিছুই নেই।

কিশোরগঞ্জের প্রাচীন গোপীনাথ জিওর মন্দির

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার আচমিতা ইউনিয়নের ভোগবেতাল নামক স্থানে রয়েছে এ জেলার প্রাচীন গোপীনাথ জিওর মন্দির। এটি খ্রিস্ট্রীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত বাংলাদেশের একটি প্রাচীন বিখ্যাত দেব মন্দির। প্রাচীন স্থাপত্যরীতি ধারায় দেশী ছনের চৌচালা ঘরের প্যাটার্নে তৈরী মন্দিরের জীর্ণ প্রাচীন প্রাচীরে একটি শিলালিপি রয়েছে। মন্দির গাত্রে ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ এ শিলালিপিটি মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। তবে এর পাঠোদ্ধার হলে হয়ত প্রকৃত ইতিহাসের আরো অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। জনশ্রুতি রয়েছে চারিপাড়ার এককালের প্রাচীন তান্ত্রিক সামন্তরাজ নবরঙ্গ রায় কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে দেয়াল ঘেরা মূল ফটক দুটি। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালে মূল মন্দিরসহ পুরাতন মন্দির ছিল সাতটি। প্রায় অর্ধমাইল ছিল গোপীনাথ জিওর মন্দিরের অবস্থান এলাকা। বর্তমানে ২টি মন্দির, ১টি রন্ধনশালা, ৩টি অতিথিশালা, ১টি ঝুলন মন্দির, ১টি ভান্ডার ঘর, ১টি নাথ মন্দির, শিব মন্দিরসহ ১টি পুকুর, ১টি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ও ১ টি অফিস কক্ষ রয়েছে। পুকুরের পাশে একটি প্রাচীন 'হাতির পুল' নামে একটি জীর্ণ রাস্তা সহ প্রাচীন পুলের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। জানা যায়, এককালে এ পুলের উপর দিয়ে হাতি ঘোড়া পারাপার হতো বলে এটি 'হাতির পুল' নামে পরিচিত ছিল। আজ মূল মন্দিরসহ এই হাতিরপুল সবই জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় কালের চক্রে ভগ্নদশায় শুধু প্রাচীন স্মৃতি কীর্তির সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির থেকে একটু দূরে রয়েছে দোলমঞ্চ, কৃত্রিম পাহাড় ও পুষ্পোদ্যান। গোপীনাথের মাসীর বাড়ী, পিসির বাড়ী বলে খ্যাত দুটি বাড়ী আজও দুটি সুউচ্চ মাটির পাহাড় ন্যায় ঢিবি রয়েছে।

এত বিশাল আয়তনের আখড়া এ জেলায় দ্বিতীয়টি আর নেই। বর্তমানে এ মন্দিরে নিম কাঠের তৈরী ৩টি মূর্তিসহ বেশ কটি পিতলের মূর্তি রয়েছে, জানা যায়- মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আদি কষ্টি পাথরের তৈরী বিরাট আকারের মূর্তি সুভদ্রা, বলারাম ও রাধিকার বিগ্রহগুলি চুরি অথবা পাচার হয়ে গেছে। বর্তমানে এগুলি কাঠের দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দির এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামে অনেক 'লাখেরাজ' জমি ছিল। এই লাখেরাজ বিস্তর জমি জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বীর ঈসা খাঁ দান করেছিলেন। তবে জনশ্রুতি রয়েছে- শ্রী চৈতন্যদেবের সম সাময়িককালে তারই এক অন্যতম ভক্ত শিষ্য ভারতের উড়িষ্যার পুরী নিবাসী শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব স্বপ্নযোগে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে আচমিতার এই গহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হন। এখানে এসে তিনি বিগ্রহের পূজার জন্য ভোগের ব্যবস্থা করেন। ঠিক ঐ সময়ে পাশ দিয়ে দেওয়ান ঈসা খাঁ হয়তো জঙ্গলবাড়ী অথবা এগারসিন্দুর অথবা এগারসিন্দুর যাওয়ার পথে জগন্নাথ সন্ন্যাসীর ভোগের ঘ্রাণে আকৃষ্ট ও অস্থির হয়ে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের সাথে দর্শন লাভ করে। ঘটনাক্রমে সন্ন্যাসী জগন্নাথ গোঁসাই এর কাছ থেকে সবকিছু জেনে দেওয়ান ঈসা খাঁ নিজ ব্যয়ে বিগ্রহসহ মন্দির ও বিস্তর 'লাখেরাজ' সম্পত্তি দান করেন। অন্যদিকে চারিপাড়া তান্ত্রিক সামন্তরাজ নবরঙ্গ রায়ের সঙ্গে বীর ঈসা খাঁর প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সামন্তরাজ নবরঙ্গ রায় পরাজিত হলে চারিপাড়াসহ এলাকার সমস্ত ভূমি বীর ঈসা খাঁ অধিকারে আসে। আজো আচমিতার চারিপাড়া গ্রামে সামন্তরাজ নবরঙ্গ রায়ের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও বিশাল আয়তনের কুটামন দিঘী দেশ-বিদেশের বহু পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এককালে এ দেবালয়টি ছিল

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় তীর্থস্থান। ভারতের উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পরিচিতিছিল আচমিতা ভোগ বেতাল স্থান। আজও এখানে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে-'পুরীর জগন্নাথ আর বঙ্গের গোপীনাথ'।

পাঁচশত বছর পূর্বে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা কারুকাজ খচিত ১৬ টি চাকা বিশিষ্ট একটি প্রাচীন রথ তৈরী করা হয়েছিল। জানা যায় উচ্চতার দিক থেকে এ রথটি এ জেলার সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রথযাত্রা হিসেবে পরিগণিত হতো। রথের সন্মুখে ছিল কাঠের তৈরী দুটি সারথী এবং এদের জন্য দুটি কাঠের তৈরী ঘোড়া। রথটি মোট তিন ধাপে নির্মিত। প্রতিটি ধাপে কারুকার্যের বারান্দা। সর্বোচ্চ ছিল পিতলের তৈরী দোলনা।

রথ উপলক্ষে গোপীনাথ, বলরাম ও রাধিকার মূর্তি স্থাপন করা হয়। এককালে স্থানীয় জমিদার, তালুকদার তাদের হাতি-ঘোড়া দিয়ে রথ টেনে মাসি-পিসির বাড়িতে আনা নেওয়া হতো। গোপীনাথ জিওর হতে ১ কি.মি. গুন্ডিচা বাড়ী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ রথযাত্রার ইতিহাসে ভোগ বেতাল আজও বিখ্যাত। ১৮৯৭ খ্রি. শ্রীবেদ্র ভূমিকম্পে মূল মন্দিরটির বারান্দাসহ বেশকয়েকটি মন্দিরসহ মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালে পূর্বাংশে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করে মূল মূর্তিগুলি সেখানে স্থাপন করা হয়। মন্দিরের কাঠের দরজাগুলি প্রাচীন আমলের তৈরী। বিভিন্ন সময়ে বর্তমান রথটি সংস্কার করার পর বর্তমানে এটি ৯ চাকা বিশিষ্ট রথ হিসেবে পরিচিত।

প্রতিবছর গোপীনাথ রথযোগে তার গুচিন্ডা নামক বাড়ী গমন করেন। সপ্তাহকাল পরে নিজ বাড়িতে অর্থাৎ মন্দিরে ফিরে আসেন। পথের মধ্যে গোপীনাথ মাসীর বাড়ি এবং পিসির বাড়ী অবস্থান করেন। রথযাত্রা মেলা উপলক্ষে আচমিতা ভোগবেতাল গোপীনাথ জিওর মন্দির সংলগ্ন বিস্তর এলাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এ মেলার ঐতিহ্য হয়ে উঠে লক্ষ মানুষের মিলনমেলা। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে বিভিন্ন প্রজাতির পাখ-পাখালির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতারা পাখি সংগ্রহ করতে এ মেলায় ছুটে আসেন। এ ছাড়াও মাঘ মাসের প্রথম দিক থেকে ৫৬ প্রহরব্যাপী অর্থাৎ ৭ মাঘ পর্যন্ত রাত দিন একনাগাড়ে একনাম বা হরিনাম সংকীর্তনে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ নারী-পুরুষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

শত শত বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি সেবায়তের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বিগত ১৯৮৩ সালে মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি দ্বারা বর্তমানে মন্দির বা আখড়ার আয় ব্যয়সহ সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কমিটির সভাপতি কটিয়াদী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। সাধারণ সম্পাদক বাবু দিলীপ কুমার সাহা, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবু বেণী মাধব ঘোষ, চিত্তরঞ্জন বনিক ও মধু বণিকসহ কমিটির অন্যান্য নিবেদিত প্রাণ সদস্যগণের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রাচীন এ দেবালয়টি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়ে এটি একটি আনন্দধাম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

শোলাকিয়া ঈদগাহ

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার শোলাকিয়া নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ঈদের জামাতে এখানে প্রায় ৩ লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। ঈদগাহটি নরসুন্দা নদীর তীরে প্রায় ৭ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এখানে ২৫০টি কাতারে প্রায় ১৫০,০০০ মুসুল্লী একসাথে নামাজ পড়ে থাকেন। প্রায় সমসংখ্যক মুসুল্লী পার্শ্ববর্তী মাঠ, রাস্তা এবং নিকটবর্তী এলাকায় দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজে অংশ নেন।

অল্পকিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দুই তলামিম্বরের ভবনটিতে নামাজ পড়েন, যেখানে প্রায় ৫০০ লোকের স্থান সংকুলান হয়। ঈদুল ফিতর ছাড়াও ঈদুল আজহার নামাজেও অনুরূপ বিশাল জনসমাগম হয়ে থাকে।ইসলামের ঐশী বাণী প্রচারের জন্য সুদূর ইয়েমেন থেকে আগত শোলাকিয়া "সাহেব বাড়ীর" পূর্ব পুরুষ শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ তাঁর নিজস্ব তালুকে নরসুন্দা নদীর তীরে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ৭ একর জমির ওপর "শোলাকিয়া ঈদগাহ" প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁর ইমামতিতে প্রথম ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কিংবদন্তী মতে, শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ ঈদের জামাতের মোনাজাতে ভবিষ্যতে মাঠে মুসল্লীদের প্রাচুর্যতা প্রকাশে "সোয়া লাখ" কথাটি ব্যবহার করেন। অন্য একটি মতে, সেই দিনের সেই জামাতে ১,২৫,০০০ (অর্থাৎ সোয়া লাখ) লোক জমায়েত হয় এবং এর ফলে "শোলাকিয়া" নামটি চালু হয়ে যায় (সোয়া লাখ-এর অপভ্রংশ সোয়ালাক যা থেকে শোলাকিয়া)। পরবর্তীতে ১৯৫০ সনে স্থানীয় দেওয়ান মান্নান দাদ খাঁ (যিনি ঈসা খাঁর বংশধর ছিলেন), ঈদগাহের জন্য ৪.৩৫ একর জমি দান করেন। এই মাঠে ২৬৫টি কাতার আছে এবং প্রতিটি কাতারে ৫০০ শত মুসল্লী নামাজের জন্য দাঁড়াতে পারেন।

অধ্যাপক মুফতি আবুল খায়ের মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, ১৯৭৫ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ২৮ বছর ধরে এই নামাজগুলো পরিচালনা করেন। তারপর তার ছেলে মুফতি আবুল খায়ের মোঃ শফিউল্লাহ ২০০৪ সাল থেকে কিছুদিন ঈদের নামাজ পরিচালনা করছেন। বর্তমানে শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতের ইমাম মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ। জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ঈদগাহের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি আছে।

কবি চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির

ষোড়শ শতকের মনসা মঙ্গলের বিখ্যাত কবি দ্বিজবংশীদাসের কন্যা ও বঙ্গের আদি মহিলা কবিরূপে খ্যাত চন্দ্রাবতীর বহু কাহিনী সমৃদ্ধ এ মন্দিরটি খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। চন্দ্রাবতী আনুমানিক ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পিতা ও কন্যা একত্রে মনসা দেবীর ভাসান ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন।কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মাইজখাপন ইউনিয়নের কাচারীপাড়া গ্রামে ফুলেশ্বরী নদীর তীরে কবি চন্দ্রাবতীর সুবিখ্যাত শিবমন্দিরটির অবস্থান।

দিল্লীর আখড়া

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে প্রতিষ্ঠিত মুঘল স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন সম্বলিত দিল্লীর আখড়া মিঠামইন উপজেলায় অবস্থিত। রামকৃষ্ণ গোঁসাইয়ের মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই আখড়াটিতে স্থাপিত প্রাচীন দেয়াল ও অট্টালিকা আজও দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা হিসেবে পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

পাগলা মসজিদ

আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত পাগলা মসজিদটি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থাপনা হিসেবে খ্যাত। জনশ্রুতি আছে যে, পাগলবেশী এক আধ্যাত্মিক পুরুষ খরস্রোতা নরসুন্দা নদীর মধ্যস্থলে মাদুর পেতে ভেসে এসে বর্তমান মসজিদের কাছে স্থিতু হন এবং তাঁকে ঘিরে আশেপাশে অনেক ভক্তকূল সমবেত হন। উক্ত পাগলের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির পাশে পরবর্তীতে এই মসজিদটি গড়ে উঠে তাই কালক্রমে এটি পাগলা মসজিদ নামে পরিচিত হয়। মসজিদটি শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীর কাছেই নয়, সকল ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। অনেকের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, কেহ সহি নিয়তে এ মসজিদে দান খয়রাত করলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এটি কিশোরগঞ্জ শহরের হারুয়া নামক এলাকায় অবস্থিত।

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু

দৃষ্টিকাড়া নান্দনিক সৌন্দর্য এবং আধুনিক স্থাপত্যকলার কারণে সেতুটি এ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৯.৬০ মিটার প্রস্থের এই সেতুটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতীক। মূল সেতু উভয় দিকে সংযোগ সড়ক, অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড টোল প্লাজা, সেতুর নীচে উভয় দিকে সংযোগ সড়ক, সেতু সংলগ্ন সুরম্য বাংলোগুলো পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সেতুর উপর দাঁড়িয়ে প্রমত্তা মেঘনার অপার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এই সেতু পাশেই রয়েছে ১৯৩৭ সালে নির্মিত ঐতিহাসিক ৬ষ্ঠ জর্জ রেলসেতু ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভৈরব ও আশুগঞ্জের মধ্যে মেঘনা নদীর উপর স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য মৈত্রী সেতু।

এগারসিন্দুর দুর্গ

১১টি নদীর মোহনায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উঁচু শক্ত এঁটেল লাল মাটির এলাকা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসবাসের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় গঞ্জের হাট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গঞ্জের হাট ১১টি নদীর সংগমস্থলে ছিল বিধায় তখনকার জ্ঞানী লোকেরা ১১টি নদীকে সিন্দু নদ আখ্যায়িত করে গঞ্জের হাট থেকে স্থানটির নামকরণ করা হয়

এগারসিন্দুর। এটি ইতিহাস সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তবে এগারসিন্দুর দুর্গ-কে নির্মাণ করেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেহ বলেন রাজা আজাহাবা আবার কারো মতে বেবুদ রাজা এবং কারো মতে রাজা গৌর গোবিন্দ। সুলতানী আমলের পরই এগারসিন্দুর এলাকাটি কোচ হাজংদের অধিকারে চলে যায়। বাংলার বার ভূঁইয়ার প্রধান ঈসা খাঁ কোচ হাজং রাজাদের পরাজিত করে এগারসিন্দুর দুর্গটি দখল করেন। এ দুর্গ থেকেই পরবর্তীতে মুঘল সেনাপতি রাজা দুর্জন সিংহ ও পরে রাজা মানসিংহকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। তখন থেকেই এগারসিন্দুর দুর্গটি ঈসা খাঁর দুর্গ নামে খ্যাত। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১১ কি.মি. দূরে মঠখোলা-মির্জাপুর-পাকুন্দিয়া সড়কের পাশে এটি অবস্থিত।

সাদী মসজিদ

পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর দুর্গ এলাকায় এ মসজিদটির অবস্থান। এ মসজিদটি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ এ মসজিদটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরী। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতি মসজিদ। প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট। চারপাশে চারটি বুরুজ আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ দ্বার রয়েছে। প্রবেশ পথগুলোর চারদিকে পোড়ামাটির চিত্র ফলকের কাজ রয়েছে। ভিতরে ৩টি অনিন্দ্য সুন্দর মেহরাব রয়েছে যা টেরাকোটার দ্বারা অলংকৃত। ১০৬২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে শাহজাহান বাদশা গাজীর রাজত্বকালে শেখ নীরুরপুত্র সাদীর উদ্যোগে এ মসজিদটি নির্মিত হয় বিধায় মসজিদটির নামকরণ করা হয় সাদী মসজিদ। এ মসজিদে একটি শিলালিপিতে আরবী ও পার্শী ভাষায় যা লিখা আছে তার বঙ্গানুবাদ হলো:

> মহান আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই। মোহাম্মদ আল্লাহর বাণীই জগতে প্রচার করেছেন। যিনি মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ঈমান রাখেন তিনি একটি করে মসজিদ নির্মাণ করেন। যিনি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে ষাটটি মসজিদ প্রস্তুত রাখেন। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নীরুর পুত্র সাদীর তত্ত্বাবধানে শাহজাহান বাদশা গাজীর রাজত্বের সময় এই মসজিদ নির্মিত হল। হিজরী অব্দ ১০৬২, রবিউল আওয়াল।

শাহ মাহমুদের মসজিদ ও বালাখানা

পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুরে অবস্থিত শাহ মাহমুদ মসজিদ ও অপূর্ব সুন্দর বালাখানা মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ডঃ দানীর মতে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। ১১৪৫ বঙ্গাব্দে

২৩ মাঘ তারিখে মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য জঙ্গলবাড়ী হতে দেয়া ওয়াক্ফ জমি। বর্গাকৃতির এ মসজিদটির প্রত্যেক বাহু ৩২ ফুট। চার কোণায় ৪টি বুরুজ রয়েছে। একটি বিশাল গম্বুজ এবং দু'পাশে দুটি সরু মিনার রয়েছে। ভিতরে পশ্চিমের দেয়ালে ৩টি মেহরাব আছে। শাহ মাহমুদ মসজিদের প্রবেশদ্বারটি ঠিক দো'চালা ঘরের আকৃতি যা বালাখানা নামে পরিচিত। ঘরটির আয়তন ২৫ ফুট X১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। এ বালাখানার মাঝখান দিয়ে প্রবেশ করে মূল ইমারতে যেতে হয়। শাহ্ মাহমুদ এ মসজিদ ও বালাখানাটি নির্মাণ করেছিলেন বলে মসজিদটির নামকরণ করা হয় "শাহ্ মাহমুদ মসজিদ"।

সালংকা জামে মসজিদ

পাকুন্দিয়া উপজেলার নারান্দি ইউনিয়নের সালংকা গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত। সুরকী জমানো ও বড় বড় পাথরের তৈরী এ মসজিদটি আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির চূড়ায় ৪টি পিতলের কলসী, দুটি দরজা ও প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। সামনের প্রবেশদ্বারে ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ একটি সুন্দর শিলালিপি রয়েছে। প্রাচীন বাংলা লিখন পদ্ধতিতে চূড়ায় বড় কলসীর গায়ে হরে কৃষ্ণ ও হরি লেখা ছিল। কেউ বলেন প্রাথমিক অবস্থায় হিন্দু দেবালয় ছিল এবং পরে ইসলাম বিজেতা কেউ এসে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। প্রাচীন সুবৃহৎ এ মসজিদটি ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় আজো কালের প্রহর গুনছে। এ মসজিদের গায়ে আরবী ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে যা উৎকীর্ণ আছে তার বঙ্গানুবাদ-

> পরম করুণাময় ও কৃপানিধান আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আমার পাঁচজন আছেন, আমি তাদের নামে উলাউঠার (অবাদেবী) গরম নিভাইব। সেই পাঁচজন এই- মোস্তফা, মুরতজা, অবনা, হুমা এবং ফাতেমা...। (শিলালিপির শেষ ছত্র দু'টি ফারসীতে লিখিত এবং অস্পষ্ট)।

হর্ষি জামে মসজিদ

পাকুন্দিয়া উপজেলার সুখিয়া ইউনিয়নের হর্ষি বাজারে এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি অবস্থিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১০৮০ হিজরী, ১৬৬৯ খ্রিঃ এটি নির্মিত হয়। ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার (১৯৭৮) সহ বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত মসজিদটিকে "মসজিদ পাড়া মসজিদ" নামে পরিচিত করা হলেও আসলে তা 'হর্ষি জামে মসজিদ'। বর্গাকৃতির এ মসজিদটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ২৯ ফুট। ৪ কোণায় অষ্ট কোণাকৃতির বুরুজ আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। কেবলা প্রাচীরে ৩টি মেহরাব রয়েছে। প্যারাপেট এর উপরিভাগ মারলন দ্বারা অলংকৃত। অপূর্ব এ মসজিদটিতে মুঘল স্থাপত্যশৈলী চোখে ভেসে উঠে।

নিরগিন শাহ্‌র মাজার

নিরগিন শাহ্ আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তিনি ঈসা খাঁর রাজত্বকালে একজন বড় সাধক ছিলেন। ধ্যানে বিঘ্ন এবং লোকপীড়নের ভয়ে তিনি পাগলের বেশে থাকতেন। তিনি এগারসিন্দুরের একটি জঙ্গলে ছোট্ট কুঠিরে বাস করতেন। তিনি প্রায়ই উলংগ হয়ে হাট-বাজারে ঘুরে বেড়াতেন ও বাজার থেকে ফেলে দেয়া পঁচা মাছ, মাংস, নাড়ীভুড়ি ইত্যাদি কুড়িয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যেতেন এবং অলৌকিকভাবে পাক করতেন যার খুশবুতে জঙ্গল পরিপূর্ণ হয়ে যেত। বর্তমানে এগারসিন্দুরের পূর্ব প্রান্তে এই সাধকের মাজার রয়েছে। মাজারটির প্রতি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই সমান ভক্তি দেখা যায়।

শাহ্ গরীবুল্লার মাজার

জানা যায় যে, শাহ্ গরীবুল্লাহ ছিলেন নিরগিন শাহ্‌র কনিষ্ঠভ্রাতা। এগারসিন্দুরে শাহ্ গরীবুল্লাহসহ ১১ জন আউলিয়ার জনশ্রুতি রয়েছে। তন্মধ্যে শাহ্ গরীবুল্লাহ প্রসিদ্ধলাভ করেছিলেন। শোনা যায়, বহু সংখ্যক উট নিয়ে ব্যবসা করতে এগারসিন্দুর এলাকায় এসে তিনি সংসার বিরাগী হয়ে যান এবং আধ্যাত্মিকসাধনায় নিমগ্ন হন। এগারসিন্দুর দুর্গস্তম্ভটির ৩০ হাত উপরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। উক্ত টিলার উপরে এই সাধকের মাজার বিদ্যমান রয়েছে।

বেবুদ রাজার দীঘি

এগারসিন্দুরে বেবুদনামে একজন হাজং রাজা বাস করতেন। একবার প্রচন্ড খরা দেখা দেয়ায় বেবুদ রাজা প্রজাদের হিতার্থে পঞ্চাশ একর জমি বিস্তৃত একটি দীঘি কাটলেন। কিন্তু পানির নাম গন্ধ নেই। এরই মধ্যে রাজা স্বপ্নে দেখেন যে তার রানি যদি দীঘিতে নামে তবে পানি উঠবে। উক্ত স্বপ্নটি রাজা রানিকে জানালে প্রজাদের মুখের পানে চেয়ে রানি দীঘিতে নামতে রাজী হলেন তাতে রাজাও খুশী হলেন এবং পরদিন রানি এক বাটি কাঁচা দুধ, পান সুপারী ও সিঁদুর নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দীঘিতে নামলেন; সাথে সাথেই দীঘির চারপাশ থেকে স্বচ্ছ জল এসে দীঘি ভরে গেল কিন্তু রানি আর দীঘি থেকে উঠতে পারলেন না। চোখের পলকে রানির কেশ গুচ্ছ বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। রাজা রানির জন্য পাগল হয়ে গেলেন। দীঘিটি গভীর থাকায় পানি খুবই স্বচ্ছ দেখায়। বেবুদ রাজা দীঘিটি খনন করেন বিধায় তার নামানুসারে এ দীঘিটি 'বেবুদ রাজার দীঘি' নামে পরিচিত। এ দীঘির পানিতে গাছের পাতা কিংবা অন্য কোন কিছু পড়ে থাকলে তা পরদিন সকালে পাড়ে এসে জমা হয়। লোকমুখে শোনা যায় কোন অনুষ্ঠানের জন্য দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে থালা, বাসন ও অন্যান্য তৈজসপত্র চাইলে পরদিন দীঘির পাড়ে পাওয়া যেত। তবে শর্ত ছিল যা যা নেয়া হত তা সঠিকভাবে ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু একদিন কেউএ শর্ত ভঙ্গ করায় এর পর থেকে তৈজসপত্র আর পাওয়া যায় না।

বাহাদিয়া পাঁচ পীরের মাজার

বাহাদিয়া বাজারের ১০০ গজ উত্তর দিকে মির্জাপুর-মঠখোলা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীরে বিশাল আকৃতির বহু পুরাতন বটবৃক্ষের নীচে পাঁচ পীরের মাজার অবস্থিত। কথিত আছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এখানে পাঁচ জন আউলিয়া এসেছিলেন এবং তাঁরা শাশ্বত সত্যের বাণী ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। পাঁচ জন আউলিয়া এখানে একত্রে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মত্ত ছিলেন। পরবর্তীতে এখানকার মাজারের নামকরণ হয় পাঁচ পীরের মাজার।

মলং শাহর মাজার

পাকুন্দিয়া বাজারের দক্ষিণাংশে পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর রোডের পশ্চিম পার্শ্বে মলং শাহ নামে একজন আউলিয়া দরবেশের মাজার অবস্থিত। মধ্যযুগে এ এলাকায় তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। কেউ কেউ বলেন তিনি এগারসিন্দুরে আগত ১১ জন আউলিয়ার অন্যতম একজন ছিলেন। বর্তমান মাজার স্থলে তিনি অবস্থান করতেন। এখানে অবস্থান করে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। কারও কারও মতে তিনি মধ্যযুগে পাকুন্দিয়া এলাকায় এসেছিলেন এবং তার নাম অনুসারেই এলাকার নাম হয়েছে পাকুন্দিয়া। মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার প্রতি বছর এখানে ওরস বসে।

মঠখোলা কালিমন্দির

পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর ইউনিয়নে মঠখোলা নামক স্থানে এ মন্দিরটি অবস্থিত। শাস্ত্র ধর্মের বিখ্যাত পাঠ হিসেবে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি কালি পীঠ তৈরী হয়েছিল। পীঠটি স্থাপনের পর সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে চারিপাড়ার রাজা নবরঙ্গ রায়ের অধঃস্তন ও শাস্ত্র ধর্মে দীক্ষিত জনৈক ভূস্বামী বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের চূড়াটি বেশ উঁচু। মন্দিরের এক অংশ গৌড়ীয় রীতিতে দোচালা প্যার্টানে তৈরী। এ মন্দিরটি মিশ্র স্থাপত্য শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মঠখোলা কালিমন্দিরে প্রতি বছর শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ মন্দিরের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদে প্রতি বছর চৈত্র/বৈশাখ মাসে অষ্টমীস্নানহয়। অষ্টমীস্নান উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে পূণ্যার্থী হিন্দুভক্তগণ এখানে এসে মন্দির দর্শন করেন।

পরিশিষ্ট "গ"

সংবাদপত্র ও সাময়িকী

কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর তালিকাঃ

১। *দৈনিক আজকের দেশ*, সম্পাদক-জনাব কাজী শাহীন খাঁন, প্রকাশকাল- ২৩/৬/১৯৯৪ খ্রি.।

২। *দৈনিক আজকের সারাদিন*, সম্পাদক-কামরুল আনাম, প্রকাশকাল- ১০/৭/২০০৪ খ্রি.।

৩। *দৈনিক শতাব্দীর কণ্ঠ*, সম্পাদক-আহমেদ উল্লাহ, প্রকাশকাল- ১৩/২/২০০১ খ্রি.।

৪। *দৈনিক কিশোরগঞ্জ*, সম্পাদক-খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল, প্রকাশকাল-২৫/৫/২০০৬ খ্রি.।

৫। *দৈনিক সাতকাহন*, সম্পাদক- জনাব আবু তাহের মোহাম্মদ নিজাম(এ.টি.এম নিজাম), প্রকাশকাল- ২২/৭/২০১০খ্রি.।

৬। *দৈনিক আমার বাংলাদেশ*, সম্পাদক- জনাব সুলতান রায়হান ভূঞা রিপন, প্রকাশকাল- ১৫/২/২০১১খ্রি.।

৭। *দৈনিক গৃহকোণ*, সম্পাদক- জনাব এম.এ লতিফ, প্রকাশকাল- ২৪/১১/২০১১খ্রি.।

৮। *দৈনিক একুশের কাগজ*, সম্পাদক- জনাব মোঃ কামরুজ্জামান খন্দকার, প্রকাশকাল- ৯/৭/১৯৯১খ্রি.।

৯। *দৈনিক দি কিশোরগঞ্জ টাইমস*, সম্পাদক- এ.বি.এম লুৎফর রাশিদ রানা এডভোকেট, প্রকাশকাল- ১৩/৮/২০১৩ খ্রি.।

১০। *সাপ্তাহিক আলোর মেলা*, সম্পাদক- জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকাশকাল- ৬/৯/১৯৯২খ্রি.।

১১। *সাপ্তাহিক দিনের গান*, সম্পাদক- জনাব সোহেল সাশ্রু, প্রকাশকাল- ৫/৭/২০০৬ খ্রি.।

১২। *সাপ্তাহিক কুলিয়ারচর*, সম্পাদক- জনাব মোঃ শরীফুল আলম, প্রকাশকাল- ১৫/৭/২০০৪ খ্রি.।

১৩। *সাপ্তাহিক জনপথ সংবাদ*, সম্পাদক- জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রকাশকাল- ২২/২/২০০৬ খ্রি.।

১৪। *সাপ্তাহিক অবলম্বন*, সম্পাদক- জনাব তাজুল ইসলাম তাজ ভৈরবী, প্রকাশকাল- ২৬/৮/২০০৭ খ্রি.।

১৫। *সাপ্তাহিক হোসেনপুর বার্তা*, সম্পাদক- জনাব প্রদীপ কুমার সরকার, প্রকাশকাল- ৩০/৬/২০০৮ খ্রি.।

১৬। *সাপ্তাহিক কিশোরগঞ্জ বার্তা*, সম্পাদক- জনাব কাজী শাহীন খাঁন, প্রকাশকাল- ৩/৫/১৯৯১ খ্রি.।

১৭। *সাপ্তাহিক কিশোরগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাদক- জনাব কাজী শাহীন খাঁন, প্রকাশকাল- ২/৪/১৯৯১ খ্রি.।

১৮। *সাপ্তাহিক নরসুন্দার পাড়ের কথা*, সম্পাদক- জনাব সুলতান রায়হান ভূঞা রিপন, প্রকাশকাল- ১৬/৩/২০০৯ খ্রি.।

১৯। *পাক্ষিক বাতি*, সম্পাদক- জনাব শরীফ আহমদ সাদী, প্রকাশকাল- ১৮/৫/২০১০ খ্রি.।

২০। *পাক্ষিক ভৈরব*, সম্পাদক- জনাব মো:কামরুজ্জামান কাজল, প্রকাশকাল- ৭/৩/১৯৯৩ খ্রি.।

২১। *মাসিক বাজিতপুর সমাচার*, সম্পাদক- জনাব মোঃ বদরুল আলম, প্রকাশকাল- ১৭/৭/২০০৬ খ্রি.।

২২। *মাসিক আল-হাসান*, সম্পাদক- জনাব মোঃ মতিউল হাসান, প্রকাশকাল- ২৭/৫/১৯৯২খ্রি.।

২৩। *মাসিক ধমনী*, সম্পাদক- জনাব আবদুল মান্নান স্বপন, প্রকাশকাল- ১/৭/২০০৮ খ্রি.।

২৪। *ত্রৈমাসিক অংকুর*, সম্পাদক- জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম দুলাল, প্রকাশকাল- ৩১/৭/১৯৯৫ খ্রি.।

২৫। *ত্রৈমাসিক ন্যায়দন্ড*, সম্পাদক-জনাব মোহাম্মদ শাহ্ আলম আশিক (এস.আলম), প্রকাশকাল-২/১২/২০০৩ খ্রি.।

পরিশিষ্ট “ঘ”

আলোকচিত্রে কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক স্থাপনা ও জনজীবন

ছবি: জঙ্গলবাড়ী দুর্গ

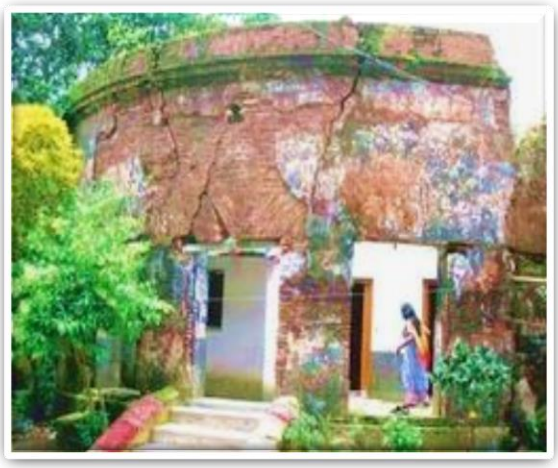

ছবি: জঙ্গলবাড়ী দুর্গ

ছবি: মসনদে আলা ইসা খাঁ'র বাড়ি

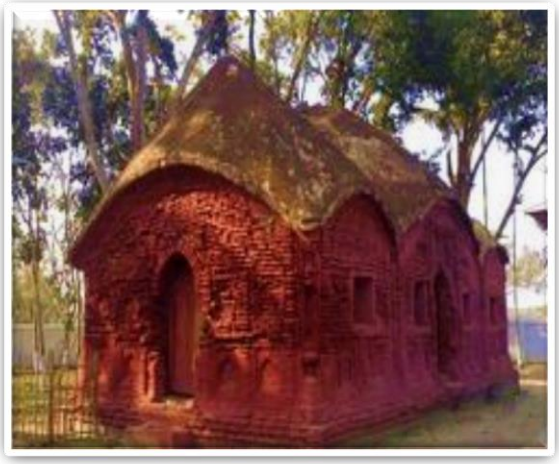

ছবি: গোপীনাথ জিউর মন্দির

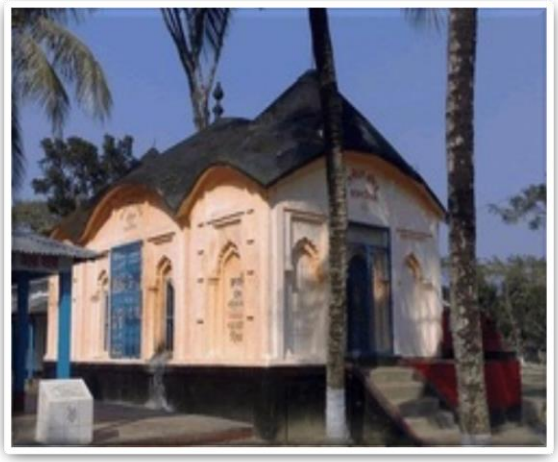

ছবি: গোপীনাথ জিউর মন্দির

ছবি: কবি চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির

ছবিঃ দিল্লীর আখড়া

ছবিঃ পাগলা মসজিদ

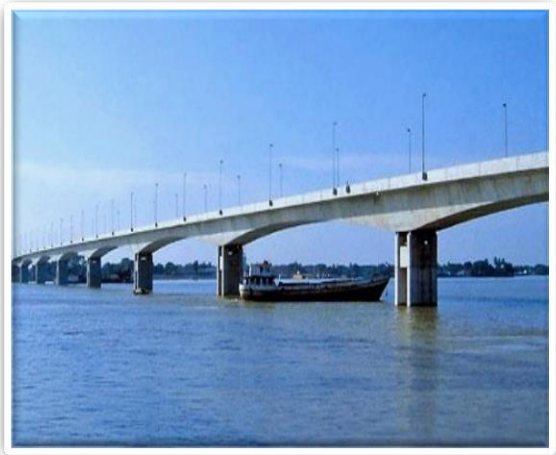

ছবিঃ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু

ছবিঃ কুতুব মসজিদ, অষ্টগ্রাম

ছবিঃ শাহ মাহমুদ মসজিদ

ছবিঃ গুড়ই মসজিদ

ছবিঃ ভাগলপুর দেওয়ানবাড়ী মসজিদ

ছবিঃ নীলকুঠি

ছবিঃ শোলাকিয়া ঈদগাহ

ছবিঃ নরসুন্ধা নদী

ছবিঃসত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক বাড়ি

ছবিঃ গাংগাটিয়ার জমিদার বাড়ি

ছবিঃ হাওর অঞ্চল

ছবিঃ হাওর অঞ্চল

ছবিঃ হাওর অঞ্চল

ছবিঃ হাওর অঞ্চল

ছবিঃ হাওর অঞ্চল

ছবিঃ হাওর অঞ্চল

ছবিঃ সাদী মসজিদ, পাকুন্দিয়া

ছবিঃ সাহেববাড়ী জামে মসজিদ

ছবিঃ ফসলের মাঠে কৃষকের ধান কাটা

ছবিঃ কুড়িখাই মেলা

ছবিঃ সরারচরের রাম বাবুর মঠ

ছবিঃ রথের মেলা

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থঃ

- করিম,আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ ।
- ----------, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ ।
- ----------, *বাংলার ইতিহাস : ১২০০-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ*, ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯ ।
- ----------, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ ।
- অতুল সুর, ড., *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, ১৯৭৬ ।
- ----------, *আঠার শতকে বাঙলা ও বাঙালী*, কলকাতা : সাহিত্যলোক, বিডন স্ট্রীট, ১৯৮৫ ।
- আবদুর রহিম, ড. মুহম্মদ ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬ ।
- চৌধুরী, আব্দুল মমিন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০২ ।
- আল-মাসুম, মোঃ আব্দুল্লাহ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮ ।
- আব্দুল্লাহ, ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩ইং ।
- আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ ।
- চৌধুরী, আবদুল মমিন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০২ইং ।
- আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৯২ ।
- আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০০ ।
- আজহারুল ইসলাম, এ.কে.এম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসাশিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম (মক্কা ঘোষণার আলোকে মূল্যায়ন)*, প্রকাশক দি-ইসলামিক একাডেমি, ২০৫ গিলবার্ট রোড, ক্যামব্রীজ, যুক্তরাজ্য ।
- আজাহার আলী, মোহাম্মদ, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬ ।

- আনিসুজ্জামান, মোঃ, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯ ।
- ইনাম-উল-হক, ড. মুহাম্মদ, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* ১৭০৭-১৯৪৭, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯ ।
- আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনঃমুদ্রণ, ১৯৯৭ ।
- মুস্তফিজুর রহমান, খন্দকার, *শিক্ষা দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮০ ।
- ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া, *বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি১৯৯৫ ।
- আলম, তাহমিনা, *বাংলার সমিয়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ*, ঢাকা : একাডেমি, ১৯৯৮ইং ।
- দেশাই, এ.আর, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, কলকাতা : কে.পি.বাগচী এন্ড কোং, ১৯৮৭ ।
- ভট্টাচার্য, নৃপেন, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলিকাতা :মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ ।
- রায়, নীহার রঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কলিকাতা : দেজ পাবলিশিং ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।
- ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : প্রাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১ ।
- ----------, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১৮৪০-১৯০৫, ১ম খণ্ড*, কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২ ।
- ----------, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪ ।
- মাহবুবর রহমান, ড. মো.,*বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০৯ ।
- ----------, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯০৫-৪৭, ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮ ।
- মামুন, মুনতাসীর, *উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভা-সমিতি*, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৪ ।
- ----------, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সংবাদ সাময়িক পত্র (১৮৫৭-১৯০৫)*, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬ ।
- ----------, *উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ-সময়িকপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ ।
- আনসারী, মুসা, *ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯২ ।
- সরকার, যদুনাথ, *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলিকাতা : এন.সি.পাবলিকেশন, ১৯৮৫ ।

- রায়, যতীন্দ্রমোহন, *ঢাকার ইতিহাস* ১ম ও ২য় খণ্ড, ঢাকা : গতিধারা, ২০০৭ ।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২য় সংস্করণ মাঘ-১৩৮১ ।
- বন্দ্যোপধ্যায়, রাখালদাস, *বাঙলার ইতিহাস,* ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৮৮৮ ।
- রহিম, এম.এ, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৮ ।
- ----------, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৫ ।
- রহিম, ড. এম.এ ও মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুদিত), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬),* ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ইং ।
- খান, শামসুজ্জামান (সম্পা), *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৬ ।
- রহমান, শফিকুর, *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯ ।
- সিরাজ মান্নান, মোহাম্মদ, *বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ ।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *ভারত সংস্কৃতি*, কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০০ বাংলা ।
- ধর, সুব্রত শংকর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ ।
- সুলতান আহম্মদ, ড., *ইতিহাস শব্দ সংহিতা*, ঢাকা : একাডেমিক কনসালটেন্ট, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯ ।
- রায়, সুশীল, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন*, কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী, ২০০১ ।
- সেনগুপ্ত, সুখময়, *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫ ।
- মজুমদার, সুপ্তিকণা, *বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ ।
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ।
- শাহেদ, হোসনে আরা (সম্পা.), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০২ ।

- হান্টার, ডব্লিউ.ডব্লিউ ও গণি ওছমান (অনুদিত), *পল্লী বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯ ।
- হাটকিনস, রবার্ট এম, অনুবাদ-রাহাত খান, *শিক্ষা ও সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫ ।
- হাবিবুল্লাহ, ড. মোঃ, *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০০-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি-২০০৯ ।
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাঃ), *বাংলা পিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩ ।
- রহমান, মতিউর, *আঞ্চলিক ভাষার ঐতিহাসিক অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯২ ।
- আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪; আতোয়ার রহমান, উৎসব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬ ।
- আব্দুল জলিল, মুহম্মদ, *লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫; মোমেন চৌধুরী, *লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭ ।
- বসাক, শীলা, *বাংলার ব্রতপার্বণ*, কলকাতা, ১৯৯৮ ।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকশ্রুতি*, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৯ ।
- আকবর, হারুন, *দেওয়ান আদম খাঁ*, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৮৯ ।
- আলী, মোবাশ্বের, *বাংলাদেশের সন্ধানে*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩ ।
- আহমদ, তোফায়েল, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬ ।
- উল্লাহ, আহমাদ (সম্পাঃ), *পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্য প্রামাণ্য গ্রন্থ*, সুচয়ন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২ ।
- ইলিয়াছ, এস.এম, *সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দিন (রহঃ)*, ঢাকা, ১৯৫৮ ।
- ইসলাম, রফিক-উল, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, বিবিআই, ঢাকা, ১৯৮১ ।
- ওয়াহাব, দরজি আবদুল, *ময়মনসিংহের চরিতাভিধান*, ময়মনসিংহ, ১৯৮১ ।
- করিম, ডক্টর আবদুল, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৭২ বাংলা ।
- কাসেম, আবুল, *বাংলা ভাষার লড়াই: স্বরূপের সন্ধানে*, চট্টগ্রাম, ১৯৯১ ।
- খান, মোহাম্মদ আলী, *কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক বিবরণ*, ঢাকা, ১৯৯০ ।
- চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ (মহারাজ), *জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, কলিকাতা, ১৯৮১ (পুনঃমূদ্রণ) ।
- সিদ্দিকী, ড. আশরাফ (সম্পাদক), *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমি সংগ্রহশালা ।
- রশীদ, আবদুর ও রহমান গাউসুর, *ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, টুম্পা প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০৮ ।

- রফিক খান, প্রিন্স, *কিশোরগঞ্জের লেখক জীবনী*, প্রকাশক-রাজ্জাক-সখিনা কল্যাণ ট্রাস্ট, ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ।
- রফিক খান, প্রিন্স (প্রধান সম্পাঃ), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৪ ।
- সাইদুর, মোহাম্মদ ও আলী খানমোহাম্মদ, *কিশোরগঞ্জ জেলার ইতিহাস* ।
- রফিক খান, প্রিন্স, *কিশোরগঞ্জের লোক ঐতিহ্য*, প্রকাশক-রাজ্জাক-সখিনা কল্যাণ ট্রাস্ট, এপ্রিল ২০০৬ ।
- লতিফ, মু.আ, *স্মৃতির আলোয় কিশোরগঞ্জ*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা- ২০১১ ।
- লতিফ, মু.আ, *কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য*, উজান প্রকাশনী, ঢাকা- ২০১৮ ।
- লতিফ, মু.আ, *কিশোরগঞ্জের অতীত ও সমকাল*, প্রকৃতি প্রকাশনী, ঢাকা- ২০১৪ ।
- লতিফ, মু.আ, *কিশোরগঞ্জের কীর্তিমানেরা*, প্রকৃতি প্রকাশনী, ঢাকা- ২০১৪ ।
- লতিফ, মু.আ, *কিশোরগঞ্জের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রকৃতি প্রকাশনী, ঢাকা- ২০১৫ ।
- লতিফ, মু.আ, *কিশোরগঞ্জের নান্দনিক ক্রীড়াঙ্গন*, ঢাকা- ২০১৩ ।
- লতিফ, মু.আ, *কিশোরগঞ্জের রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা- ২০১৭ ।
- কল্পনা, রহিমা আখতার, *কিশোরগঞ্জের পালাগান ও সমাজ বাস্তবতা*, ভাষামুখ প্রকাশনী, ঢাকা- ২০১২ ।
- কল্পনা, রহিমা আখতার, *কিশোরগঞ্জের পালাগান ও সমাজ বাস্তবতা*, শব্দাবলী প্রকাশনী, ঢাকা- ১৯৯৭ ।
- ইউসুফ, মনির উদ্দীন, *আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৭৮ ।
- ইসলাম, সফিকুল, *কালের অহংকার*, আলপনা প্রকাশনী, ঢাকা- মে ২০১১ ।
- ইউসুফ, মনির উদ্দীন, *আমার জীবন আমার অভিজ্ঞতা*, কালান্তর প্রকাশনী, ঢাকা- ১৯৯২ ।
- আহমদ, নাহার কামাল, *স্মৃতির অ্যালবাম*, আলপনা প্রকাশনী, ঢাকা- ২০১১ ।
- আজাদ, আবিদ, *জানু বুবাই*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা-২০০২ ।
- রফিক খান, প্রিন্স,*নরসুন্দা পাড়ের ছবি-ছড়া ও কবিতা*, রাজ্জাক-সখিনা কল্যাণ ট্রাস্ট, সেপ্টেম্বর ২০০৭ ।
- রফিক খান, প্রিন্স, *কিশোরগঞ্জ জেলার প্রবাদ-প্রবচন*, বাংলা একাডেমি গ্রন্থ মেলা, ২০০৮ ।
- হাবিবা খাতুন, অধ্যাপক ও হুসনে জাহানশাহনাজ, *ইসা খাঁ: সমকালীন ইতিহাস*, বংশাই প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০০ ।
- সিদ্দিকী, ড. আশরাফ, *লোক সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮ ।

- শরীফ আহমদ, ড., *পুঁথি পরিচিতি*, ঢাকা- ১৯৫৮ ।
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদক), *প্রবাদ-প্রবচন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭ ।
- সিদ্দিকী, ড. আশরাফ, *বাংলাদেশের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি*, সূচীপত্র প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০৫ ।
- চৌধুরী, আবদুল মমিন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, বর্ণায়ন প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০২ ।
- সেন, দীনেশ চন্দ্র,*ময়মনসিংহ গীতিকা*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮ ।
- হোসেন, মোঃ গোলজার, *বাংলাদেশের জেলা পরিচিতি ও সৃষ্টির প্রেক্ষাপট*, আদনান পাবলিকেশন্স, ঢাকা ।
- উজ জামান, হারেছ, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাসঃ কিশোরগঞ্জ জেলা*, তাম্রলিপি প্রকাশনী, ঢাকা ।
- খোকন, লিয়াকত হোসেন, *৬৪ জেলা ভ্রমণ*, অনিন্দ্য প্রকাশনী, ঢাকা ।
- আখন্দ, মোঃ রফিকুল হক, *কিশোরগঞ্জের লোকপ্রথা ও লোকভাষা*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা ।
- জাহান, জাহাঙ্গীর আলম, *কিশোরগইঞ্জা একশো ছড়া*, কিংবদন্তি প্রকাশনী, ঢাকা ।
- খুরশীদ উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ, *পাগলা মসজিদের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ 'জীবনের সোনালী স্মৃতি'*।
- জাহান, জাহাঙ্গীর আলম, *কিশোরগঞ্জ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা ।
- চৌধুরী, শ্যামলী, *একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১ ।
- আহমদ, আবদুল মতিন, *জয়নুল আবেদিন*, পাবলিসিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৮ ।
- আলী খান, মোহাম্মদ (সম্পাঃ), *পাকুন্দিয়া উপজেলার কথা*, পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ, ১৯৮৭ ।
- বর্মন, রেবতী, *"সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ"*, পুনঃমূদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮৭ ।
- আলী খান, মোহাম্মদ (সম্পাঃ), *ভৈরব অতীত ও বর্তমান*, ভৈরব উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ, ১৯৮৭ ।
- সেন, দীনেশচন্দ্র কর্তৃক (সংকলিত), *মৈমনসিংহ গীতিকা*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৯২৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনঃমূদ্রণ, ১৯৭৩ ।
- যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪ ।
- রহমান, আতোয়ার, *উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১ ।
- রহমান, মোহাম্মদ মতিওর, *দেওয়ান ঈসা খাঁ*, ঢাকা, ১৯৫১ ।
- রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা ১৯৬৬ ।

- শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৩ ।
- সরকার, যতীন, *কেদারনাথ মজুমদার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭ ।
- সেন, শ্রীদীনেশচন্দ্র, *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, দ্বিতীয় খন্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, পুনঃমূদ্রণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬ ।
- হকসাজেদুল, হাই হাসনা আরা ও বরনী, *সূতি ফুলেশ্বরীর দেশ তাড়াইল*, ঢাকা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ।
- হক, সৈয়দ মাজহারুল, *বাংলাদেশের নদী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫ ।
- হক, সৈয়দ মাহমুদুল, *জীবন নিয়েজীবনী*, হবিগঞ্জ, ১৯৮৯ ।
- হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, *বাংলাদেশের মসজিদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭ ।
- জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮২ ।

২. প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা, সাময়িকী ও স্মরণিকাঃ

- খান, শামসুজ্জামান, *চন্দ্রকুমার দে অগ্রন্থিত রচনা (২য় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, জুন-১৯৯৪ ।
- নুরুল হুদা, মুহাম্মদ (সম্পাঃ), *লোকসংগীত*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর-২০০৭ ।
- আহমদ, ওয়াকিল (সম্পাদক), *লোক সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর-২০০৭ ।
- খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদক), *বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংগ্রহমালা-২১, পালাগান: ময়মনসিংহ*, বাংলা একাডেমি, জুন- ২০১০ ।
- খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদক), *বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংগ্রহমালা-২২, ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালি*, বাংলা একাডেমি, জুন- ২০১০ ।
- আনোয়ার, আবিদ, *কিশোরগঞ্জ আমার কিশোরগঞ্জ*, দৈনিক মানবজমিন, ঈদসংখ্যা, ২০০৫ ।
- আব্দুল বারী, মোহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ*, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।
- রফিক খান, প্রিন্স, *আলোকিত কিশোরগঞ্জ*, ত্রয়ী সাহিত্য পত্রিকা, জানুয়ারি-২০০৫ ।
- রায়, অনুকুল, *বর্তমান ময়মনসিংহ*, প্রবর্তন পত্রিকা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ।
- জাহান, জাহাঙ্গীর আলম (সম্পাদিত), *নিরঙ্কুশ ছড়ার কাগজ 'আড়াঙ্গি'*, প্রকাশনায়-কিশোরগঞ্জ ছড়াকার সংসদ, ফেব্রুয়ারি-২০১৪ ।
- জাহান, জাহাঙ্গীর আলম (সম্পাদিত), ৩য় ছড়া সম্মেলনের প্রকাশনা *'ফুরুঙ্গি'*, প্রকাশনায়- কিশোরগঞ্জ ছড়াকার সংসদ, ফেব্রুয়ারি- ২০১৫ ।

- *আজকের কাগজ*, ঢাকা, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ ।
- *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩৯ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ২২ জানুয়ারি ১৯৯২/১৬ জুন ১৯৭৪/৩ এপ্রিল-১৯৬১ ।
- জাকির, জাকিরুল ইসলাম (সম্পাঃ), *উত্তরসূরী*, কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রকাশনী, ১৯৮৫ ।
- *উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পুস্তিকা ১৯৮৪-৮৫*, সদর উপজেলা, কিশোরগঞ্জ, ১৯৮৫ ।
- *কিশোরগঞ্জ গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৯৮৬*, স্যুভেনীর, কিশোরগঞ্জ জেলা ক্রীড়াা সংস্থা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ।
- *সাপ্তাহিক কিশোরগঞ্জ পরিক্রমা*, কিশোরগঞ্জ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ও চতুর্থ সংখ্যা, ৪৫তম সংখ্যা, ৪৬ তম সংখ্যা ১৯৯১-৯২ ।
- *কিশোরগঞ্জ-৭৭ প্রদর্শনী স্মরণিকা*, কিশোরগঞ্জ প্রদর্শনী পরিষদ' ৭৭, কিশোরগঞ্জ, ১৯৭৭ ।
- *কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাব নতুন ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন উৎসব স্মরণিকা-১৯৯১*, কিশোরগঞ্জ, ৮ আগষ্ট-১৯৯১ ।
- *কিশোরগঞ্জ বার্তা*, স্মরণিকা, কিশোরগঞ্জ, ১৯৭৫ ।
- *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ*, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭ ।
- *সাপ্তাহিক কিশোরগঞ্জ বার্তা*, কিশোরগঞ্জ, ১ম বর্ষ ৩৫তম সংখ্যা, ৮ ফেব্রুয়ারি-১৯৯২ ।
- *কিশোরগঞ্জের সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা*, কিশোরগঞ্জ, শ্রাবণ ১৩৯৮ ।
- *চন্দ্রিমা, চাঁদের হাট*, ভৈরব শাখা, জুন-১৯৮১ ।
- *দৈনিক জনতা*, ঢাকা, জুন-১৯৮৭ ।
- *ঢাকা বিভাগীয় টেনিস টুর্ণামেন্ট ১৯৮৭, কিশোরগঞ্জ স্মরণিকা*, কিশোরগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ।
- *দেশ*, কলিকাতা, ৫৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ১ এপ্রিল ১৯৮৯, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ।
- *ধনু নদীর বাকে*, সম্পাঃ ইয়াকুব আলী, ইটনা সাহিত্য পরিষদ, ২১ ফেব্রুয়ারী-১৯৯২ ।
- *বার-ভূঞা পরিচিতি*, আবদুল করিম, অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিসল বক্তৃতা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১ মার্চ-১৯৯২ ।
- *বাংলাদেশের মেলা*, বাংলাদেশ হস্তশিল্প বিপনন সংস্থা, বিসিক, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৯০ ।
- *সাপ্তাহিক বাংলার দর্পন*, ময়মনসিংহ, ৫ এপ্রিল-১৯৭৮ ।

- *ভৈরব স্মরণিকা*, ভৈরব প্রেসক্লাব, এপ্রিল ১৯৮৩ ।
- *মাসিক মদীনা*, ঢাকা, ২৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮০ ।
- *ময়মনসিংহবাসী*, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ।
- *সংস্কার*, সেলিম স্মৃতি সংসদ, কুলিয়ারচর, ২৪ নভেম্বর-১৯৯১ ।
- *স্মরণিকা' ৮৯*, কিশোরগঞ্জ সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৯ ।
- *স্মরণিকা' ৮৪ নিকলী উপজেলা*, নিকলী উপজেলা পরিষদ, ১৯৮৪ ।
- *স্মরণিকা-১৯৮৩*, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ, ১৯৮৩ ।

৩.ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থঃ

Khan, Nurul Islam (ed.) : *Bangladesh District GazetteersMymensigh*, Bangladesh GovernmentPress, Dacca, 1978.

Islam, Sirajul (ed.) : *BanglaPedia*, Bangladesh Asiatic Society, March, 2003.

Siddiqui, Ashraf (ed.) : *Bengali Folklore Collection and Studies*, Bangla Academy, June-97.

Islam, Mazharul : *The Socio-Cultural Study of Folklore*, Bangla Academy, June-2011.

Hunter, W.W. : *A Statistical Account of Bengal*, Vol.-V, London, 1875.

Chowdhury, Nirod Chandra: *The Autobiography of an Unknown Indian*, Calcutta, 1951.

Karim, Abdul : *History of Bengal, Mughal Period*, Vol.- I & II, Institute of BangladeshStudies, Rajshahi University, 1995.

C., Adams William : *History of the Rivers in the Genetic Delta, 1750-1918*, Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1919.

Alim, Ahmed : *Muslims of Chittagong : A Socio-Cultural Study, 1857-1931*, Unpublished Ph.D Thesis, Chittagong University, 1987.

S.U., Ahmed : *Study in Urban History and Development*, London : Centre of SouthAsian Studies, Dacca,1986.

Akanda, S.A. (ed.) : *Students in Modern Bengal,* Institute of Bangladesh Studies, RajshahiUniversity, 1981.

Mallick, Azizur Rahman: *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

S., Bose : *Agrarian Bengal : Economic, Social Structure and Politics, 1919-1947,* Cambridge : Cambridge University Press, 1986.

Bentley, Chas. A. : *Fairs and Festivals in Bengal,* Calcutta : The Bengal Secretariat BookDepo, 1921.

A., Datta : *Urban Government, Finance and Development,* Calcutta : The WorldPress, 1970.

R., Dutt : *The Economy History of India*, Vol.-II, 7th (ed.), London : Routledgeand Kegan Paul, 1950.

R., Gadgil : *The Industrial Evolution of India in Recent Times*, 4th (ed.), Kolkata : Oxford University Press, 1942.

Dunbar, George : *History of India*, London : Printed in great Britain by the Edinburgh Press, Edinburgh and London, 1936.

H.R., Ghosal : *Economic Transaction in the Bengal Presidency, 1973-1833*, Patna : Patna University, 1950.

Government of Bengal: *Progress of Education in Bengal, (1897-1902),* Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1905.

H.V., Hampton : *Biographial Studies in Modern Education*, Oxford : At the UniversityPress, 1947.

W.W., Hunter : *A Statistical Accont of Bengal (Bogra, Rajshahi),* Vol.-VII, London,1876.

M.M., Islam : *Bengal Agriculture, 1920-1986*, Cambridge : Cambridge UniversityPress, 1978.

Sarker, Jadu Nath : *The History of Bengal,* Vol.-II, Dhaka : 1972.

S.M, Jafar : *Education in Muslim India*, *1000-1800*, A.D., Delhi : Idarahi Adabiyat, 1973.

R.C., Majumdur : *History of the Modern Bengal*, Part-I, Kolkata : G. Bharadwag and Co.,1978.

Khan, Mohammad Mohabbat: *Administrative the Forms in the Civil Service*, Dacca University Studies, Vol.-25, Part-A. December, 1976.

R.C., Mojumder : *Glimpses of Bengal in the 19th Century*, Kolkata Firma K.L. Mukhopahyay, 1960.

Kabir, Muhammad Ghulam : *Minority Politics in Bangladesh*, New Delhi : Vikas Publishing Home,1980.

Ali, Muhammad Mohar : *History of the Muslims of Bengal*, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh, 1985.

Mamun, Muntasir : *Source Materials of the Cultural History of Dhaka City*, Dhaka : International Centre for Bengal Studies, 2001.

Hardy, Peter : *Muslims of British India*, Cambridge : 1972.

Hartog, Philip : *Some Aspects if Indian Education Past & Present*, London : Oxford University Press, 1939.

B.R., Purkait : *Administration of Primary Education in West Bengal*, Kolkata : FirmaK.L.M., 1984.

E.J., Rapson (Ed.) : *The Cambridge History of India*, Vol.-I, S.Chand and Co. by Arrangement with Cambridge University Press, London.

Ahmed, A.F Salahuddin: *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, India, Leiden : E.J. brill, 1965.

Mahmood, Sayed : *History of English Education in India*, Aligarh : M.A.O. College, 1895.

S.P., Sen (ed.) : *Dictionary of National Biography if India*, Vol.-II, Calcutta : Institute ofHistorical Studies, 1973.

H., Sharp (ed.) : *Selection from Educational Records*, Part-I, 1771-1839, Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1920.

N.K., Sinha :*Economic History of Bengal*, Vol.-I, Kolkata : Firma K.L. Mukhopadhyaya, 1965.

Islam, Sirajul (ed.) : *Bangladesh District Recored*, Vol.-I, 1760-1785, Dacca : The University of Dacca, 1978.

Islam, Sirajul : *Rural History of bangladesh : A Source Study*, Dhaka : Titu Islam, 1977.

Amin, Sonai Nishat : *The World of Muslim Women in Colonical Bengal 1876-1939*, NewYourk : E.J. Brill. 1996.

N.V., Sovani : *British Impact on India*, Calviersd Historic Mondiale, 1954.

Sarkar, Sumit : *Modern India 1885-1947*, Delhi : Macmillan India Ltd.,1984.

Mahmood, Syed : *History of English in India 1781-1893*, Aligarh : M.A.O. College, 1895.

J.P. Naik & Syed Nurullah : *A Students History of Education in India 1880-1973*, Kolkata : MacMillan Company of India, 1974.

Syed Nurullah & J.P. Naik, : *History of Education in India*, Bomby : Macmillan & Co., 1951.

M.R., Tarafdar : *Culture Conflict in Bangladesh, A Nation in Born*, Calcutta: 1974.

A.M., Zaidi : *Evolution of Muslim Political Thought in India*, Vol.-I, New Delhi Michiko & Punjathan, 1975-1978.

৪. ইংরেজি ভাষায় রচিত রিপোর্ট, গেজেটিয়ার ও ইনসাইক্লোপিডিয়াঃ

- Annual Report on the Working of the Indian Factories Act-1911 in the Punjab, For the Year-1923, Lahor: Government Printing, 1924.
- Anath Nath Basu, Introduction to Adams Reports, (here after referred to as introduction) See also Bengal Past & Present, Vol-8, Part-2, April-June, 1914.

- Mymensingh District Statistcs 1983, Dhaka : Bangladesh Bureue of Statistics, A.D.
- Clio, Journal of the Department of History, Jahangirnagar University, Dhaka-2010.
- Census of Agriculture-1996, Zilla Series Kishoreganj 2003, Dhaka: Bangladesh Bureaae of Statistics, 2003 A.D.
- Dictionary of Education, Edited, New York: McGraw Hill Book Company, Inc., 1959.
- Encyclopedia of Britanica, Vol. VIV
- Encyclopedia of Social Sciences, Voll. IX-X, New York: The Macmillan Co., 1959 A.D.
- Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. V, edited, New York: T and T Clark, 1981.
- Firminger, W.K., Historical Introduction to the Bengtal Portion of the Fifth Report, Calcutta: Indian Studies Series, 1962.
- Government of Bengal, Report of the Progress of Education in Bengal, 1882, Kolkata: Bengal Secretariat Book Depo., 1884.
- Government of bengal, Report on the publish Instruction of Bengal 1904-1905, Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1905. (Here after Report on Education).
- Gupta, J.N., District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam Mymensingh, Allahabad: Poineer Press, 1910.
- H, Beverley, Report Census of Bengtal 1872 (Calcutta: Printed at the Bengal Secretariat Press, 1872).
- Khan Tahawar Ali (ed.), Biogrphical Encyclopaedia of Pakistan, Lahore: Institute of Historical Research, 1965-66.
- Population Census 2001 prlimimary Report, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2002 A.D.
- The World Book of Encyclopedia, Vol. IV, 1985.
- The New Encyclopedia Britannica, Vol. VIII, London: Helen Heming way Benton, 1973-1974 A.D.
- The Report of Indian Statutory Commission, 1930, Vol. I (Simon Commission), The Government of Bengal
- The new Oxford Encyclopedia Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 1983, S.D.
- William Adam, Reports on the State of Education in Bengal 1835-1838 (ed.) Anath Nath Basu, Kolkata: University of Calcutta, 1941, here after Adams Report.

- William Adam, Second Report on the State of Education in Bengal, Kolkata: G.H. Huttmann, 1836.
- "The Amrita Bazar Patrika", Calcutta, 7th August 1981.
- Census Reports, From 1881-1991.
- "Kishoreganj District Profile", ed. *M.*A. Mannan, Kishoregani District Administration, A Souvenior, 1985.
- *M*agistrate's Letter to Under Secretary of the Govt. of Bengal, Dated 11-03-1845.
- "Report on Kishoreganj District", Presented by *M.*A. Mannan, Deputy Commissioner, Kishoreganj, 13-08-1984.
- "Revenue History of Kishoreganj", S.N.H. Rizvi, The Morning News, January 11, 1970.

৫. ইংরেজি ভাষায় রচিত অভিসন্দর্ভ (প্রকাশিত/অপ্রকাশিত):

Karim, Abdul : *Social History of the Muslims in Bengal* (Down to A.D.1538), Unpublished Ph.D Thesis, Social Science Department, Dhaka University, 1958.

Khatun, Habiba : *Sonargaon : Its History and Moment(1336-1608 A.D),* Unpublished Ph.D Thesis, Islamic History and Culture Department, DhakaUniversity, 1987.

Khan A., Matin : *Residence background and fertility in Urban Bangladesh*, UnpublishedPh.D Thesis, Institute of Statistics Research and training, DhakaUniversity.

Siddique, Mohibullah : *Socio- Economic Development of a Bengal District: A Study of Jessore, 1883-1995,* Unpublished Ph.D Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1997.

Ahmed, Rana : *Education Progress of the Muslim Community in Bengal (1911-1935),* Unpublished Ph.D Thesis, History Department, Dhaka University, 1996.

Hossain, Gazi Zahid : *Pattern of Migration : Push and Pull Factors Analysis-A Socio-Economic Study of Barisal Town*, Unpublished M.Phil. Thesis,Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1989.